শিক্ষায় শিল্পের স্থান

অজয় কুমার হাজরা

অ্যাকাডেমিক এণ্টারপ্রাইজ
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ
এপ্রিল, ১৯৫৯

প্রাপ্তিস্থান :—
টিচার্স কনসার্ন
৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা—৭০০০০৯

অ্যাকাডেমিক এণ্টারপ্রাইজের পক্ষে ইন্দুভূষণ চক্রবর্তী দ্বারা ২৪৯/এ, নব ব্যারাকপুর, ২৪ পরগণা (উ) হইতে প্রকাশিত এবং তনুশ্রী প্রিণ্টার্স-এর পক্ষে ভোলানাথ পাল কর্তৃক ৪/১ই, বিডন রো, কলিকাতা-৭০০০০৬ হইতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

১ম খণ্ড (ভারতীয় চিত্রকলা)

শিক্ষা ও শিল্পশিক্ষা ১
শিল্পশিক্ষার সমস্যা ৬
চারু ও কারু শিল্পশিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ১১
চিত্রশিল্পের রসানুভূতি ১৫
চিত্রশিল্পের উপাদানসমূহ ২০
শিশুশিল্প ও ফ্রি এক্সপ্রেশন ৩১
শিশুশিল্পের বৈশিষ্ট্য ৩৪
শিশু বয়সের তিনটি স্তর ৩৭
শিল্প শিক্ষকের যোগ্যতাবলী বা গুণাবলী ৪০
শিল্প শিক্ষকের কার্যাবলী ৪৬
শিল্প ও কর্মশিক্ষা ৪৯
শিক্ষাক্ষেত্রে শিল্পবিদ্যার প্রয়োগ ৬৪
পাঠটীকা প্রস্তুতকরণ প্রণালী ৬৭
ভারতীয় চিত্রকলা সমূহ ৮৮
প্রাচীন বাংলার শিল্পীগোষ্ঠী ১০৬
ভারতীয় ভাস্কর্যশিল্প ১২২

২য় খণ্ড (পাশ্চাত্য চিত্রকলা)

ইউরোপের নবজাগরণ ও তিন দিকপাল	...	...	১
বাস্তববাদ	...	...	১১
প্রতিচ্ছায়াবাদ	.	...	১৪
উত্তর প্রতিচ্ছায়াবাদ ও তিন দিকপাল	...	...	১৭
গ্রন্থপঞ্জী	...	...	৩৩
শব্দনির্দেশপত্র	...	...	৩৫

শিক্ষা ও শিল্পশিক্ষা

প্রায় চল্লিশ হাজার থেকে দশহাজার খৃষ্টপূর্ব আগে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষেরা বাস করত। পাহাড়ের গুহা ছিল তাদের বাসস্থান। শিকার ছিল তাদের জীবিকা। সেই শিকার জীবনে না ছিল সুর, না ছিল কথা, না ছিল গান। মুখের ভাষা ফুটে উঠবার বহু আগেই তারা রূপের ভাষায় শিক্ষা লাভ করেছিল। যার পরিচয় আমরা পাই স্পেনের আলতামিরা, ফ্রান্সের লাসকক্স এবং ভারতের বিভিন্ন পার্বত্য অঞ্চলের গুহাগুলি থেকে। এগুলো যদিও তাদের জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিল তবুও বলব এগুলো তাদের জীবন যাত্রা প্রণালীর অতিরিক্ত কিছু ভাব সম্পদ। এখন প্রশ্ন হলো কিসের তাগিদে তারা ছবি আঁকত? রূঢ় বাস্তবের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের বেঁচে থাকতে হোত। শিকার ছিল তাদের জীবিকা। যেহেতু যে কোন মুহূর্তেই মৃত্যুর কবল গ্রাস এসে হাজির হয়ে যেতে পারে। সেই জন্য কতকগুলো মন্ত্র-তন্ত্র, তুক তাকের উপর তাদের বিশ্বাস জন্মে ছিল। তাদের মনে এমন একটা বিশ্বাস জন্মেছিল যে, শিকারে যাওয়ার আগে ঈপ্সিত শিকারের ছবিটি যদি গুহার দেওয়ালে সঠিক আনুপাতিকভাবে না এঁকে নিতে পারে, তাহলে সেই দিন তারা শিকার পাবে না। এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করেই শিকারী মানুষ,শিল্পী মানুষে পরিণত হয়। তারপর হাজার হাজার বছর কেটেছে। মানুষ আপন বুদ্ধি বলে সভ্যতার চরম শিখরে আরোহণ করেছে। অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছে। শহর, নগর, বন্দর প্রতিষ্ঠা করেছে। জলে স্থলে আকাশে তার অবাধ বিচরণ সম্ভব করে তুলেছে। এগুলো সম্ভব হয়েছে রূপ শিল্পের সঙ্গে কথা শিল্পের আবিষ্কারের ফলে। রূপ শিল্প ও কথা শিল্প—এই দুইয়ে মিলে মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতির ভাণ্ডারটিকে পরিপূর্ণ করে তুলেছে। এখন মানুষ প্রকৃতিকে ভয় করে না, বরং মানুষই প্রকৃতির ভয়ের কারণ হয়ে উঠেছে। এখন শিল্প জীবিকার উপায়ের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত নয়। জীবন বিকাশের উপায়ের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত। শিক্ষাবিদ্‌রা স্বীকার করে নিয়েছেন যে, ব্যক্তি ভবিষ্যত জীবনে যে পেশাই গ্রহণ করুক না কেন; শৈশবাবস্থায় কিছু না কিছু গানবাজনা, ছবি আঁকার চর্চা করা উচিত তা না হলে ব্যক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয়।

বেশ কয়েক শতাব্দী পূর্বে দার্শনিক প্লেটো তাঁর 'Theory of Education' বইটিতে লিখেছিলেন "Art & Education alike." কিন্তু উক্ত বিষয় দুটি সম্পর্কে আমাদের সঠিক ধারণার অভাব বশতঃ আমরা Plato'র চিন্তাধারাকে

ভুল বোঝাবুঝির চেষ্টা করে আসছি। তখন শিক্ষা বলতে বোঝাতো The Three R's অর্থাৎ Reading, Writing and Arithmatic এ পারদর্শীতা লাভ এবং শিল্প ছিল একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের বৃত্তিগত শিক্ষা যার সঙ্গে শিক্ষার কোনও সম্পর্ক নেই। যে মুহূর্তে শিক্ষা, বিজ্ঞান হিসেবে পরিগনিত হোল তখন শিক্ষা আর Three R's এর গন্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকলো না। বরং দর্শনেন্দ্রিয়, স্পর্শনেন্দ্রিয়, শ্রবনেন্দ্রিয় প্রভৃতি শিক্ষাবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে উঠল। তার নাম দেওয়া হোল সৌন্দর্যশিক্ষা। শিক্ষাবিদেরা নির্দ্বিধায় স্বীকার করে নিলেন যে সৌন্দর্য শিক্ষার মাধ্যমেও শিক্ষার্থীর সংবেদন অন্তর্দৃষ্টি, কল্পনা, আবেগ, অনুভূতি, চিন্তাশক্তির উন্নয়ন ঘটিয়ে শিক্ষার্থীকে এক অখণ্ড ব্যক্তিত্বের অধিকারী করে গড়ে তোলা যায়। ফলে এতদিন ধরে শিক্ষা ও শিল্পের যে দ্বন্দ্ব ছিল তা অপসারিত হয়ে শিল্প ও শিক্ষা সম্বন্ধে মত প্রকাশ করা হোল "Art is an expression, Science is an explanation of the same reality" অর্থাৎ শিক্ষা হোল নিয়ামক পদ্ধতি।

এখন আমাদের কাছে পরিষ্কার হওয়া উচিত শিল্প বলতে সঠিক অর্থে কি বোঝায়। সাধারণ কথায় আমরা মনে করি Art gallary বা Museum এ যে সমস্ত দর্শনীয় বস্তু সাজানো থাকে সেগুলোই শিল্পের একমাত্র নিদর্শন। কিন্তু আক্ষরিক অর্থে শিল্প বস্তু বলতে শুধু Museum এ সাজানো বস্তুগুলোকেই বোঝায় না। শিল্প আমাদের জীবনে জলমাটি হাওয়ার মত এক মহার্ঘ বস্তু। রস সৃষ্টিকারী যে কোনও সৃষ্ট বস্তুকেই আমরা শিল্প নামে অভিহিত করতে পারি, তা সে ছবিও হতে পারে, মূর্তিও হতে পারে, কাব্যও হতে পারে, আবার সংগীতওহতে পারে। তাই শিল্প যাঁরা সৃষ্টিকরেন তাদেরকে রসিক হতে হয়। রসিক না হলে শিল্পী হওয়া যায় না। রসিক মানুষের হাতে একতাল কাদা দেওয়া হোল। কিছুটা কমিয়ে কিছুটা যোগ করে একটা আকার দিলেন, যে আকারটা পূর্বে ঐ মাটিতে ছিল না। তিনি যে আকারটা সৃষ্টি করলেন সেটা পুরুষ কি স্ত্রীলোক বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু একটা মানুষের আকৃতি মনে হচ্ছে। এই আকারটিই হোল শিল্প, আর যিনি আকার সৃষ্টি করলেন, তিনি হলেন শিল্পী। আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে থাকা ইঁট, কাঠ, পাথরের মধ্যে এই ধরণের অজস্র আকার, আকৃতি ছড়িয়ে রয়েছে। রসিক বা স্রষ্টার হাতে পড়লে এগুলি থেকে অজস্র শিল্প সম্ভার সৃষ্টি হতে পারে।

শিল্প কোনও সময় স্থির থাকে না। অতীতের শিল্প বর্ত্তমানকে প্রভাবিত করে। বর্ত্তমানের শিল্প ভবিষ্যতকে প্রভাবিত করে। শিল্প কখনও প্রত্যক্ষ, কখনও পরোক্ষ, কখনও মূর্ত্ত হয়ে ওঠে, কখনও বিমূর্ত্ততা লাভ করে। যখন আমরা হাত দিয়ে স্পর্শ করতে পারি, চোখ দিয়ে দেখি, কান দিয়ে শুনি,

তখন তা মূর্ত্ত। যখন তা উপলব্ধিতে চলে আসে তখন তা বিমূর্ত্ত। চিত্র শিল্প যেমন ভাস্কর্যকে প্রভাবিত করে। ভাস্কর্যও তেমনি চিত্রশিল্পকে প্রভাবিত করে।

শিল্প আকারাশ্রিত, সাহিত্য শব্দাশ্রিত। একটি ফুলের বর্ণনা দিতে হলে সাহিত্যিককে অনেক চিন্তাভাবনা করে অনেক শব্দ চয়ন করে একটি নিখুঁত বর্ণনা পেশ করতে হবে। কিন্তু শিল্পী কয়েকটি তুলির টানে ফুলের ঘনীভূত আবেগটি ফুটিয়ে তুলতে পারেন। এই ঘনীভূত আবেগ ও উদ্দীপনা সহজাত। আবেগ, উদ্দীপনা কারও মধ্যে তৈরী করা যায় না।

শিল্প আবার ইন্দ্রিয়জাত উদ্দিপনাও বটে। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক-এই পঞ্চেন্দ্রিয় নিয়ে আমরা জগত সংসারকে প্রত্যক্ষ করি। চক্ষুদ্বয়ের মাধ্যমে আমরা বর্ণময় জগতের সঙ্গে পরিচিত। কর্ণের মাধ্যমে শব্দ জগতের সঙ্গে পরিচিত। নাসিকায় ঘ্রাণ, ত্বকে স্পর্শের অভিজ্ঞতা লাভ করি, জিহ্বায় স্বাদ গ্রহণ করি। প্রতিটি ইন্দ্রিয়র শিক্ষা স্বতন্ত্র হলেও, একে অন্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। যেমন Design crafts এর সঙ্গে জড়িত, Dance Drama র সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। রূপকল্পে তৃপ্ত হয় সংবেদন (Sensation) যার জন্যে দর্শনেন্দ্রিয় ও স্পর্শনেন্দ্রিয় শিক্ষার প্রয়োজন। সঙ্গীতে অন্তর্দৃষ্টি (Intuition), যার জন্যে প্রয়োজন শ্রবনেন্দ্রিয় শিক্ষার। নাটকে অনুভূতি ও আবেগ (Feelling) এবং কারু শিল্পে চিন্তাশক্তির উন্নয়ন ঘটে (Thinking)।

যেহেতু শিল্প আকারাশ্রিত, সেইজন্য যাঁরাই আকার নিয়ে কাজ কারবার করেন তাদেরকেই আমরা শিল্পী বলে অভিহিত করতে পারি। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে। যারা খেলার টিম তৈরী করছে, যারা রাজনৈতিক দল গঠন করছে, যারা ছবি, মূর্তি নির্মাণ করছে, এমনকি যারা ঘর-বাড়ী, আসবাবপত্র, জামা কাপড়, জুতো তৈরী করছে—এরা প্রত্যেকেই শিল্পী। কারণ এরা প্রত্যেকেই আকার জাত উদ্দিপনার সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়। এরা কি সকলে একজাতের শিল্পী?[৩] এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হোলে এ প্রসঙ্গে দার্শনিকদের মতামত নেওয়া দরকার। দার্শনিক 'ক্রোচে' এ ব্যাপারে যে মতামত প্রকাশ করেছেন তা প্রনিধান যোগ্য। তিনি বলেছেন "Any attempt at an aesthetic classifications of art is absurd, all the books dealing with classifications and systems of art could be burnt without any Loss whatever." ক্রোচের উপরিউক্ত মতবাদ থেকে জানা যায় যে শিল্পের মধ্যে কোনও শ্রেণী বিভক্তিকরণ একেবারেই বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু ক্রোচের উপরিউক্ত মতবাদকে দূরে সরিয়ে রেখে যদি শিল্পের জাতিলক্ষণ বা প্রজাতিলক্ষণ সম্বন্ধে আলোচনা করি তাহলে দেখা যাবে যে একটির

লক্ষ্য রয়েছে নির্মাণ দক্ষতার উপর আর একটির লক্ষ্য রয়েছে উপভোগ্য রচনার উপর।

বস্তুত প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে মানুষ যা কিছু সৃষ্টি করেছে সবই প্রয়োজনমূলক সৃষ্টি। এই প্রয়োজনমূলক সৃষ্টিকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করে দিলে আলোচনার সুবিধা হবে। (১) বিশুদ্ধ জ্ঞানের জন্য কর্ম, (২) অভ্যাসজনিত কর্ম। 'এই অভ্যাসজনিত কর্মের একটি হোল চারু। অপরটি হোল কারু। পুরাণে বলা হয়েছে 'কৃৎ নু' কারু অর্থাৎ কর্মদক্ষ। ইংরেজীতে যাকে বলে Artisan। অর্থাৎ যে করে সেই কারু। আমরা শিল্পকে সংকুচিত অর্থে ব্যবহার করি বলে শ্রেণী বিভক্তিকরণের আশ্রয় নিই। ব্যাপক অর্থে সব শিল্পই কারুশিল্প। তাহলে এইভাবে পার্থক্য নির্ণয় করা যেতে পারে যে, যে কারুশিল্পে চারুত্বের মাত্রা বেশী তাকে আমরা বলব চারুশিল্প আর যে কারুকর্মে কারুত্বের মাত্রা বেশী তাকে বলব কারুশিল্প। এখন প্রয়োজন, অপ্রয়োজনের প্রশ্ন এসে যায়। আমরা দৈনন্দিন জীবনে নানা জিনিষের প্রয়োজন অনুভব করি। বই, খাতা, পেনসিল, চেয়ার টেবিল ইত্যাদি। কিন্তু সব বস্তু সব বস্তুর প্রয়োজন মেটাতে পারে না। যেমন বইপত্র, টেবিল চেয়ারের প্রয়োজন মেটাতে পারে না। আবার চেয়ার টেবিল, তৈজস পত্রের প্রয়োজন মেটাতে পারে না। এখন দেখতে হবে কোন বস্তু কি ধরনের প্রয়োজন মেটায়? একটা হোল প্রয়োজনের প্রয়োজন আর একটা হোল অপ্রয়োজনের প্রয়োজন; যেমন গানের জন্য গান, ছবির জন্য ছবি। কোনও বস্তু প্রয়োজনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত কোনওটা আবার প্রয়োজনের সঙ্গে পরোক্ষভাবে যুক্ত। এখন দেখা দরকার কোন বস্তু কি ধরণের উপযোগিতার সৃষ্টি করে? যখন কোনও বস্তুর উপযোগমূল্য ছাপিয়ে উপভোগমূল্য বড় হয়ে উঠে তখন সেটাকে আমরা চারু শিল্প বলতে পারি। আর যখন কোনও বস্তুর উপভোগমূল্য ছাপিয়ে উপযোগমূল্য বড় হয়ে ওঠে তখন সেটাকে কারু শিল্প বলতে পারি। একটা অধিমানসিক উপযোগিতা সৃষ্টিকারী বস্তু, আর একটা ব্যবহারিক উপযোগিতা সৃষ্টিকারী বস্তু। আধুনিক যুগে কলার সংখ্যা অনেক। তার মধ্যে মোটামুটিভাবে কাব্য, সংগীত, চিত্রকলা ও ভাস্কর্যকে চারুশিল্প নামে অভিহিত করতে পারি। স্থাপত্যকে চারু বা কারু কোনওটাতেই ফেলা যায় না। এর এক পা চারুকলার গন্ডীতে অপর পা কারুকলার গন্ডীতে। উদাহরণস্বরূপ ধরা যেতে পারে 'তাজমহল'। 'তাজমহল' একটি স্থাপত্য। সম্রাট শাহজাহান তাঁর প্রিয়তমা মহিষী মমতাজের স্মৃতিকে অক্ষয় অমর করে রাখার জন্য যমুনাতীরে এই স্মৃতি-সৌধটি নির্মাণ করে পৃথিবীর মানুষের কাছে অমর হয়ে আছেন। তাজমহলকে যখন নিছক কবর হিসেবে দেখি তখন তাকে কারুকলার গন্ডীভুক্ত মনে করতে কোনও দ্বিধা-

বোধ করি না, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যখন গলা মিলিয়ে বলি—

হে সম্রাট কবি। এই তব হৃদয়ের ছবি।
এই তব নবমেঘদূত, অপূর্ব, অদ্ভূত।
ছন্দে-গানে উঠিয়াছে অলক্ষ্যের পানে-
যেথা তব প্রিয়া, রয়েছে মিশিয়া।

তখন তাজমহলকে আর কারুশিল্প বলা কোনও মতেই সঙ্গত নয়। তখন 'তাজমহল' আমাদের কাছে চারুশিল্প। তাই 'তাজমহল' একদিকে চারু অপর দিকে কারু।

শিল্পশিক্ষার সমস্যা

আধুনিক মানুষের জীবন, সমস্যা জর্জরিত। প্রতিটি মুহূর্তেই আমাদের নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। যখনই কোনও বস্তু প্রয়োজন পূরণে ব্যর্থ হয় তখনই সৃষ্টি হয় এক একটি সমস্যা। এই সমস্যার মধ্যে দিয়েই আমরা প্রগতির পথে এগিয়ে চলেছি।

সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আজ পর্যন্ত মানুষ যা কিছু সৃষ্টি করেছে সবই কোনও না কোনও উদ্দেশ্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এই উদ্দেশ্যের জন্যই সৃষ্টি হচ্ছে সমস্যা। অর্থনীতিভিত্তিক সমাজে যা একান্ত অপরিহার্য। চিকিৎসা বিদ্যার লক্ষ্য হচ্ছে স্বাস্থ্যের উন্নতি। স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য চাই সুষম খাদ্য। সুষম খাদ্য নির্ভর করে সুষ্ঠু উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার উপর। সুষ্ঠু উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা নির্ভর করে অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর। অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে তুলতে হলে চাই শোষণহীন সমাজ। শোষণহীণ সমাজ গড়ে তুলতে চাই সমাজ সচেতনতা। এই সচেতনতা আসে প্রকৃত শিক্ষা থেকে। শিক্ষা হচ্ছে জীবন বিকাশের উপায়, জীবন বিকাশের অন্যতম হাতিয়ার। শিল্প শিক্ষাও অন্যান্য বিষয় শিক্ষার ন্যায় জীবন বিকাশের অন্যতম সর্ত। এই তত্ত্বের উপর নির্ভর করেই অপ্রয়োজনের প্রয়োজনতত্ত্ব গড়ে উঠেছে। অপ্রয়োজনের প্রয়োজনতত্ত্বটি আমাদের দেশীয় শ্লোগান নয়। এ তত্ত্বটি আমরা ধার করেছি পশ্চিমের রেনেসাঁ থেকে। কারণ একসময় পশ্চিমের রেণেসাঁই ছিল আমাদের সভ্যতা সংস্কৃতির পরাকাষ্ঠা। আমাদের দেশের শিল্পী, সাহিত্যিকরা পশ্চিমের রেনেসাঁর দিকে তাকিয়ে, এই তত্ত্বকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন, এখনও চাইছেন। যার জন্য আমরাও শ্লোগান তুলেছি "শিল্পের জন্য শিল্প।"

স্বাধীনতার পূর্বে আমরা পশ্চিমের পরিপ্রেক্ষিতে যেমন শিল্প, সাহিত্যকে বিচার করতাম। এখনও সেই অনুকরণ প্রবনতাকে আমাদের মন থেকে মুছে ফেলতে পারিনি। এখনও আমরা কোনও সাহিত্যিককে বলি বাংলার 'স্কট', কাউকে বলি বাংলার 'বাইরণ', কাউকে বলি বাংলার 'শেলী'। আবার কাউকে বলি ভারতের 'লিওনার্দো'। স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের কাছে পরম পূজনীয়, যুগাবতার মহাপুরুষ, কিন্তু তিনিও সারা পৃথিবী পরিভ্রমণ করে এসে আমাদের দেশের হাজার হাজার বছরের শিল্প ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে, তাঁর 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' বইটিতে লিখেছেন "ওদের মত চিত্র ও ভাস্কর্যবিদ্যা আয়ত্ব করতে এখনও আমাদের ঢের দেরী। ও দুটো কাজে আমরা এখনও অপটু"। কেন যে তিনি একথা লিখেছিলেন তা আমাদের কাছে আজও

অজ্ঞাত। তাঁর মত ব্যক্তিত্ববাণ মহাপুরুষের পক্ষে এই উক্তি কোনও মতেই শোভনীয় নয়। মনে হয় অজন্তা গুহা চিত্রের কথা স্বামীজীর অগোচরে ছিল। কেননা স্বামীজীর মৃত্যুর কয়েক বছর পর অজন্তা চিত্রের অনুলিপি প্রকাশিত হয়। উনিশ শতকের দিকে আমাদের দেশে যে শিক্ষা বিস্তার ঘটেছিল তার পুরোটাই পশ্চিমী আদলে। স্বাধীনতার পরবর্ত্তী যুগেও তার কোনও পরিবর্তন হয়নি। ঔপনিবেশিক ইংরেজ সরকার প্রজাদের শিক্ষার বহুমুখী ধারার রসাস্বাদন থেকে বহুদিন বঞ্চিত রেখেছেন। তাঁরা ভারতবাসীর মানসিক বিকাশ বা জ্ঞান বিস্তারের প্রতি বিন্দুমাত্র নজর দেননি। নিজেদের ব্যবসা বাণিজ্য সম্প্রসারণের নিমিত্ত ভারতবাসীকে অফিসকর্মী বা করণিকে পরিণত হওয়ার শিক্ষায় বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। সেই সময় যে "Art school"গুলি আমাদের দেশে গড়ে উঠেছিল তার পাঠ্যসূচীগত কোনও পরিবর্জন বা পরিবর্ত্তন করার তো চেষ্টাই করেননি বরং সমূলে তা বিনষ্ট করেছেন। অথচ একই সময়ে England-এর 'Royal College of Arts'এ তাঁরা আধুনিক মতে শিক্ষিত শিল্পী সম্প্রদায় গড়ে তোলার প্রতি বিশেষ নজর দিয়েছিলেন, যেখানে ভারতবাসীদের ভর্ত্তি'র ব্যাপার নানা ধরনের বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছিল, আর আমাদের দেশের শিল্পীদের নকল নবীস করে বা কারিগর-শিল্পী গড়ে তুলতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। এই বিমাতৃসুলভ মনোভাবের জন্য তখনও কোনও প্রতিবাদ করা হয়নি। বর্তমানেও, না সরকারী তরফ থেকে কোনও চেষ্টা করা হয়েছে, না শিল্পী সম্প্রদায় সোচ্চার হয়েছেন। ভারতবর্ষে'র মত একটা স্বাধীন দেশের পক্ষে এত বড় গ্লানিকর বা লজ্জাকর নজীরটা আর নেই বল্লেই হয়। আমাদের দেশের শিল্পশিক্ষা সেই প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে যা ছিল, আজ পর্যন্ত তার কোনও পরিবর্ত্তন হয়নি। এখানে শিল্পী, শিল্পশিক্ষা লাভের পর এক দক্ষ কারিগর ছাড়া আর কিছু নন। শিল্প যে জীবন বিকাশের উপায়, জীবন বিকাশের একমাত্র হাতিয়ার তা কেই স্বীকার করেন না। আমাদের দেশে প্রশাসনিক স্তরে যারা আছেন, যারা শিক্ষানীতি, শিক্ষাসূচী নির্দ্ধারণ করেন তাঁরাও এই ধারণাই পোষণ করে থাকেন। তাঁদের মতে বিদ্যালয় স্তরে শিল্পশিক্ষা বিষয়টিকে রাখার কোনও যুক্তি নেই। ওটা নামমাত্র কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের ব্যাপার, কিছু সংখ্যক শিল্প যশোপ্রার্থী বৃত্তিজীবি মানুষের শিক্ষণীয় বিষয়। সুতরাং যে বিষয় শিক্ষার্থীদের বৃহত্তর জীবনকে আদৌ স্পর্শ করে না, তা শিক্ষাক্ষেত্রে পাঠ্য বিষয় করে রাখা যুক্তিহীন। সেইজন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিল্পশিক্ষাকে রদ করা হয়েছে। তার পরিবর্ত্তে 'কর্ম শিক্ষাকে' (Work Education) আবশ্যিক পাঠ্যরূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এজন্য অবশ্য না প্রশাসনিক স্তর, না শিল্পী সম্প্রদায়, কোনও তরফ থেকেই কোনও প্রতিবাদ ওঠেনি।

প্রশাসনিক অবহেলার সাথে সাথে রয়েছে সামাজিক ধ্যান-ধারণা। আমাদের দেশের অভিভাবক সম্প্রদায় শিশুদের শিল্প স্পৃহাকে অনুকূল দৃষ্টিতে দেখেন না। শিল্প যে শিক্ষার ভিত্তিভূমি এটি আজও আমাদের দেশে অবারিত নয়, অথচ বিদেশে এটি একটি প্রচলিত প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাছাড়া কি সমাজ জীবন, কি কর্মজীবন সর্বত্রই অর্থাভাবের ছাপ সুস্পষ্ট, শিল্প রুচী ও শালীনতা দেয়, প্রত্যক্ষভাবে অর্থ দেয় না। সেইজন্য অধিকাংশ মাতাপিতা, শিল্পশিক্ষক, যাদের এ ব্যাপারে উৎসাহ, উদ্দীপনা আছে অর্থাভাবে তারাও তাদের সন্তান-সন্ততিদের শিল্প চরিতার্থতার থেকে বঞ্চিত রাখতে বাধ্য হন। একজন চিকিৎসা বিদ্যার ছাত্রকে পাঁচবছর পড়াশুনা করতে যে অর্থ, যে শ্রম বিনিয়োগ করতে হয়, একজন Fine Arts এর ছাত্রকেও পুরো Course সমাপ্ত করতেও সেই পরিমান অর্থ, শ্রম বা তারও বেশী শ্রম বিনিয়োগ করতে হয়। অথচ একজন চিকিৎসক আমাদের সমাজে যে আর্থিক ও সামাজিক মর্যাদায় ভূষিত হন, একজন Artist সেই তুলনায় কোনও সুযোগই পান না। পরন্তু অবহেলা, নিন্দা ও গঞ্জনা তার জীবনে চির সাথী হয়ে দাঁড়ায়।

শিল্প শিক্ষার প্রয়োজন নিছক দক্ষ শিল্পী হওয়ার জন্য নয়, শিল্পশিক্ষা এমনই এক জীবনমুখী ব্যাপার যা রূপজ্ঞান, বস্তুজ্ঞান, রুচী, শালীনতা, এবং পর্যবেক্ষণ শক্তি বর্ধিত করে।

শুধু মাত্র শিল্পবৃত্তি ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করতে হলেও রূপজ্ঞান, বস্তুজ্ঞান, রুচীজ্ঞান, অভিনিবেশ এবং পর্যবেক্ষণ শক্তি ও একাগ্রতা একান্তভাবে অপরিহার্য হয়ে পড়ে। আর শিল্পই হোল একমাত্র বিষয় যার মাধ্যমে এই মানসিক গুণগুলি বিকশিত হয় এবং বিস্তার লাভ করে।

অংকন বিদ্যার মাধ্যমে মানুষ রূপ সম্বন্ধে অবহিত হয়। বস্তুর গঠন ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা পায়। শিল্পের সৃজন ক্ষমতার দ্বারা তার সৃজন ক্ষমতা বর্দ্ধিত হয় ও পারিপার্শ্বিককে সুন্দর করে গড়ে তোলার ইচ্ছা জাগে। শিল্প শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ যে মনোযোগ আয়ত্ব করে সেই মনোযোগ তার সর্ববিধ কাজকে রূপায়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এছাড়া সর্ববিষয়ে জ্ঞানার্জনের জন্য যে পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার প্রয়োজন হয় সেই পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা শিল্প শিক্ষার মাধ্যমেই মানুষ লাভ করে থাকে যা মেধা ও জ্ঞানকে বস্তুবাদী করে তোলে।

শিল্প শুধুমাত্র অপ্রয়োজনের প্রয়োজন নয়। যে কোনও বিষয় পাঠে শিল্প অপরিহার্য। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্রকে মানব দেহের অঙ্গ সংস্থান সম্বন্ধে নিখুঁত জ্ঞান অর্জন করতে হয়। আর এই বিষয়ে জ্ঞান লাভ করতে হলে তাকে অংকনবিদ্যার দ্বারস্থ হতে হয়। প্রকৌশলের (Engineering) ছাত্রকে যন্ত্রপাতি বা স্থাপত্য নির্মাণ সংক্রান্ত যে সব নক্সা তৈরী করতে হয়

তা সম্পূর্ণরূপে অংকন বিদ্যার উপর নির্ভরশীল। বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীকেও অংকন বিদ্যার দ্বারস্থ হতে হয় রূপজ্ঞান, বস্তুজ্ঞান, অভিনিবেশ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য। জীবনকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে নেওয়ার জন্য সাহিত্যের ছাত্রকেও অংকনবিদ্যার দ্বারস্থ হতে হয়। এইভাবে দেখলে দেখা যাবে যে শিল্পশিক্ষা নিছক কারিগর তৈরী করে না। পূর্ণাঙ্গ মানুষ তৈরী করতে সহায়তা করে। শিল্পশিক্ষার ভেতর দিয়ে যে অর্জিত সচেতনতা মানুষ লাভ করে তা যে কোনও বিষয় পাঠের অনুপূরক নয়, পরিপূরক। সুতরাং শিশু বয়স থেকেই শিক্ষার্থীকে অংকন বিদ্যায় শিক্ষালাভের সুযোগ দিলে ভবিষ্যত জীবনে একটি ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ তৈরী করা যায়।

আমরা তিনভাবে শিখি। শুনে শিখি, দেখে শিখি, করে শিখি। শিক্ষার এই তিনটি পদ্ধতি অনুসৃত হলে শিক্ষার্থী গভীর জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের দেশে কেবলমাত্র একটি পদ্ধতিই অনুসৃত হয়ে থাকে। তা হোল শুনে শেখা। দেখে বা করে শেখার কোনও ব্যবস্থা আমাদের দেশে না থাকার ফলে সারাবছর ধরে কেবল নোটপত্র মুখস্ত করে কে কত নম্বর আয়ত্ব করতে পেরেছে সেটাই হোল জ্ঞান অর্জনের একমাত্র মাপকাঠি। কিন্তু বিদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় দেখে ও করে শেখার উপর বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। সেই জন্য বিদেশের শিক্ষাপদ্ধতি অনেক বেশী প্রাঞ্জল এবং অনেক বেশী সরস।

উনিশ শতকের শেষের দিকে শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ যখন শান্তিনিকেতনে আসেন। তখন তাঁর শিষ্যবর্গ বহু মূল্যবান ছবি মূর্তি এবং অন্যান্য হাতের কাজ উপঢৌকন দিয়ে বিশেষ ভাবে সম্বর্ধনা জানান। তিনি তাঁদের সেই উপহারগুলি গ্রহণ না করে বলেছিলেন যে "আমি যত দিন এখানে থাকব প্রতিদিন যদি তোমরা একটি করে নতুন নতুন খেলনা আমাকে উপহার দাও আমি সব থেকে খুশি হব। কারণ আমাদের দেশে খেলনার অভাবে শিশুরা খেলতে পায় না। বিদেশে নিত্য নূতন খেলনা আবিষ্কার হয়, তাই ওদের দেশের ছেলেমেয়েরা খেলনার অভাব বোধ করে না। খেলতে খেলতে শিশুদের রুচীবোধ জাগ্রত হবে। খেলতে খেলতে তাদের মন শিল্পীত হয়ে উঠবে, নতুন নতুন সৃষ্টির পথে এগিয়ে যাবে"। তাঁর সেই আবদার তাঁর শিষ্যবর্গ রাখতে পেরেছিলেন কিনা জানা যায় নি। তবে তিনি শিল্পকে কিছু সংখ্যক ধনী সম্প্রদায়ের অট্টালিকার দেওয়ালসজ্জা রূপে ব্যবহার করার কথা না ভেবে শিশুদের হাতের কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন। শোনা যায় শিল্পগুরু যতদিন শান্তিনিকেতনে ছিলেন, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিদিন একটি করে নতুন নতুন খেলনা কিনে অথবা তৈরী করে শান্তিনিকেতনের শিশু শিক্ষার্থীদের উপহার দিতেন। উত্তরকালে অবশ্য সেই শিশুদের

অনেকেই তাদের নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে তাদের শিল্প নৈপুণ্যের পরিচয় রেখে গেছেন।

অতএব সর্বদিক বিচার বিবেচনা করে দেখলে দেখা যাবে যে শিল্প শুধুমাত্র কারিগর তৈরী করে না। শিল্প শুধুমাত্র অপ্রয়োজনের প্রয়োজন নয়। প্রয়োজনের প্রয়োজন, শিল্প জীবন বিকাশের উপায়, জীবন বিকাশের একমাত্র শর্ত্ত। শিল্প, শিক্ষার ভিত্তিভূমি সুতরাং শিল্পকে, শিক্ষার সঙ্গে একাসনে স্থান দেওয়া উচিত।

চারু ও কারু শিল্পশিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা আসে বিভিন্ন বিষয় পঠন পাঠনের উদ্দেশ্যে। প্রতিটি বিষয় পাঠের স্বতন্ত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকে। একক উদ্দেশ্য থেকে সামগ্রিক উদ্দেশ্য সফল হলে শিক্ষার্থীরা অখণ্ড জ্ঞানের অধিকারী হয়। শিক্ষার্থীকে অংক শেখানোর উদ্দেশ্য শুধুমাত্র তাকে ভবিষ্যত জীবনে হিসাবী করে গড়ে তোলা নয়। বরং তার মানসিক বিকাশ সম্ভব করে বুদ্ধিসত্তার স্ফুরণ ঘটিয়ে যাতে সে বিমূর্ত চিন্তায় পারদর্শীতা লাভ করে সেটাই হোল অংক শেখানোর একমাত্র উদ্দেশ্য। আবার ইতিহাস পড়ানোর উদ্দেশ্য নিছক ঐতিহাসিক করে গড়ে তোলা নয়, কতকগুলো রাজাবাদশার নাম মুখস্ত না করে সেই সময়কার মানুষের চরিত্র সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা। কোন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কোন ঘটনার অবতারণা। সেই সময়কার ঐতিহাসিক পটভূমি, রাজনৈতিক অবস্থা, ধর্ম সংগীত, শিল্পকলা প্রভৃতি বিষয়ে গভীর জ্ঞান লাভ করা ইত্যাদি। ঠিক তেমনি চারু ও কারু শিল্প শিক্ষার উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীকে দক্ষশিল্পী বা কারিগর করে গড়ে তোলা নয় বরং তার সুপ্ত শিল্পসত্বাকে জাগিয়ে তুলে তার সর্বাঙ্গীন বিকাশটিকে সম্ভব করে তোলা। শিল্প শিক্ষার উদ্দেশ্যকে দুভাগে ভাগ করে নেওয়া যেতে পারে। (১) প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য এবং (২) পরোক্ষ উদ্দেশ্য। শিক্ষার্থীকে হাতে কলমে কাজ করিয়ে তার দৈহিক, বৌদ্ধিক, নৈতিক ও সামাজিক দিকগুলির বিকাশসাধন সম্ভব করে তোলাই হোল শিল্প শিক্ষার প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য। অপর পক্ষে পরোক্ষ উদ্দেশ্য হোল—শিক্ষার্থীকে স্বাধীনতা দিয়ে তার মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের স্ফুরণ ঘটিয়ে একটি সুস্থ স্বাভাবিক মনের অধিকারী করে গড়ে তোলা।

শিল্প শিক্ষার লক্ষ্য একটাই, তা হোল চরম লক্ষ্য। সামান্য সৃষ্টির অসামান্য আনন্দলাভ।

এখন দেখা যাক। শিল্প শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশটি কিভাবে সম্ভব হয়ে উঠতে পারে :—

১. বৌদ্ধিক বিকাশ (Intellectual growth) :

বৈচিত্রে ভরা এই বিশ্বপ্রকৃতি। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, বর্ণ, প্রতি মুহূর্তে আমাদের মনে শিহরণ জাগায়। কিন্তু সব রূপ, সব রস, সব রং আমাদের মনকে স্পর্শ করতে পারে না। যেগুলো আমাদের মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করে যায়, সেগুলোকে আমরা বলি সুন্দর। শিশুর জ্ঞান হবার সঙ্গে

সঙ্গেই অবাক বিস্ময়ে এই প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে থাকে। সে যখন কোনও রঙীন ফুল বা প্রজাপতি দেখে তখন আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠে। তার মন বলে ওঠে সুন্দর। এই সুন্দর বলার সঙ্গে সঙ্গে শুধুমাত্র তার চোখ দুটো সক্রিয়তা লাভ করে না বরং চোখের পিছনে তার মনটিও সক্রিয় হয়ে ওঠে। একে বলা যেতে পারে "শিশুর সৌন্দর্য" বোধ। কিন্তু শিশু শুধু সুন্দর বলেই খান্ত থাকে না। তার মন চায় ঐরকম একটি ফুল বা প্রজাপতি, রং-এ রেখায়, পটের উপর ফুটিয়ে তুলতে। একে বলা হয় "শিশুর শিল্প সাধ"। কিন্তু শিশুর এই চাওয়া সহজে সম্ভব হয় না। এর জন্য তাকে কতকগুলি মানসিক অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করতে হয়। প্রথমে বিষয়টি বা বস্তুটি একটি ছন্দোবদ্ধ রূপে ধরতে হলে তাকে দেখার অভ্যাস তৈরী করতে হয়, যাকে বলা যেতে পারে পর্যবেক্ষণ শক্তির চর্চা (Observation)। এই দেখা শুধু মাত্র চোখের দেখা নয়। এতে মন ও বুদ্ধির প্রয়োজন হয়। বস্তুটির সঠিক রূপ, বর্ণ, ছন্দ মনে ধরে রাখার জন্য প্রয়োজন হয় স্মৃতিশক্তির চর্চা (Memory)। কিন্তু শিশু যা দেখে তাই আঁকে না, যা আছে বলে জানে তাই কল্পনার রং-এ রাঙিয়ে প্রকাশ করে। তখন এসে পড়ে কল্পনাশক্তি (imagination)। সমস্ত বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সম্পন্ন করতে, শিশুকে একাগ্রতার (concentration) অভ্যাস করতে হয়। পরে পরিমিতবোধ Logic বা যুক্তিবোধ শিশুকে পরিচালিত করে আসল বস্তুটি পটের উপর ফুটিয়ে তুলতে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে সৌন্দর্যবোধ, যে সৃজন স্পৃহাকে জাগরিত করে শিশুর বৌদ্ধিক বিকাশটি সম্ভব করে তোলে, তা কতকগুলি মানসিক গুণের অনুশীলনের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়।

২. দৈহিক বিকাশ (Physical growth)

শিশু শিক্ষার্থী যখন বিদ্যালয়ে যায় তখন প্রথমাবস্থায় বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে তার অস্পষ্ট ধারণা জন্মে। ক্রমশ বিভিন্ন বিষয় পঠনপাঠন ও মেলা-মেশার ভেতর দিয়ে সে প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী হয়। বিদ্যালয়ে ভিন্ন ভিন্ন বিষয় পঠনপাঠনের নিমিত্ত বিশেষ বিশেষ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ শিক্ষকরা থাকেন। শিক্ষক পড়ান, শিক্ষার্থীরা কানে শুনে যায়। এখানে শিক্ষক বক্তা এবং শিক্ষার্থী নীরব শ্রোতা মাত্র। কিন্তু চারু এবং কারুশিল্পের ব্যতিক্রম এখানেই। শুধু মাত্র চোখ দুটো আর হাতদুটো ছবি আঁকে না। বরং নানা ধরণের চারু ও কারু শিল্প যেমন কাঠের কাজ, ধাতুর কাজ, ভাস্কর্যের কাজ, বাগান পরিচর্চা প্রভৃতি অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যথাযথ ব্যবহার সংঘটিত হয়। এবং শিক্ষার্থী দৈহিক নিপুনতা অর্জনে সক্ষমতা লাভ করে।

৩. নৈতিক বিকাশ (Moral growth).

শিশু যখন প্রথম মাতৃগর্ভ থেকে ভূপৃষ্ঠে অবতরণ করে তখন সে থাকে আত্মকেন্দ্রিক, তারপর বহির্মুখী চিন্তাধারা তাকে বাইরের জগতের সঙ্গে পরিচিত করে। মার প্রথম চুম্বনে শিশু ভালবাসতে শেখে এই ভালবাসাই তার সারাজীবনকে প্রভাবিত করে। 'খারাপ' ও 'ভাল' সম্বন্ধে বোধ জাগায়।

শিশু যখন কোনও শিল্পকাজে অগ্রসর হয় তখন তাকে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। সে আপন বুদ্ধিবলে সব সমস্যার সমাধান করে, পরিচিত পারিপার্শ্বিক দিক থেকে সে তার শিল্প কর্মের রসদ সংগ্রহ করে, কাজটি সম্পন্ন করে এবং পরিশেষে নিজেই নিজের কাজের সমালোচক হয়ে ওঠে। অনুসন্ধান ও নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে তার কাজ অব্যাহত গতিতে এগিয়ে যায়। বিপরীত-মুখী অভিজ্ঞতার দ্বারা গঠিত ব্যক্তিসত্বা, তার ব্যক্তিত্বের মধ্যে সংবেদন (sensation), কল্পনা (imagination), অন্তর্দৃষ্টি (Intution) ও আবেগ, অনুভূতির (Feeling) বহিঃপ্রকাশ ঘটে। ব্যক্তিসত্বার সঙ্গে সামাজিকসত্বার মিলনে যে পূর্ণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়। ক্রমাগত শিল্পকর্ম গ্রহণ ও অনুশীলনের মাধ্যমে তার মধ্যে এক ধরণের আত্মবিশ্বাস ও স্বনির্ভরতা জেগে ওঠে। এই আত্মবিশ্বাস ও স্বনির্ভরতা তার নৈতিক চরিত্রকে দৃঢ়তর করে তোলে।

৪. সামাজিক বিকাশ (Social growth):

শিশু যখন বিদ্যালয়ে যায় তখন পরিপূর্ণভাবে সামাজিক দিকটির সাথে তার পরিচয় ঘটে। শিক্ষা যদি হয় সামাজিকতার বিকাশ তাহলে বিদ্যালয়কে বলা যেতে পারে একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। শিশু শিক্ষার্থী যখন খেলা-ধুলা বা কোনও সৃষ্টিমূলক কাজে অগ্রসর হয় তখন তার মধ্যে পরস্পর বিরোধী দুটি মনোভাব জেগে ওঠে। একটি প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব অপরটি সহযোগিতামূলক মনোভাব। প্রতিটি শিশুই নিজের কাজে প্রশংসা চায়, প্রশংসা না পেলে সে মনোক্ষুন্ন হয়। স্বীকৃতি পূর্ণমাত্রায় না পেলে তার মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব জেগে ওঠে। তখন যে সহশিক্ষার্থীদের কাজ অনুকরণ করতে চায়। শিক্ষক ও পিতামাতার লক্ষ্য রাখা উচিত যাতে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব সহযোগিতামূলক মনোভাবে পর্যবসিত করে শিক্ষার্থী সৃষ্টির কাজে অগ্রসর হয়। প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব যে একেবারেই থাকবে না, তা নয়। প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব না থাকলে কেউই জীবন যুদ্ধে জয়ী হতে পারে না। কিন্তু সর্বদা প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের পথ রুদ্ধ করে। নতুন নতুন সৃষ্টির পথে সে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে যেতে পারে না। এটাই শিশু শিল্পের সামাজিকতার একটি বিশেষ দিক।

আজ যে স্কুলের ছাত্র, আগামী কাল সেই সমাজের একজন বিশিষ্ট সভ্য। সুতরাং শিক্ষার্থী যে সমাজে লালিত পালিত, সেই সমাজের প্রতি তার একটা কর্তব্য থেকে যায়। এ প্রসঙ্গে শিল্পাচার্য নন্দলাল বোসের উক্তিটি প্রণিধান যোগ্য। তিনি আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন "শিল্পী শুধুমাত্র একজন চাকুরে নয়। সমাজকে শিল্পসচেতন করে তোলা তার কর্তব্য। সমাজে সুনীতি আছে, দুর্নীতি আছে। সবকিছুর ঊর্ধ্বে থেকে শিল্পীকে তার কাজ করে যেতে হবে। যদি কোনও সাহায্যের হাত এগিয়ে নাও আসে, তবুও তার পিছিয়ে পড়া চলবে না। উপকরণের জন্য তার চিন্তার প্রয়োজন নেই। পরিবেশ সে নিজেই তৈরী করে নেবে। সময় এবং সমাজ সব কিছু তার হাতের কাছে পেঁাছে দেবে।" কারণ আমরা জানি মানুষের মুখের ভাষা ফুটে উঠবার বহু আগেই ভাব প্রকাশের জন্য সে গুহার দেওয়ালে আঁচড় কেটেছে। কখনও বা ইঁট, কাঠ, পাথর দিয়ে তৈরী করেছে মন্দির, মসজিদ, ইমারত, অজস্র মূর্তি। কখনও বা ভাব প্রকাশের জন্য হাতে তুলে নিয়েছে রং, তুলি, ক্যানভাস, কাগজ কলম ইত্যাদি।

চিত্রশিল্পের রসানুভূতি

কোনও দেশের শিল্পের আবেদন, কোনও দেশ কালের সিমীত গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নয়। সেইজন্য এক দেশের শিল্প আর একদেশের মানুষের কাছে সহজেই আদরণীয় হয়ে ওঠে। যে কোনও দেশের শিল্পের রসবিচার করতে হলে একটি সুচিন্তিত পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে যেতে হয় যাকে ইংরেজীতে বলে Aesthetic Experience, কোন শিল্প বস্তুর বিচার বা বিশ্লেষণের বিশেষ কোনও মাপকাঠি নেই। যে যেমন দেখে, যার কাছে যেমন আবেদন সৃষ্টি হয়, সে সেইভাবে রস পায়, আনন্দ লাভ করে। তবে শিল্প রসানুভূতি লাভের জন্য শিল্প কি? তার বৈশিষ্ট কি? কি ধরণের উপাদানে ঐকটি শিল্পকর্মের সৃষ্টি হয়? শিল্পী তাঁর সৃষ্ট কর্মে উপাদানগুলিকে কি ভাবে কাজে লাগান? অর্থাৎ একটি শিল্পবস্তু সম্পর্কে খুঁটিনাটি বোধ যতক্ষণ না জন্মাচ্ছে ততক্ষণ শিল্পের রসাস্বাদন কোনওভাবেই সম্ভব নয়। তবে শিল্প বিচারের এগুলোই একমাত্র মাপকাঠি বললে ভুল বলা হবে। শিল্প রসানুভূতির যতগুলো পন্থা এ পর্যন্ত অনুশীলিত হয়েছে এগুলো তার মধ্যে একটি। যে সমাজে আমরা বাস করি সেই সমাজের কতগুলো ধ্যান-ধারণা আমাদের শিল্প রসানুভূতির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের সমাজে চিত্রকলা সম্বন্ধে মাতৃভাষায় উপযুক্ত বইয়ের অভাব। শিল্পীরা সাধারণত বড় বড় শহরে বাস করেন, সচরাচর তাঁদের শিল্প কর্ম দেখার সৌভাগ্য আমাদের হয় না। শিল্প-কলা সম্বন্ধীয় পত্র-পত্রিকা সম্বন্ধেও আমরা যথেষ্ট ওয়াকিবহাল নই। এই সমস্ত বাধা থাকার জন্য আমরা photography এবং painting কে একই স্তরের শিল্পবস্তু বলে মনে করি। শুধু আমরা কেন, অনেক শিক্ষিত উচ্চবিত্ত পরিবারও Photographic Realitic ছবি বহু সমাদরে দেওয়ালসজ্জা হিসেবে ব্যবহার করে, নিজেদের শিল্পরুচীর পরিচয় দিয়ে থাকেন।

চোখে যেমনটি দেখছি তার প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি করা ছবির কাজ নয়। তা হোল photography র কাজ। শিল্পী তার সৃষ্ট বস্তুকে আবেগ উদ্দীপনার সাহায্যে অন্তরের উত্তাপে উত্তপ্ত করে আমাদের কাছে উপস্থিত করেন, কোনও বস্তু বা দৃশ্যের নথি প্রমাণ আমাদের কাছে হাজির করেন না, photography বস্তুর বা দৃশ্যের তাৎক্ষণিক মুহূর্তকে ধরে রাখে। বাহ্য রূপের গহ্বরে যা লুকিয়ে আছে তার হদিশ ক্যামেরা দিতে পারে না, কিন্তু শিল্পী তা দিতে পারেন। আর শিল্পী তার সৃজনশীল প্রতিভার স্পর্শে কোনও বস্তু বা দৃশ্যকে অনাদি অনন্তকালের পরিপ্রেক্ষিতে ধরে রাখেন। Photography যান্ত্রিক,

Photographer যা দেখে তাই তার শিল্পবস্তু। কিন্তু শিল্পী যা দেখেন তাই দেখান না। যা দেখান তাই তার শিল্পকর্ম। একসময় গ্রীসে photographic realistic ছবি এমন এক উন্নত পর্যায়ে পেঁছিছিল যা পশুপাখী এমনকি মানুষকেও বিভ্রান্ত করত। একশিল্পী একতোড়া আঙ্গুরের ছবি এঁকেছিলেন তাই দেখে পাখীরা গাছ থেকে উড়ে এসে ঠোকরাতে শুরু করে। এক শিল্পী একটি দরজায় পর্দা আঁকেন, একজন দর্শক বিভ্রান্ত হয়ে পর্দা সরিয়ে ভেতরে প্রবেশ করতে সচেষ্ট হয়। এক শিল্পীর একটি ঘোটকীর ছবি দেখে দূরবর্তী একটি ঘোটক দ্রুতবেগে এসে তার সঙ্গে সঙ্গমে উদ্যত হয়। পরে অবশ্য শিল্প ইতিহাস পরিবর্তিত হয়। এই ধরনের কাজকে Skilled work বলে অভিহিত করা হয়। এতে বাহাদুরী আছে কিন্তু ওস্তাদি নেই। চোখকে ক্ষণিকের জন্য তৃপ্তি দিতে পারে। কিন্তু মনে কোনও আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে না। তাই এই ধরনের শিল্প, সৃষ্টির পর্যায়ভুক্ত নয়। বাহ্যরূপের গহ্বরে কি গুণাগুণ আছে, তার স্বরূপ কি? কোনও ঘটনার তাৎপর্য, এবং তার বিশেষ অবস্থা হোল ছবির ভাষা, শিল্পীর শিল্প কর্ম। প্রকৃতির মধ্যে যে সাজ, যে রূপ লুকিয়ে আছে, শিল্পী সেই সাজ, সেই রূপকে ভেঙ্গে নতুন সাজ, নুতন রূপ দেন। নুতন ভাষা আমাদের দেখতে শেখান, পড়তে শেখান। প্রতিকৃতি শিল্পে, শিল্পী ব্যক্তি বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যটিকে তার তুলিকার স্পর্শে জীবন্ত করে তোলেন যা ক্যামেরা শিল্পের ধরা ছোঁয়ার বাইরে।

এখন আলোচনা করা দরকার চিত্রের রসানুভূতির পথে কি কি বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এই বাধাগুলি সম্বন্ধে আমাদের ধারণা থাকলে আমাদের যে ভুলভ্রান্তি সেগুলি থেকে অনেকাংশে নিবৃত্ত হতে পারব এবং যে কোনও ছবির রস আহরণে সক্ষমতা লাভ আমাদের কাছে সহজ হয়ে যাবে।

(১) আমরা ছবি দেখতে গেলেই প্রথমে দেখি শিল্পী কোন গল্পের অবতারনা করেছেন। ছবিতে গল্প থাকবে না এমন কথা নয়। কিন্তু যে মানসিকতা নিয়ে আমরা ছবিতে গল্প খুঁজি সেটাই চিত্রবিচারের একমাত্র মাপকাঠি নয়। ছবিতে গল্প যদি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণনা করা হয় তাহলে তা আর ছবির পর্যায়ে পড়ে না সেটা তখন নিছক illustration হয়ে দাঁড়ায়। সার্থক বা কালজয়ী শিল্প যা, তাতে গল্প থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে। এ ব্যাপারে বিশ্ববন্দিত ছায়াছবির পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের ছায়াছবি সম্বন্ধে একটা কথা না বলে থাকা যাচ্ছে না, যদিও চিত্রশিল্পের সঙ্গে ছায়াছবির একটা ছোট পার্থক্য আছে। সত্যজিৎ রায়ের যতগুলি ছবি দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে সবগুলোই আমার কাছে অসাধারণ লেগেছে। তার কারণ তাঁর সব ছবিতেই নিটোল একটা গল্প খুঁজে পেয়েছি। যা বলছিলাম, ছবি তখনই

কালজয়ী হয় যখন শিল্পী মানবিক গুণের সঙ্গে সঙ্গে প্লাষ্টিক গুণগুলির যথাযথ বিন্যাস ঘটাতে পারেন। যেমন, রেখা, রূপ, পরিপ্রেক্ষিত, আলোছায়া ইত্যাদির সুষ্ঠু বিন্যাস সাধন।

(২) চিত্র রসানুভূতির আর একটি বাধা হোল আমরা যখন কোনও চিত্রকলার সামনে দাঁড়াই তখন সব থেকে গুরুত্ব দিই শিল্পীর ওস্তাদি, বাহাদুরীর উপর। আমরা মনে করি যে শিল্পী যতবেশী ওস্তাদি, কারিগরী ও বাহাদুরী দেখাবেন তিনি তত বড় শিল্পী এবং তাঁর সৃষ্টিই কালজয়ী ও রসোত্তীর্ণ। চিত্রকলাও নিঃসন্দেহে একধরণের হাতের কাজ। অন্যান্য কাজে যেমন কারিগরীবিদ্যা বা করণকৌশলের প্রয়োজন, চিত্রশিল্পেও সেইরকম কারিগরী বা করণকৌশলের প্রয়োজন হয়। কিন্তু নিছক কারিগরী বা করণ-কৌশলে ছবি হয় না। করণকৌশল আয়ত্ব করার সঙ্গে সঙ্গে চাই শিক্ষা। হাজার হাজার কারিগরের মধ্যে সবাই যেমন ওস্তাদ কারিগর হতে পারেন না। তেমনি হাজার হাজার চিত্রকরের মধ্যে কেবল দু'একজনই নিপুণ চিত্রকর হিসেবে স্বীকৃতিলাভ করেন। হাজারটা কাজের মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ তা বিচার করা সত্যিই কঠিন।

(৩) শিক্ষার্থী যখন প্রথম ছবি দেখতে শেখে তখন photograph ও painting র পার্থক্য বুঝতে পারে না। ফলে চিত্ররসানুভূতি তার পথ আগলে থাকে। এতে অবশ্য তাকে দোষী সাব্যস্ত করা উচিত নয়, কারণ এটা তার প্রথম চেষ্টা। কিন্তু যারা Academic শিল্পী বা শিল্প সমালোচক, Old master দের ছবি দেখে দেখে বিশ্লেষণে অভ্যস্ত, তারা টেকনিক ছাড়া আর কিছুই দেখতে পান না। তারা অতীতচারিতায় এত বেশী অভ্যস্ত যে নতুন কিছু চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেও দেখতে চান না। উহার মনোভাব নিয়ে অনাবৃত চোখে নতুন কিছুকে গ্রহন করতে পারেন না। ঠিক এই কারণেই যুগে যুগে শিল্প ইতিহাসে যে বিবর্তন হয়েছে তার একমাত্র শত্রু হচ্ছে এই Academician রা। নতুন জিনিষকে নতুনভাবে দেখার অভ্যাস করা যে কতটা কঠিন তা যাঁরা শিল্পরসানুভূতিতে অগ্রসর হয়েছেন তাঁরাই জানেন।

অনুভূতি সম্পর্কে মনোবিজ্ঞানীরা যে রায় দিয়ে দেন তা একটু বল্লেই সব সন্দেহের নিরসন ঘটবে। বহির্জগতের নতুন নতুন অভিজ্ঞতা আমাদের ইন্দ্রিয় পথ দিয়ে এসে আমাদের মনের মণিকোঠায় জমা হয় সেই জন্য আমাদের মনটাকে বলা হয় অনুভূতির যন্ত্র। যতক্ষণ এই অনুভূতিগুলিকে ব্যাখ্যা করতে পারি বা বিশ্লেষণ করতে পারি ততক্ষণ এগুলির কোনও মূল্যই থাকে না। ব্যাখ্যা তখনই করা যায় যখন স্মৃতি থেকে পুরোনো অভিজ্ঞতাকে নতুন অভিজ্ঞতার সঙ্গে যাচাই করে তার মূল্য নিরূপন করি। আমরা যে প্রকৃতির

মধ্যে ঘুরে বেড়াই, সেখানে অজস্র দৃশ্য, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ আমাদের মনের মণিকোঠায় এসে আঘাত করে। সবগুলোকে নিয়ে এসে কোনও শিল্পকাজে লাগালে একটা জগাখিচুড়ী রূপ পায়। শিল্পীকে শিল্পসৃষ্টির জন্য পুরোনো অভিজ্ঞতা ও নতুন অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে ঝাড়াই বাছাই করতে হয়। যখন যেমন প্রয়োজন তখন তেমন অনুভূতিকে শিল্পকাজে লাগানোর জন্য তলব পড়ে। তার থেকেই নতুন নতুন রূপে প্রকাশিত হয়। আমরা যখন রেলগাড়ীতে উঠি তখন ওঠামাত্রই সঙ্গে সঙ্গে কে কোথায় বসেছে, কোথায় পাখার সুইচ আছে কোথায় কোন যন্ত্রপাতি আছে ইত্যাদি স্পষ্টভাবে দেখতে পাই না। প্রথম অবস্থায় সব তালগোল পাকিয়ে যায়। বেশ কিছুক্ষণ যাওয়ার পর আস্তে আস্তে সব পরিষ্কার হয়ে যায়। তার মানে এই নয় যে যিনি এগুলি পরিষ্কারভাবে দেখতে পারছেন তার তুলনায় আমাদের ইন্দ্রিয় কম শক্তিশালী। হয়ত তার চেয়ে আমাদের ইন্দ্রিয় অনেক বেশী তীক্ষ্ণ অনেকবেশী সংবেদনশীল। কিন্তু আমরা দেখতে পারছি না, তার কারণ আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে এই দেখায় অভ্যস্ত করে তুলতে পারিনি।

তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে চিত্রদর্শনের উপযোগী করে তুলতে হলে বিশেষভাবে দেখার অভ্যাসে অভ্যস্ত করে তুলতে হবে। হয়তো পথ দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ কোনও বাড়ী থেকে বিদেশী কোনও গান শোনা গেল। পথ অতিক্রমের সময় তার কথা, সুর, মূর্চ্ছনা সম্বন্ধে একটা সাধারণ ধারণা পেলাম। কিন্তু তার সঠিক রস থেকে বঞ্চিত হলাম। কারণ এই ধরনের গান শোনায় আমরা অভ্যস্ত নই বলেই রস পেলাম না। ঐ গান যদি ক্রমাগত শোনা যায় তাহলে বিদেশী গানের যে মাধুর্য তা আমাদের মনকে পুলকিত করবেই।

এ প্রসঙ্গে শিল্পাচার্য "নন্দলাল বোসের" উক্তিটি প্রনিধান যোগ্য। তিনি বলেছেন "ছবি দেখতে শেখা যেমন কঠিন আঁকতে শেখাও সেই রূপ কঠিন। প্রথম অবস্থায় নদীর কাছে যাও সে তোমার থেকে দূরে সরে যাবে। আকাশের কাছে যাও সে তোমার দিকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। বার বার যাও আর ধ্যান কর আপনা থেকেই ওরা তোমার মনের ক্যামেরায় এসে ধরা দেবে।"

অনেকে মনে করেন শিল্প হোল শিল্পীর খামখেয়ালীপনা বা অবাস্তব মন জগতের প্রতিফলন, কিন্তু শিল্প সম্বন্ধে যার সঠিক ধারণা ও বোধ আছে তিনি শিল্পকে কখনই খামখেয়ালীপনা বা উদ্ভব কল্পনার প্রতিচ্ছবি বলবেন না। যিনি ছবি আঁকেন আর যিনি ছবি দেখেন দুই ব্যক্তির চিন্তাধারার ফারাক থাকতে পারে, কিন্তু ফারাক সত্বেও যিনি ছবি দেখেন তিনি যদি শিল্পীর পরিশ্রমের সমতুল্য অভিজ্ঞতা ও অভ্যাসে অভ্যস্ত হতে পারেন বা সমতুল্য কষ্ট স্বীকার করতে রাজী থাকেন তাহলে ছবি দেখতে শেখা তার কাছে অনেক

বেশী সহজ হয়ে ওঠে। একজন বিজ্ঞানী আর একজন প্রতিভাবান শিল্পীর মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। ভাবাবেগের বশে ছবির বিচার করা যায় না। শিল্পীর শিল্পরসে অবগাহন করতে হলে একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। বৈজ্ঞানিক যেমন তার যন্ত্রপাতি ও অঙ্ক শাস্ত্রের সাহায্যে আমাদের চোখে নতুন বিশ্বের স্বরূপ উন্মোচন করেন, শিল্পীও ঠিক তেমনি তাঁর নিজস্ব যন্ত্রপাতির সাহায্যে পুরোনো পৃথিবীকে নতুনভাবে তুলে ধরেন আমাদের সামনে। বৈজ্ঞানিকদের মনের জগত যেমন মনগড়া নয় তেমনি শিল্পীর ছবিও খেয়াল খুসীপনা, উদ্ভট কোনও বস্তু নয়। তিনি কি ভাবে সমস্ত উপাদানগুলি ব্যবহার করেন, কি উপায় অবলম্বন করেন, কোথায় তার সাফল্য তা আমাদের জানা দরকার। তাহলেই চিত্রশিল্পের রসাস্বাদন আমাদের কাছে সহজ হয়ে যাবে।

এখন চিত্রশিল্পে কি কি প্ল্যাষ্টিক গুণ কাজ করে সেগুলো সম্বন্ধে বিশদ আলোচনার প্রয়োজন। মানবিক গুণ (Human quality) হোল কোনও গল্প, ঘটনা বা ঐতিহাসিক সত্য, বা কোন পৌরাণিক আখ্যান ইত্যাদি। এগুলোকে অদল বদল করার কোনও উপায় নেই। যে ভাবেই শিল্পী কাজ করুন না কেন গল্পর ইচ্ছে মত ভাঙ্গচুর তার আয়ত্বের বাইরে। একই গল্প বা কাহিনী নিয়ে যুগে যুগে বহু শিল্পী বহু কাজ করে গেছেন। তাতে তাদের সৃজনশীলতায় কোনও বাধা আসেনি।

আর প্লাষ্টিক গুণ (Plastic Quality) বলতে যা বোঝায় তা হোল রেখা, ফর্ম বা আকার, বর্ণ, পরিপ্রেক্ষিত, আলোছায়া ইত্যাদি। এই প্লাষ্টিক গুণগুলির উপর শিল্পীর আধিপত্য অনেক বেশী। এগুলিকে ছবিতে তিনি ইচ্ছেমত ব্যবহার করতে পারেন। আর এগুলির ইচ্ছেমত ব্যবহারের উপরই নির্ভর করছে শিল্পীর কৃতিত্ব।

চিত্রশিল্পের উপাদান সমূহ

(১) রেখা (Line)

কোনও শিল্প বস্তুর দিকে তাকালে তা আমাদের আনন্দ দেয়। কিন্তু প্রতিটি শিল্প বস্তুর নিজস্ব একটি সংজ্ঞা আছে, রেখা সেই সংজ্ঞাটি পরিস্ফুট করতে সহায়তা করে। রেখা ছবিতে ফর্মের অস্তিত্বকে প্রকাশ করে, ফর্মের মধ্যে থেকে ফর্মের প্রতিটি স্তরের নির্দেশ দেয়, তার জীবন্ত অস্তিত্বকে প্রকাশ করে। রেখা নিজের গতি পরিবর্তন করে না, আমাদের মনের গতি পরিবর্তিত হয়। এখন প্রশ্ন হোল রেখার সৃষ্টি হোল কি ভাবে? এর উত্তরে বলা যায় প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষেরা যখন পাথরের অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে শিকারের উদ্দেশ্যে ধাবমান জন্তুর পেছনে ছুটতো তখন ধাবমান জন্তুর গতি এবং নিজের গতির মধ্যে একধরনের কর্ষশক্তি (Tention) অনুভব করেছিল, সেই কর্ষশক্তি থেকেই রেখার উৎপত্তি। তারপর এসেছে জ্যামিতি।

শিল্পী **টমাস ইকিন্স** বলেছেন "There are no lines in nature —There are only form and colour." অর্থাৎ আমাদের এই দৃশ্যমান জগতে রেখার কোনও অস্তিত্ব নেই। তবে বস্তুর আকারকে রেখা দিয়ে সহজে বোঝানো যায় বলেই চিত্র শিল্পে রেখা বাঙময় হয়ে উঠেছে। শিল্পীর ভাব-কল্পনা ও প্রেরণা রেখার সাহায্যেই সেতুবন্ধ রচনা করে।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এই দুই প্রান্তের চিন্তাধারার ভিন্নতা অনুযায়ী চিত্র শিল্পে কোথাও রেখাকে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে কোথাও বা আলো-ছায়ার বিন্যাস ঘটানো হয়েছে। প্রাচ্য শিল্পীরা ভাববাদী, কল্পনার স্থান এখানে অসীম। তাই প্রাচ্যের শিল্পীরা দ্বিমাত্রিক পরিসরের উপর বস্তুর দ্বিমাত্রিক ভাবকে ফুটিয়ে তোলার জন্য রেখার বিন্যাস ঘটিয়েছেন। পাশ্চাত্য শিল্পীরা বাস্তববাদী, কল্পনার স্থান সেখানে সীমিত। তাই দ্বিমাত্রিক পরিসরের উপর বস্তুর ত্রিমাতৃক ভাবকে ফুটিয়ে তোলার জন্য আলোছায়ার উপর বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করেছেন। সেইজন্য বলা হয় "Western Art is an Art of Mass, Indian Art is an Art of Line." প্রাচ্যের সমস্ত চিত্রকলাই রেখাভিত্তিক। যেমন রাজপুত, মোগল, অজন্তা প্রভৃতি চিত্রে সমান দৈর্ঘ্য, প্রস্থ বিশিষ্ট সূক্ষ্মতারের মত গতিশীল রেখার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। একে বলা হয় Silver Point Technic. শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুও তাঁর চিত্রে এই ধরনের রেখা ব্যবহার করেছেন। শুধু ব্যবহার বললে ভুল বলা হবে। তিনি

সারাজীবন ধরে অজস্র রেখাচিত্র অংকন করেছেন যার জন্য ভারতবর্ষে তাঁকে "সাবলীল রেখা রচনার রাজা" বলে অভিহিত করা হয়। চীনা এবং জাপানী শিল্পীরা তাদের অনুসৃত রেখার ব্যবহারে দৃশ্যচিত্রে কাব্যিক ভাব ফুটিয়ে তুলতে সমর্থ হয়েছেন। এখানে রেখা খুব দ্রুত এবং অনুভূতিশীল। কোথাও মোটা কোথাও সরু ঠিক যেন বসন্তের মাতাল বাতাসে উড়ন্ত কোনও চুলের ফিতে। এ ধরনের রেখাকে বলা হয় Calligraphy রেখা। শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ তাঁর ছবিতে এই Calligraphy রেখাকে অনুসরণ করেছেন বলে জানা যায়। অপরপক্ষে শিল্পী যামিনী রায় তাঁর ছবির সর্বত্র সমান প্রস্থ যুক্ত ভুষোকালির মোটা রেখার মাধ্যমে ফর্মকে এমন এক বাঁধনে বেঁধেছেন যাতে রেখা ও ফর্ম মিলে এক আঁটসাঁট design সোচ্চার হয়ে উঠেছে। এজন্য যামিনী রায় কোনও দেশের চিত্রকলাকে অনুসরণ করেন নি। এটা সম্পূর্ণরূপে তাঁর নিজস্ব। এ ধরনের রেখাকে বলা যায় Architectonic রেখা। অপরপক্ষে পাশ্চাত্য দেশীয় সমস্ত শিল্পীই তাদের ছবিতে রেখার পরিবর্তে আলোছায়ার বিন্যাস ঘটিয়েছেন। পাশ্চাত্যের যে দুজন শিল্পী রেখাভিত্তিক ছবি এঁকেছেন তাঁরা হলেন বত্তিচেল্লী ও পিকাসো। পিকাসো অবশ্য কোনও বিশেষ রীতিপদ্ধতিতে আবদ্ধ থাকেন নি। তিনি অনবরত তাঁর style পরিবর্তন করেছেন। রেখার উপর তাঁর অসামান্য দখল ছিল বলেই এটা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছে।

রেখার ভাব প্রকাশ ক্ষমতা অপরিসীম। আনুভূমিক (Horizental) স্থানের উপর সরলরেখা লম্বরূপে ব্যবহার করে প্রশান্ত ভাবের প্রকাশ করা যায়। প্রাচীন মিশরীয় চিত্রে এই ভাব লক্ষ্য করার মত। আবার সরল রেখাকে কর্ণরূপে গ্রহণ করে উত্তেজক অনুভূতির সৃষ্টি করা যায়, বা রাগ সংগীতে আরোহন-অবরোহণের মুহূর্তকে পরিস্ফুট করা যায়।

ছবির ক্ষেত্রে রেখা ছন্দই মুখ্য ও প্রাথমিক। যদিও সরলরেখার সমষ্টিকে একটি ছন্দোবদ্ধ অবস্থায় আনা যায়, তবুও বঙ্কিম রেখার ছন্দে দৃষ্টি যত তৃপ্তি পায়, সরলরেখার ছন্দে ততটা তৃপ্তি অনুভব করা যায় না। বক্ররেখার ছন্দে সংখ্যাতীত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখার সমন্বয়ে শিল্পী প্রকৃত রসের সন্ধান দিতে পারেন।

রেখা, দ্রুত, অনুভূতিশীল ও উদ্দীপক, রেখা ছবির সংক্ষেপীকরণ ঘটায়, বিমূর্ততা প্রকাশে সহায়তা করে। সেই জন্য রেখাকে বলা হয় Pictorial short hand। মাত্র সামান্য কয়েকটি তুলির আঁচড়ে অনেক গভীর ভাব ব্যঞ্জনাকে পরিস্ফুট করা যায়। পরিশেষে এই কথা বলা যায়, যে রেখা যখন গতি পায় তখন সৃষ্টি হয় ছন্দ, রেখা যখন আকার পায় তখন সৃষ্টি হয় রূপ আর রেখা যখন উপলব্ধিকৃত হয়ে যায়, তখন সৃষ্টি হয় রস।

(২) রূপ (Form)

রেখা যখন আকার পায় তখন সৃষ্টি হয় রূপ বা ফর্ম। কিন্তু ফর্ম কথাটির অর্থ সবার কাছে পরিষ্কার নয়। সাধারণভাবে আমরা বলি "There is From as soon as there is shape" অর্থাৎ ফর্ম মানেই Shape বা আকৃতি। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। চিত্রশিল্পের মধ্যে Shape বলতে আমরা বুঝি দ্বি-মাত্রিক আকার। আর ফর্ম বলতে বোঝায় ত্রি-মাত্রিক আকার। সাধারণভাবে ফর্ম বা রূপ বলতে বোঝায় সেই বস্তুকে যে নিজস্ব বৈশিষ্টকে ফুটিয়ে তোলে। যেমন আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত চেয়ার, টেবিল, রেল-ইঞ্জিন, এরোপ্লেন। ছবি বা সংগীতের রাগ অথবা পূর্ণাঙ্গ একটি ভাস্কর্য।

বিশ্ব চরাচরে যাবতীয় বস্তু আমাদের চোখে পড়ে প্রতিটি বস্তুর যেমন নিজস্ব বৈশিষ্ট আছে তেমনি নিজস্ব ভঙ্গিও আছে। আকার আছে ভঙ্গি নেই, ভঙ্গি আছে আকার নেই। এরকম কথা বড় একটা ভাবা যায় না। বস্তুর দিক দিয়ে বিচার করলে আকারগুলিকে বলি গুণ, আর অভিজ্ঞতার দিক দিয়ে বলা যায় অনুভূতি। ধরা গেল একটি চেয়ার। চেয়ারের রং বাদামী, আলো-ছায়ার পরিপ্রেক্ষিতে তার রং বদলায়। শক্ত মসৃণ কাঠের তৈরী আড়াই ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট এই বস্তুটিকে যখন শুধু চর্ম চক্ষে দেখি তখন উপরিউক্ত গুণ-গুলির সমষ্টিমাত্র বোঝায় না। তার কারণ এই গুণগুলি অন্যান্য বস্তুতেও থাকতে পারে। যখন চেয়ারের অবস্থিতি উক্ত গুণগুলির সমন্বয়ে একটা বিশেষ অনুভূতি আমাদের মনে এসে পৌঁছায় যা চেয়ারটির নিজস্ব রূপ তখনই তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব, নিজস্ব বৈশিষ্টটি আমাদের কাছে প্রকাশ পায় তখন চেয়ার সম্বন্ধে সেই অভিজ্ঞতাকে আমরা ফর্ম বলতে পারি।

শিল্প বলতে বোঝায় To take shape। যে বস্তুর নিজস্ব একটা রূপ আছে, স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট ফুটিয়ে তোলে এবং আমাদের মনে আনন্দের সঞ্চার করে তাকেই আমরা শিল্প বলি। এই অর্থে কোনও ছেলে বা মেয়ে যখন ভাল ছবি আঁকে, ভাল খেলে, ভাল গান গায়, তখন আমরা বলি He or She is shaping as a player or a painter or a sculptour। তার অর্থ হোল He or She can see, hear andact quickly and efficiently এক কথায় He or She is in good Form.

কোনও বস্তু বা কোনও আকস্মিক ঘটনা কোনও ফর্ম হতে পারে না। যেমন আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে একটি শহর বা নগর একটি বিশেষরূপ পেয়েছে। ভূমিকম্পে একটি এলাকা ছিন্নভিন্ন হয়ে একটি আকার নিয়েছে। অতিরিক্ত বরফ পড়ার ফলে একটি জলাশয় নতুন আকার লাভ করেছে। এই ধরনের আকৃতিকে কোনও মতেই শিল্পকাজের উপযোগী ফর্ম বলা যাবে না। এগুলো

হোল accidental Form। যেমন মানুষ বলতে ভারতীয় বা ইংরেজ, মুসলমান বা হিন্দু, ইঞ্জিনীয়ার বা ডাক্তার, বিবাহিত বা অবিবাহিত বোঝাতে পারে। কলকাতা শহরও বটে, বন্দরও বটে। প্রত্যেক ক্ষেত্রে মানুষকে বা কলকাতাকে যে ভাবে দেখতে চাই তার উপরই মানুষ বা কলকাতার ফর্ম নির্ভর করছে। এ ক্ষেত্রে একটিমাত্র ফর্ম হতে পারে না। আমরা মানুষ বা কলকাতার কোন্ রূপটি তুলে ধরতে চাই, কতটুকু বর্ণনা করতে চাই তা আমাদের উপর নির্ভর করছে। যত বিচিত্র ভাবে দেখব তত বিচিত্র ফর্মের সৃষ্টি হবে। প্রতিটি বস্তুর মধ্যে বিচিত্র ফর্ম আবিস্কার করতে পারব।

ফর্মের কথা ভাবলেই সেই বস্তুর চারিত্রিক বৈশিষ্টের কথা মনে আসে, রূপ সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট হয়। উদাহরণস্বরূপ ধরা যেতে পারে ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষ অনেকগুলি প্রদেশ নিয়ে গঠিত। এখানে সমগ্র রূপ বা ফর্মটি হচ্ছে ভারতবর্ষ এবং প্রদেশগুলি হচ্ছে তার শাঁস। আবার প্রদেশগুলি যখন ফর্ম হয় তখন তার বিভিন্ন জেলাগুলি হয় শাঁস বা বস্তু। চিত্রশিল্পে ফর্ম এই ভাবে ভেঙ্গে ভেঙ্গে ছোট থেকে আরও ছোট ফর্মে আনা যায়। যেমন চিত্রপটে সমস্ত জায়গা জুড়ে প্রতিভাত হয় প্লাষ্টিক ফর্ম। তার মধ্যে রঙে রেখায়, পটে সৃষ্টি হয় সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম ফর্ম। অনেকটা যেমন কোনও জীবন্ত শরীরের কোষ থেকে সরিয়ে আনা ভেতরের সামগ্রিক রূপটি।

চিত্রশিল্প প্রকৃতির সৃষ্টি নয়, মানুষের সৃষ্টি। মানুষের মনে প্রকৃতি যে ছাপ ফেলে শিল্পী তাকে মনের মাধুরী মিশিয়ে রং-এ রেখায় রূপ দেয়। অর্থাৎ তাকে গড়ে পিটে নতুনভাবে আমাদের সামনে হাজির করেন। আমরা তাই দেখে আনন্দ পাই। এখন প্রশ্ন হোল কি ধরনের ফর্ম শিল্প কাজের উপযোগী। কোন্ ফর্ম আমাদের অনুভূতিকে আনন্দ দেবে বা নাড়া দেবে, ব্যাপারটা দর্শকদের রুচি, অভিজ্ঞতা ও মানসিকতার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। একজনের যা ভাল লাগে, অন্যজনের তা ভাল নাও লাগতে পারে। কারণ প্রতিটি মানুষ দেহমনের দিক থেকে একে অপরের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। একজনের কাছে যা অমৃত, অন্যজনের কাছে তা বিষময় হতে পারে। সুতরাং এ প্রশ্ন অবান্তর। ভাল ছবি দেখতে দেখতে মানুষের নিজস্ব রুচি তৈরী হয়ে যায়, তখন কোনটা সুন্দর কোনটা কুৎসিৎ আপনা থেকেই এই বোধ জন্মায়।

প্রাকৃতিক বস্তু যেমন, স্ফটিকের গঠনাকৃতি বা উদ্ভিদের গঠনাকৃতি যে নিয়মে বেড়ে ওঠে, যে নিয়মে মৌমাছি নিজের চাক তৈরী করে সেই নিয়ম অনুপাতের মধ্যেই নিহিত থাকে গাণিতিক ফর্মের রহস্য, গাণিতিক ফর্মই হোল বিশুদ্ধ বা খাঁটি ফর্ম। যার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় প্রকৃত সৌন্দর্য। এই বিশুদ্ধ ফর্ম নিয়েই শিল্পীরা যুগে যুগে চিন্তা-ভাবনা করে গেছেন, কাজ করে গেছেন। যুগান্তকারী শিল্প আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন, শিল্প ইতিহাসে

যার পরিচয় মেলে। এ প্রসঙ্গে Plato-র উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন—"Whose ratio or beauty was inherrent in the nature of Lining things and imitation of Lining things by an absolute form he meant a shape or obstraction consisting of straight Lines & curves. অর্থাৎ সরলরেখা ও বক্ররেখার সমন্বয়ে যে বিমূর্ত ফর্মের সৃষ্টি হয় তাই হোল বিশুদ্ধ ফর্ম। যা উত্তর ইম্প্রেশনিষ্ট যুগের শিল্পী Paul Cezzane এর শিল্প ফর্মে প্রত্যক্ষ গোচর হয়। পরে অবশ্য তাঁর আদর্শেই যুগান্তকারী ঘনকবাদের সৃষ্টি হয় যা সমস্ত কালের সমস্ত দেশের শিল্প রসিকদের কাছে বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

(৩) বর্ণ (Colour)

জন্মসূত্রেই আমরা বর্ণ-বৈচিত্রে ভরা এই বিশ্ব প্রকৃতির সঙ্গে পরিচিত। প্রকৃতিতে এমন কোনও বস্তু নেই যার নিজস্ব কোনও বর্ণ নেই। রূপ ও বর্ণ একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। রেখা ছবিতে গতিশীল ছন্দের সৃষ্টি করে, রূপকে প্রাণবন্ত করে তোলে, রূপময় জগতের নির্দেশ দেয় আর বর্ণ রূপের বাহ্যিক বৈশিষ্টকে প্রকাশ করে চিত্রভাষাকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করে তোলে। বর্ণ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে Ruskin বলেছেন—"All men completly organised and justly tempered enjoy colour, it is meant for the perpetual comfort and delight of the human heart, it is richly bestowed on the highest works of creation." অর্থাৎ যে কোনও সুস্থ স্বাভাবিক মানুষই বর্ণ পছন্দ করে। বর্ণ প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে অসীম তৃপ্তি ও আরাম বোধ করে। সৃষ্টির অতি উচ্চস্তরে বর্ণের মূল্য অপরিসীম।

শিশুদের জন্মগত ভাবেই বর্ণের প্রতি একটা সুতীব্র আকর্ষণ ও স্বাধীন ধারণা থাকে। তাই ছবি আঁকার সময় আগ্নেয়গিরির রং দেয় লাল, আকাশের রং দেয় নীল, গাছের রং দেয় সবুজ। যদিও আগ্নেয়গিরি কালো, গাছ বাদামী এবং আকাশের রং ধূসর হতে পারে। শিশুদের ব্যবহৃত এই রং কে বলা যেতে পারে Natural Colour। প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষেরা তাদের ছবিতে এই ধরনের বর্ণ ব্যবহার করেছেন।

বর্ণ আলোক রশ্মির পরিপ্রেক্ষিতে আকার বা রূপের উপর একটা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। তা আমাদের চোখের অক্ষিপটে এসে আঘাত হানলে আমরা বর্ণ সম্বন্ধে একটা আমেজ অনুভব করি। কোনও একটা বিশেষ বর্ণ আমাদের চোখ ও মনকে তৃপ্তি দিতে পারে না। অনেকগুলি বর্ণের সমন্বয়ে আমাদের চোখ তৃপ্তি পায়, মনকে আরাম দেয় কারণ অনেকগুলি বর্ণের

বোধশক্তি অনেক বেশী সৌন্দর্য বর্ধক, অনেক বেশী নান্দনিক। স্বভাবতই বর্ণের গতি আমাদের আবেগকে পরিচালিত করে। যেমন লালবর্ণ ক্রোধের প্রতীক নীল আমাদের মনকে শান্তশ্রীতে ভরিয়ে দেয়, মনকে নিমজ্জিত করে অনেক গভীরে, আবার হলুদ আনন্দকে প্রতীকায়িত করে।

বর্ণের দুটো দিক আছে (১) শরীরতত্ত্বের দিক (Physiological aspect), (২) মনস্তত্ত্বের দিক (Psycological aspect)। বর্ণ আলোক রশ্মির পরিপ্রেক্ষিতে আকারের উপর যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে তা আমাদের অক্ষিপটে এসে আঘাত হানলে বা উন্নত স্নায়ু কেন্দ্রে পৌঁছালে বর্ণের চরিত্রগত বৈশিষ্টটি অনুভব করা যায়। এটা হোল বর্ণের শরীর তত্ত্বের দিক। অপরপক্ষে বর্ণলেপনের মাধ্যমে মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, রাগ-অনুরাগ প্রভৃতি মনের বিভিন্ন অবস্থাকে প্রকাশপটু করে তোলা যায়। অবশ্য কিছু কিছু ব্যক্তির বর্ণ সম্বন্ধে কোনও সুস্পষ্ট বোধ থাকে না। তাদেরকে Colour Blind বা বর্ণান্ধ বলা যেতে পারে। তারা Colour association এর মাধ্যমে বর্ণ পছন্দ করে থাকেন। যেমন অনেকে সবুজ পছন্দ করেন, কারণ সবুজ বসন্ত কালের কথা মনে করিয়ে দেয়। অনেকে নীল পছন্দ করেন, কারণ নীল আকাশের কথা মনে করিয়ে দেয়। অনেকের কাছে লাল ভীতির উদ্রেককারী, কারণ লাল উন্মাদ ষাঁড়ের কথা মনে করিয়ে দেয়। বর্ণ পছন্দ অপছন্দ সবটাই নির্ভর করে মানুষের মেজাজ মর্জির উপর। এই মেজাজ অবচেতন মনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

বর্ণকে বলা যেতে পারে চিত্রশিল্পের কারিকাশক্তি। রেখা, পট, টোন— এগুলি বর্ণেরই রকমফের অবস্থা। চিত্রশিল্পে বর্ণের বৈচিত্র, ঐশ্বর্য এবং হার্মনীর সমন্বয়সাধন ঘটলে চিত্রশিল্পের প্লাষ্টিক গুণ অনেক বেশী বেড়ে যায়। ছবির বিভিন্ন অংশে খন্ড খন্ড ভাবে ছবির বিভিন্ন উপাদানে ব্যবহৃত হয়ে ছবির মূল্যবোধকে অনেকাংশে বর্দ্ধিত করে। তখন অতি সামান্য তুচ্ছ বস্তুও বর্ণের সার্থক প্রয়োগে এত বেশী মহনীয়তা লাভ করে যা বার বার দেখেও আশা মেটে না। অথচ তারই মধ্যে বর্ণের এক একটি নিজস্ব স্বত্বা বজায় রেখে বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য স্বাতন্ত্রের মধ্যে একাত্মতার সৃষ্টি করে, ছবির ভাষাকে ঈপ্সিত স্পষ্ট রূপ এনে দেয়।

বর্ণ সুরের ঐক্যতান সৃষ্টি করে। স্বরগ্রামের উঠানামা নির্ভর করে সংগীত শিল্পীর বোধ শক্তির উপর। বর্ণ-বৈচিত্র সৃষ্টি করা নির্ভর করে চিত্র শিল্পীর বোধ শক্তির উপর। সুরের বর্ণালীর মত বর্ণের বর্ণালীও সৃষ্টি করা যায়। সুক্ষ্মাতি সুক্ষ্ম সুরতরঙ্গের সৃষ্টি একমাত্র দক্ষ সুরশিল্পীর পক্ষেই সম্ভব। তারা সুরলহরীর গভীরে প্রবেশ করে যেমন পরমাত্মার কাছে পৌঁছে দিতে পারেন তেমনি দক্ষ চিত্রশিল্পীও রং-এর পাশে রং ব্যবহার

করে সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম তালে ভাগ করে সেই সুরলোক সৃষ্টি করতে পারেন। সংগীত কলার মধ্যে যেমন সনাতন, ভাটিয়ালী, পল্লীগীতি, রবীন্দ্রসংগীত ইত্যাদি প্রচলিত আছে তেমনি চিত্রশিল্পেও সনাতনীপট, আল্পনা, পোস্টার ইত্যাদি চিত্র প্রচলিত আছে। যদিও ভাব ও উদ্দেশ্য পৃথক তবুও বর্ণ লেপনের নিজস্ব রীতির মধ্যে থেকে একে অপরকে সাহায্য করা যায়। মানব দেহ ভগবানের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। সেই কারণেই মানব দেহকে মার্গসংগীতের সঙ্গে তুলনা করা চলে। তাই শিল্পীরা যুগ যুগ ধরে মানব দেহকেই তাদের শিল্পকাজের উপজীব্য বিষয় হিসেবে গ্রহণ করে আসছেন।

বর্ণের উৎপত্তির উৎস হোল সূর্যের আলো। সূর্য রশ্মির সামনে প্রিজম ধরলে সূর্যের সাদা আলো থেকে সাতটি রং পাওয়া যায়। বিজ্ঞানীরা বর্ণকে এইভাবেই বিশ্লেষণ করেছেন। আলোর পরিপ্রেক্ষিতে যে রংগুলি আমাদের চোখে এসে লাগে সেগুলোকে বর্ণালী বা Spectrum বলে। বর্ণালীজাত সাতটি রং হলো বে, নী, আ, স, হ, ক, লা, অর্থাৎ বেগুনী, নীল, আসমানি, সবুজ, হলুদ, কমলা, লাল।

চিত্রে বর্ণ ব্যবহারের সময় বিশেষ দুটি দিকের কথা মনে রাখতে হবে। আমাদের চোখ আর উন্নত স্নায়ুকেন্দ্র যার মাধ্যমে খবর আদানপ্রদান করা হয়। আর দ্বিতীয়ত কোনও বস্তুর রূপ পটের উপর ফুটিয়ে তুলতে গেলে প্রয়োজন বর্ণের ত্রিমাত্রিক ব্যবহার। অনেক সময় দেখা যায় কোনও কোনও বর্ণ ক্যানভাস থেকে বেরিয়ে আসছে। যেমন লাল বর্ণ। আবার কোনও কোনও বর্ণ ক্যানভাসের গভীরে মনকে টেনে নিয়ে যায় যেমন নীল, হলুদ ইত্যাদি। বিশেষভাবে আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, যে উপাদানগুলির সমন্বয়ে একটি শিল্পকাজ রূপায়িত হয়। তার মধ্যে দুটি উপাদানই বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। প্রথম রূপ বা ফর্ম, তারপর বর্ণ। রূপের মধ্যে থাকে ভারসাম্য (Balance), ছন্দ (Rhythm), সমতা (Symmetry)। আর Composition বা বিন্যাস হোল পটের (Space) উপর উক্ত উপাদানগুলির সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবহারের করণ-কৌশল যা একটি শিল্পকাজকে রূপায়িত করে। Composition বা বিন্যাস বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। যেমন পিরামিডাকার, বৃত্তাকার, সমান্তরাল, জটিল ইত্যাদি।

নিম্নে বর্ণ প্রস্তুতকরণের একটি তালিকা দেওয়া হোল :—

প্রাথমিক বর্ণ হচ্ছে লাল, হলুদ, নীল বাকি সব মিশ্র বর্ণ।

১. লাল + হলুদ = কমলা,

২. হলুদ + নীল = সবুজ,

৩. লাল + নীল = গাঢ় বেগুনী।

কমলাকে লালচে কমলায় পরিণত করতে হলে লালের পরিমাণ বেশী দিতে

হবে। হলুদেটে কমলা তৈরী করতে হলে হলুদের অনুপাত বাড়াতে হবে। আবার কমলাকে ফিকে অর্থাৎ ক্রীম রং তৈরী করতে হলে পরিমাণ মত সাদা মিশিয়ে নিতে হবে। আর যে কোনও রংকে কালচে করতে হলে পরিমাণ মত কালো রং ব্যবহার করতে হবে। এইভাবে গাঢ় থেকে ফিকে পর্যন্ত প্রতিটি রং তৈরী করে, প্রয়োজন মত ব্যবহার করা যায়। একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, কালো এবং সাদাকে বর্ণ হিসেবে ধরা হয় না। কেননা এদুটো রং বর্ণ বৈচিত্রের দুটি অন্তিম সীমা। একটি প্রকাশের অপরটি অপ্রকাশের বা বিলয়ের।

(৪) পরিপ্রেক্ষিত (Perspective)

আমরা পরিপ্রেক্ষিত বা Perspective বলতে বুঝি ছবিতে বিভিন্ন রূপের মধ্যে দূর নিকটের সম্পর্ক বোঝানোর কৌশল। যত সহজে এই কথা বলা হোল জিনিষটা কিন্তু তত সহজ নয়। বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে অংক ও জ্যামিতি শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। শিল্পী বা ইঞ্জিনিয়ার কাগজের দ্বিমাত্রিক (Two dimen-tion) পরিসরের উপর ঘরবাড়ী, মানুষজন বা যে কোনও ঘনবস্তুব আকৃতিকে বাস্তব রূপ দিয়ে দর্শকের চোখে ভ্রম সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। Perspective ঠিক মত এলে যে কোনও অংকিত জিনিস ঘনশরীর বা ওজন বিশিষ্ট মনে হয়। চিত্রিত বস্তুতে যে ফাঁক বা জমি থাকে তা বাস্তব সম্মত হয়। ঘনত্ব লাভ করে। সেইজন্য পরিপ্রেক্ষিতকে শুধুমাত্র পরিপ্রেক্ষিত না বলে পরিপ্রেক্ষিত বিজ্ঞান বলা হয়। ১৫ শতকে ইউরোপের নবজাগরণ যুগের পুরোধা শিল্পী শিল্প জগতের এক অবিনশ্বর পুরুষ 'লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি' পরিপ্রেক্ষিত বিজ্ঞান নিয়ে অনেক প্রামাণ্য সূত্র আবিস্কার করেছেন, পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন এবং তাঁর অংকিত চিত্রাবলীতে পরিপ্রেক্ষিত বিজ্ঞানকে আক্ষরিক অর্থে প্রয়োগ করেছেন তাঁর "Notes on Trities of painting" বইটি একথার সত্যতা প্রমাণ করে। লিওনার্দো এইভাবে শুরু করেছেন :—

"পরিপ্রেক্ষিত"। পরিপ্রেক্ষিত হচ্ছে চিত্র শিল্পের লাগাম এবং হাল, চিত্রকলার ভিত্তি স্বরূপ। পরিপ্রেক্ষিত হচ্ছে চোখের ক্রিয়া সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান, তাছাড়া অন্য কিছু নয়। চোখের সম্মুখে বিশ্ব প্রকৃতির যাবতীয় বস্তুর রূপ এবং রং এক পিরামিডের আকার ধারণ করে চোখে এসে লাগে। চোখের কাজ হচ্ছে এই পিরামিডকে গ্রহণ করা। পিরামিড বল্লুম তার কারণ চোখের যে বিন্দুতে এসে এই পিরামিডগুলি মেশে তারা প্রত্যেকেই চোখের বিন্দুটির চেয়ে বড়। কাজে কাজেই যে কোনও বস্তুর চার পাশ থেকে রেখা টেনে চোখের একটিমাত্র বিন্দুতে মেশালে রেখাগুলি একটি পিরামিডের সৃষ্টি করবেই।

পরিপ্রেক্ষিতের তিনটি শাখা আছে। প্রথমটি হচ্ছে চোখ থেকে জিনিষ যতদূরে সরে যায় ততই সে কেন ছোট হয়ে যায় তার হিসাব; একে বলে আকারে কমে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিত। ইংরেজীতে যাকে বলা হয় Perspective of dimention। দ্বিতীয়টি হচ্ছে চোখ থেকে যতদূর সরে যায় তত রং কি ভাবে বদলায় তার ব্যাখ্যা। আধুনিক ভাষায় দ্বিতীয় শাখাটিকে বলে Perspective of values। তৃতীয় এবং শেষ শাখাটি হচ্ছে চোখ থেকে কতগুলো জিনিষ যতদূরে সরে যায়, ততই কিভাবে তাদের আনুপাতিক সম্বন্ধগুলি অস্পষ্ট দেখায়। তৃতীয় শাখাটিকে ইংরেজীতে বলে Perspective of Involvement.

"যাবতীয় বস্তুর আকার এবং তাদের যাবতীয় রং নিয়ে গড়ে উঠেছে চিত্র বিজ্ঞান। চিত্র বিজ্ঞানের বিষয় হচ্ছে বস্তুর পারস্পরিক দূরে-কাছের অনুমান এবং যতদূরে যায় ততই কোন বস্তু আকারে কিরকম ছোট হয়ে যায় তা নির্ণয় করা। এই বিজ্ঞান হচ্ছে পরিপ্রেক্ষিতের জননী। এটি আসলে দৃষ্টিরশ্মির বিজ্ঞান। Perspective তিনভাগে বিভক্ত। প্রথমটি বস্তুর রেখাগত নক্সা নিয়ে ব্যাপৃত। দ্বিতীয়টি বস্তু যতই দূরে পিছিয়ে যায় ততই তার রং কিভাবে কতখানি ম্লান হয়ে যায় তাই নির্ণয় করে। তৃতীয়টি হচ্ছে নানা রকম দূরে কাছে বস্তু কিভাবে কতখানি অস্পষ্ট হয়ে যায় তার বিচার। এখন প্রথম যে অংশটি শুধু বস্তুর রেখা এবং সীমান্ত নিয়ে ব্যাপৃত তাকে বলে নক্সা বা ড্রয়িং, এর কাজ হচ্ছে বস্তুর আকারটি ফুটিয়ে তোলা। এর থেকে হয়েছে আর একটি বিজ্ঞানের উৎপত্তি তার বিষয় হচ্ছে আলো আর ছায়া, যার অন্য নাম Chairescuro.

এক টুকরো স্বচ্ছ মসৃণ কাঁচের মধ্যে দিয়ে যাবতীয় জিনিষ দেখে কাঁচের ওপাশে যে জিনিষ দেখা যাচ্ছে তাদের সেই কাঁচের উপর আঁকাকেই Perspective বলা যয়। প্রতিটি জিনিংই পিরামিডের আকারে চোখের বিন্দুতে এসে মেশে, এবং এই পিরামিডগুলি কাঁচটিতে কাটা পড়ে যায় ইত্যাদি।

যা কিছু স্থূল চোখে পড়ে তার তিনটি গুণ আছে: ঘন দেহ, আকার এবং রং। তিনের মধ্যে রং বা আকার যতদূর থেকে চেনা যায় দেহ তার চেয়েও দূর থেকে চেনা যায়। আবার আকারের চেয়েও রং আরও দূর থেকে চেনা যায়, অবশ্য এ নিয়মটি ভাস্বর দ্যুতিমান বস্তু সম্বন্ধে খাটে না।

একই আয়তনের একাধিক বস্তুর মধ্যে যেটি চোখ থেকে দূরে থাকবে সেটিই সব থেকে ছোট দেখাবে।

একই আয়তনের একই রং এর, ঔজ্জ্বল্যের একাধিক বস্তুর মধ্যে যেটি সব থেকে দূরে থাকবে সেটিই সবচেয়ে ছোট এবং সবচেয়ে ফিকে দেখাবে। সমান গভীর একাধিক ছায়ার মধ্যে যেটি চোখের সবচেয়ে কাছে থাকবে সেটিই

সর্বচেয়ে অগভীর দেখাবে। "কোন গাঢ় রং এর জিনিষ আর চোখের মধ্যবর্তী বায়ুমণ্ডল যত বেশী ভাস্বর হবে ততই জিনিষটি বেশী নীল দেখাবে। এর প্রমাণ আকাশের নীল"—ইত্যাদি।

ইউরোপের চিত্রশিল্পের ইতিহাসে এইভাবে আরও অনেক শিল্পী পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে নানাভাবে চিন্তাভাবনা করেছেন, পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন এবং প্রামান্য সূত্রগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশও করেছেন। তবে লিওনার্দোর চিন্তাধারা সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে। সে তুলনায় অবশ্য প্রাচ্যের শিল্পীরা পরিপ্রেক্ষিতবিজ্ঞান নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামিয়েছেন বলে জানা যায়নি। পারস্য চিত্রকলায় পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে শিল্পীরা চিন্তাভাবনা করেছেন এবং কিছুটা সফলও হয়েছেন বলে শিল্প ইতিহাস থেকে জানতে পারি। পারস্য চিত্রকলার ইতিহাসে পরিপ্রেক্ষিত বিজ্ঞানকে বলা হয়েছে "দূরনামা"। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিত্রশিল্পে পরিপ্রেক্ষিত রচনার কৌশলে ভিন্নতা দেখা যায়। তার কারণ পাশ্চাত্য শিল্পীরা বাস্তববাদী তারা বস্তুকে বাস্তবসম্মত করে তোলার জন্য ছবিতে আলোছায়ার বিন্যাস খাটিয়েছেন ফলে Perspective অত্যন্ত জটিল হয়ে উঠেছে। অপর পক্ষে প্রাচ্যের শিল্পীরা সীমাহীন কল্পনার আশ্রয় নিতে গিয়ে দ্বিমাত্রিক পরিসরের উপর বস্তুর দ্বিমাত্রিক ভাবধারাকে ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে রেখা বিন্যাস ঘটিয়েছেন। পাশ্চাত্যের পরিপ্রেক্ষিত রচনার কৌশলকে বলা হয়েছে Converging Technic অর্থাৎ কেন্দ্রাভীসারী পরিপ্রেক্ষিত। আর প্রাচ্য চিত্রকলায় যে পরিপ্রেক্ষিতের পরিচয় আমরা পাই তাকে বলা হয় Arial বা Diverging Technic। অর্থাৎ কেন্দ্রাভীসারী পরিপ্রেক্ষিত ছবির সামনে দাঁড়ালে মনে হয় শিল্পী চিত্র রচনাকালে কোন ছাদ বা অলিন্দের উপর দাঁড়িয়ে চিত্র রচনায় প্রয়াসী হয়েছেন। এ দেখাকে বলা যেতে পারে Bird's eye view থেকে দেখা। এটাকে ফরাসী শিল্পীরা বলেছেন Multiple perspective। মোগল এবং অজন্তা চিত্রে কোনও কোনও ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য পরিপ্রেক্ষিতের কৌশল বা Coverging Technic অবলম্বন করতে দেখা গেছে। কিন্তু তা সম্পূর্ণরূপে সফল হয়নি বরং তাতে ভারতীয় চিত্রের কৌলিন্য অনেকাংশে নষ্ট হয়েছে।

আমরা যখন কোনও ঘনবসতিপূর্ণ শহরের রাস্তা দিয়ে হাঁটি তখন দেখি যে রাস্তার দুপাশের ঘরবাড়ী ক্রমশ ছোট হতে হতে দিকচক্রবালে একটা বিলীয়মান বিন্দুতে এসে মিলে যাচ্ছে। অর্থাৎ অলিন্দ কার্নিশের রেখাগুলো পিরামিডাকারে একটা বিন্দুতে এসে শেষ হয়ে যাচ্ছে। এটাকে বলা হয় Vanishing Point। কোনও রেল লাইনের মধ্যবর্তী জায়গায় দাঁড়ালেও একথার সত্যতা প্রমাণিত হবে। দুপাশের রেল লাইন সরু হতে হতে দিকচক্রবালে একটি বিলীয়মান বিন্দুতে মিলে মিশে একাকার হয়ে যাবে।

এটাকেই Converging বা কেন্দ্রাভীসারী পরিপ্রেক্ষিত বলা হয়। Converging perspective অনুযায়ী দূরের বস্তু ছোট হয়, কাছের বস্তু বড় হয়। কিন্তু Diverging perspective-এ যেহেতু কল্পনার স্থান সুবিস্তৃত সেইজন্য দূরের বস্তুও কখনও কখনও বড় হয়ে আমাদের চর্মচক্ষে ধরা দেয়। Diverging perspective-এ যা দেখা যাবার কথা নয় যা বাস্তবসম্মত নয় তাও ছবিতে অনেক সময় দেখানো হয়। যেমন রাজপুত চিত্রে নহবত খানা, ঢাকির দল, দ্বিতলের অভ্যন্তর ভাগ, পুরনারী দল, ঘরের মধ্যে মা ও ছেলে, ছাদের উপর ময়ূর ময়ূরী, ইত্যাদি খুঁটিনাটি জিনিষের নিখুঁত বর্ণনা দেখানোর চেষ্টা হয়েছে। অথচ বাস্তবে এরকম দৃশ্য কোনও ভাবেই দেখা সম্ভব নয়। শুধুমাত্র ড্রয়িং এর দিক থেকে না। বর্ণ লেপনের দিক থেকেও Perspective-এর একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে। দূরের বস্তুর রং সব সময় হালকা হয়, কাছের বস্তুব রং কিছুটা গাঢ় হয়। এটাকে বলা হয় Colour perspective। Converging এবং diverging perspective এর মধ্যে সহজে প্রভেদ নির্ণয় করতে হলে এইভাবে করলে সুবিধা হবে। যেমন একটা চৌকি, চৌকির যে দিকটা সামনে থেকে দেখা যায় Coverging perspective-এ তা চওড়া হবে। চৌকির নীচে যদি কলসি জাতীয় কিছু রাখা হয় তবে তা দেখা যাবে না। কিন্তু diverging perspective এ তার উল্টো হবে। চৌকি ও কলসি দুইই দেখা যাবে। দুই দেশের Perspective-এর কৌশল ভিন্ন হলেও একথা মনে করার কোন কারণ নেই যে ভারতীয় শিল্পীরা অংক শাস্ত্রে সম্ভবত Coverging perspective-এর technic সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ ছিলেন। শিল্পীরা Converging perspective-এর করণ কৌশল সম্বন্ধে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন। কিন্তু ছবিতে ভাবকে বিশেষ প্রাধান্য দিতে গিয়ে এবং কল্পনার পুষ্পক রথে চড়ে perspective-কে সচেতনভাবে distort করেছেন বা ভাঙ্গচুর করেছেন।

দিকচক্রবাল রেখা সব সময় স্থির থাকে না। অবস্থা ভেদে স্থান পরিবর্তন করে। কোনও গাছের উপর থেকে দেখলে দেখা যাবে দিকচক্রবাল রেখা ক্রমশঃ দূরের দিকে সরে যাচ্ছে।

শিশুশিল্প ও ফ্রি এক্সপ্রেশন

প্রতিটি শিশুই জন্মের সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলো শব্দের (Sound) মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করে। সেই শব্দগুলোর অর্থ সব সময় আমরা বুঝে উঠতে পারি না। তবে এইটুকু বুঝতে পারি, শিশু কখন কি চায়। শিশু যখন শরীরে কোনও যন্ত্রণা অনুভব করে বা ক্ষুধার জ্বালা অনুভব করে তখন যেভাবে নিজেকে প্রকাশ করে, ঠিক সুস্থ অবস্থায় সেভাবে নিজেকে প্রকাশ করে না। শরীরে কোনও যন্ত্রণা না থাকলে, ক্ষুধার জ্বালা মিটে গেলে দেখা যায় ছোট্ট শিশু জানালার আলোর দিকে তাকিয়ে হাত পা ছুঁড়ে ছুঁড়ে আপন মনে গান গেয়ে যায়। এই সময় শিশুর মন অবাধ কল্পনা রাজ্যে বিচরণ করে। এই দৃশ্য দৃষ্টিনন্দন ও শ্রুতিমধুর। শিশুর এই অভিব্যক্তিকে বলা হয় Free expression। আর এই Free expression-ই হোল Artistic Expression.

Free Expression-এর সঙ্গে খেলার সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। শিশুদের খেলা শুধুমাত্র একটা শারিরীক সক্রিয়তা নয়, বরং দেহমনের সঙ্গে যুগপৎভাবে যুক্ত। খেলা হোল শিশুদের একটা উদ্বৃত শক্তি। এই শক্তিকে কাজে লাগিয়ে শিশুরা নতুন জগৎ আবিষ্কারের উন্মাদনা অনুভব করে। খেলতে খেলতে শিশুর মন শিল্পীত হয়ে ওঠে, নতুন নতুন সৃষ্টির পথে এগিয়ে যায়। এইভাবে খেলা, শিশুর সারা জীবনকে প্রভাবিত করে। সেইজন্য শিশুদের সমস্ত ধরনের ক্রিয়া-কলাপকেই শিশু-শিল্প নামে অভিহিত করা হয়।

শিশুরা স্বভাবতই কর্মচঞ্চল হয়। তারা তাদের নরম সুন্দর আঙ্গুল-গুলো দিয়ে সব কিছু স্পর্শ করতে চায়, ভাঙ্গতে চায়, গড়তে চায়। তাই অনেক সময় দেখা যায় শিশুরা বালি দিয়ে পাহাড়, গুহা ইত্যাদি বানায় এবং মাটি দিয়ে ঘরবাড়ী তৈরী করে, নানা ধরনের পুতুল তৈরী করে, রং তুলি দিয়ে ছবি আঁকে। শিশুরা যখনই কোনও শিল্প কাজে অগ্রসর হয়, তখনই তার মনের মধ্যে কতকগুলো অজানা উপাদান এসে ভিড় করে। ফলে দেহ-মনে এক ধরনের অস্থিরতা অনুভব করে। এর থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার জন্য সে পথ খুঁজে বেড়ায়। ঈপ্সিত কাজটি সম্পন্ন হলে সে দেহে-মনে অসীম আনন্দ লাভ করে। শুধুমাত্র শিল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রেই নয়, শিল্প, দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, সৃষ্টির প্রতিটি ক্ষেত্রেই স্রষ্টাকে এই ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

শিশু নয় মাস দশদিন মাতৃগর্ভে লালিত পালিত হবার পর ভূ-পৃষ্ঠে অবতরণ করে জন্মের প্রথম দুমাস সে থাকে আত্মকেন্দ্রিক। তারপর বহির্মুখী চিন্তাধারা তাকে বাইরের জগতের সঙ্গে পরিচিত করে। শিশু যখন দুবছর বয়সে পদার্পণ করে তখন দেখা যায়, হাতের কাছে যা পায় তাই নিয়েই তারা মেঝেতে বা শ্লেটে আঁকিবুঁকি কাটে। শিশু এই ধরনের সক্রিয়তায় পেশী সঞ্চালনের আনন্দ অনুভব করে। আঁকিবুঁকি কাটার প্রথমাবস্থায় কাঁধ থেকে আঙ্গুলের ডগা পর্যন্ত পেশী সঞ্চালিত হয় এবং পরে তা কব্জি সঞ্চালনে পর্যবসিত হয়। কখনও কখনও এগুলি উদ্দেশ্যমূলক হয়, কখনও বা উদ্দেশ্য-হীন ভাবেই আঁকিবুঁকি কাটে। শিশুদের এই বয়সটাকে বলা হয় আঁকিবুঁকি কাটার বয়স।

এর অল্প কিছুদিন পরেই শিশুর এলোপাথাড়ি আঁকিবুঁকিগুলি আকস্মিক ভাবে অস্পষ্ট নক্সার (Scheme) রূপ লাভ করে। সব দেশের শিশুদের নক্সা (Scheme) একই রকম হয় না। দেশ ও জাতি ভেদে নক্সার রূপান্তর ঘটে। শিশুরা প্রথম যখন নক্সা আঁকতে শুরু করে। তখন তাদের কাজের মধ্যে কোনও প্রাকৃতিক বস্তুর রূপ প্রতিভাত হয় না। কতকগুলি কাল্পনিক বর্ণনাত্মক সংকেত ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করে। প্রথমাবস্থায় এগুলি একমাত্রা বিশিষ্ট (one dimentional scheme) হয়, পরে এগুলি দ্বিমাত্রিক (Two dimentional scheme) নক্সায় পরিণত হয়। অবশ্য কিছু কিছু শিক্ষার্থীর কাছে এর ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। এই যে Scheme গুলি, এ গুলোতে মানুষের আকৃতিই বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয়। কেননা এই সময় শিশুদের মধ্যে মানুষের আকৃতি ফুটিয়ে তোলার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। বয়সের দুএক মাসের তারতম্যে Scheme বা নক্সার রকমফের লক্ষ্য করা যায়, Style এর কিছুটা পরিবর্তন ঘটে। এই সময় অধিকাংশ শিশু একই বিষয়কে দুই রীতিতে (Style) আঁকার চেষ্টা করে, কারণ প্রথমটি হয় আত্মতৃপ্তির জন্য, দ্বিতীয়টি সে অবলম্বন করে অপরের সন্তোষ প্রকাশের জন্য বা পরিচিতি লাভ বা প্রশংসা লাভের জন্য। দ্বিতীয় পর্যায়ে সে বড়দের বা সহপাঠীদের কাজকে অনুকরণ করে। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে সে সবসময় বড়দের কাজ অনুকরণ করে না। বড়দের মত হতে চায়, হাত-পা সঞ্চালনের ভঙ্গি আয়ত্ব করতে চায়, এটাকে বলা হয় Duplicity of styles.

পরীক্ষামূলকভাবে দেখা গেছে যে পাঁচ থেকে ছয় বছরের শিশুরা ট্রেন, জাহাজ, এরোপ্লেনের ছবি আঁকে। ছয় থেকে সাত বছরের শিশুরা খেলার মাঠ, বাজারের দৃশ্য, শ্রেণীকক্ষ ইত্যাদি আঁকতে আগ্রহ প্রকাশ করে, এগুলো বাস্তবসম্মত হয় না অনেকটা প্রতীকমূলক নক্সা হয়ে ওঠে। শিশুদের এই বয়সটাকে বলা যেতে পারে A age of symbolic scheme।

শিশুরা তাদের পরিচিত পারিপার্শ্বিকের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। তার মানসিকতা, আচার-আচরণ সবকিছুই পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সমতা রেখে এগিয়ে চলে। যদি একটা বিশেষ বয়সের শিশুদের একসাথে বসিয়ে বিদেশের কোনও গল্প বলা হয় এবং তার থেকে ছবি আঁকতে বলা হয়, তাহলে দেখা যাবে আকাশ উপরে, মানুষগুলো নীচে এবং গল্পের বিষয়-বস্তুকে মাঝখানে তুলে ধরেছে এবং ছবির স্তবকে স্তবকে তার পরিচিত পারি-পার্শ্বিকের ছাপটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

তারা কাজের সময় সমস্ত পরিসর জুড়ে কাজ করে। শিশুশিল্পের মধ্যে অঙ্কন ও রং করা ছাড়াও আরও বেশী কিছু থাকে, তা হোল সৃষ্টির আনন্দ যত্ন ও ভালবাসা। বয়োঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের কাজ বলিষ্ঠ ও শক্তিশালী হয়। ছবি আঁকা ছাড়াও একটি বিশেষ বয়সের শিশুরা পুতুল খেলায় আগ্রহ প্রকাশ করে। নিজেদের খেলনার সামগ্রী নিজেরাই তৈরী করে নেয়। পুতুলের কল্পিত ঘর-সংসার গড়ে তোলে, বিয়ে দেয়, অন্নপ্রাশন করে, নানা-রকম রান্নাবান্নার আয়োজন করে, বালি হোল তাদের ভাত, গাছের পাতা হোল তাদের মাছ, ইত্যাদি। আর এই পুতুলের কল্পিত ঘর-সংসার ভবিষ্যত জীবনে তাদের বিগ্রহ পুজায় অনুপ্রাণিত করে।

শিশুশিক্ষার্থীরা যখন ১৪ বছর বয়সে পদার্পণ করে তখন তাদের কাজ যুক্তিপূর্ণ হয়। নানা ধরণের গবেষণামূলক কাজেও তারা আগ্রহী হয়। সঙ্গে সঙ্গে শিল্পসত্ত্বা প্রস্ফুটিত ফুলের মত বিকশিত হয়। ড্রয়িংএর মধ্যে স্ত্রী, পুরুষের প্রকারভেদ লক্ষ্য করা যায়। ছবিতে গল্পের আভাস অনুভূত হয়। বিশেষ করে মেয়েদের কাজে, Form-এর সৌন্দর্য, রংএর ঔজ্জ্বল্য এবং লীলায়িত রেখার প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। শিশুর এই বয়সটাকে বলা হয় Age of artistic rivival।

শিশুশিল্পের বৈশিষ্ট্য

মানুষ তিনভাবে মনের ভাব প্রকাশ করে। কথার মাধ্যমে দৃশ্যমান কোনও বস্তুর মাধ্যমে, অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে। এছাড়া ভাব প্রকাশের জন্য নানা ধরণের সংকেত ও প্রতীকের ব্যবহার হয়ে থাকে। যেহেতু শিশুদের মনের ভাষা অনেক, মুখের ভাষা সীমিত, তাই তারা কথ্যভাষার মাধ্যমে যা না প্রকাশ করতে পারে ছবির মাধ্যমে খুব সহজেই তা প্রকাশ করতে পারে। সেইজন্য শিশু শিল্পে নানা ধরণের প্রতীক বা সংকেতের সমন্বয় ঘটে। কিন্তু এই প্রতীক বা সংকেতগুলি সবার কাছেই যে রসোদ্রেককারী হবে তার কোনও অর্থ নেই। এগুলোর রসগ্রহণ করতে হলে চাই শিক্ষা।

প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যমে প্রথমে শিশুর নরম মনের খবর নিতে হবে, তারপর শিশু শিল্পের গভীরে প্রবেশ করতে হবে। যেমন Tree একটা শব্দ, একটা সংকেত। কাগজের উপর কালির আঁচড়েই এই শব্দটাকে পরিস্ফুট করা যায়। Tree শব্দটি উচ্চারণের সাথে সাথে অদূরে ডালপালা প্রসারিত একটি গাছের গুঁড়ির আকৃতি আমাদের মনের মধ্যে ভেসে উঠে। কিন্তু যাঁরা এই ইংরেজী শব্দটির সঙ্গে পরিচিত নন, তাদের স্মৃতিতে গাছের এই রূপটি ভেসে উঠবে না। আবার এই Tree শব্দটি উচ্চারণের সাথে সাথে একটি বিশেষ গাছের আকৃতি আমাদের স্মৃতিতে ভেসে নাও উঠতে পারে। কারণ এই শব্দটি বিশ্বচরাচরের সমস্ত গাছের সংকেত বহনকারী। সুতরাং এই শব্দটিকে একটি abstract sign হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। আবার কোনও অট্টালিকার উপরে যদি cross চিহ্ন থাকে তাহলে স্বভাবতই আমাদের খৃষ্টীয় ধর্মের কথা মনে পড়ে যায়। কেননা cross চিহ্নটি ভগবান যীশুর প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আবার দেখা গেল তৃতীয় শতকের কোনও অলংকারের উপর একটি মাছের আকৃতি খোদাই করা আছে। কোনও অশিক্ষিত ব্যক্তির কাছে এটা মাছের আকৃতি ছাড়া অন্য কিছু নয়। এ সম্বন্ধে কোনও শিক্ষিত ব্যক্তির মতামত চাওয়া হলে তিনি বলবেন, ঐ সময় ভগবান যীশুর প্রতীক হিসেবে মাছের মূর্তি ব্যবহার করার প্রচলন ছিল। আবার মনোবিজ্ঞানীরা বলবেন Symbol of Sextuality and ferlility অর্থাৎ মাছের মূর্তিটি উর্বরতা বা যৌনতা শক্তির প্রতীক।

শিশুশিল্পে শিশুদের ব্যবহৃত প্রতীকগুলি খুবই অর্থবহ। বয়োঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই বর্ণনাত্মক প্রতীকগুলি তাদের স্বাতন্ত্র ও বৈশিষ্ট হারিয়ে ফেলে। একটি spiral, জলপায়ও হতে পারে অথবা gum-treeও হতে পারে। দুটি

paralal বা সমান্তরাল রেখা একপাল জন্তুও হতে পারে পর্বত শ্রেণীও বোঝাতে পারে।

এই প্রসঙ্গে দৃষ্টিহীন শিশুদের শিল্পচর্চা সম্বন্ধে একটু আলোচনা প্রয়োজন। যারা দৃষ্টিহীন তাদের কাজের মধ্যে বহির্জগতের সংবেদনের প্রতিফলন ঘটে না, অন্তর্জগতের শারীরিক সংবেদনটি মূর্ত হয়ে ওঠে। তারা অপেক্ষাকৃত স্পর্শকাতর হয়। তাই তাদের কাজে স্পর্শধন্য ভাবটাই বিশেষভাবে প্রাধান্য পায়। এই ধরণের শিল্প কাজকে Haptic type বলা হয়।

শিশু শিল্পীদের কাজে বাস্তবের Modelling, পরিপ্রেক্ষিত (perspective) একেবারেই অনুপস্থিত। তাই শিশুশিল্প হয় Flat বা সমতলধর্মী। কখনও দেখা যায় নদীর উপর নৌকোগুলি একপেশে, পাহাড়ের নীচ থেকে সূর্য উঠছে, তাল গাছের মাথার উপর দিয়ে নদী বয়ে আসছে। একই ছবিতে চাঁদ ও সূর্যের একত্র সমাবেশ ঘটেছে। বড়দের কাছে এগুলি হাস্যকর, যুক্তিহীন, অবাস্তব। কিন্তু শিশুদের কাছে যুক্তি তর্কের অভাব দেখা যায় না। যদি তাদের জিজ্ঞাসা করা হয়, একই ছবিতে চাঁদ ও সূর্য কিভাবে সম্ভব? তখন তারা এই যুক্তি দেখাবে যে, পথিক সকাল বেলা বাড়ী থেকে বেরিয়ে সন্ধ্যে বেলায় তার গন্তব্য স্থলে পেঁৗচেছে, সেইজন্য একই ছবিতে চাঁদ ও সূর্য একই সাথে দেখা যাচ্ছে। সুতরাং এগুলো যতই হাস্যকর, অবাস্তব হোক না কেন শিল্পশিক্ষার জগতে এগুলোর মূল্য অপরিসীম। শিশুশিল্পের সব থেকে মূল্যবান জিনিষ হোল, শিশুরা কতকগুলো এলোমেলো অবাস্তব জিনিষকে একটি সুরের ছন্দে ছন্দিত করে তোলে যার মধ্যে বক্তব্য বিষয় বা কারিগরী দিকগুলি গৌণ হয়ে যায়, শুধুমাত্র রং তুলি নিয়ে খেলা খেলা ভাবটাই মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে।

সাত থেকে চৌদ্দ বছরের বেশ কিছু শিশুদের শিল্পকাজ পর্যবেক্ষণ করার পর শিশুশিল্পকে আটটি বিশেষ শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। এগুলি হোল :—

(১) Organic Type.
(২) Empathetic Type.
(৩) Rythmical Pattern.
(৪) Structural Form.
(৫) Enumerative Type.
(৬) Haptic Type.
(৭) Decorative Type.
(৮) Imaginative Type.

(১) **Organic Type** :—বিষয়বস্তু বাস্তব জগত থেকে নেওয়া হয়। এখানে বিশেষ একটি বস্তুর উপর প্রাধান্য না দিয়ে একটি group-এর উপর

প্রাধান্য দেওয়া হয়। বস্তু সম্পর্কে সঠিক ধারণা অনুপাত বজায় থাকে। যেমন গাছ মাটি থেকে উঠেছে, মানুষ একটি বিশেষ ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে আছে, ফুল বৃন্তের সঙ্গে শক্তভাবে না থেকে একটি বিশেষ ভঙ্গিমায় মাটির দিকে নেমে গেছে।

(২) **Empathetic Type :**—কিছুটা organic catagory-র সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। কিছুটা প্রতিচ্ছায়াবাদী (impressonist) ছবির অনুরূপ, আবার কিছুটা Haptic type-এর সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

(৩) **Rythmical Pattern :**—বিষয়বস্তুর মধ্যে কোনও বাস্তব ঘটনার আভাষ পাওয়া যায়। এখানে শিশু সমস্ত পট জুড়ে একটি বিশেষ ভাব (motief)-এর পুনরাবৃত্তি ঘটায়। এই ভাব (motief) কোনও দৃশ্যমান বস্তু থেকেও হতে পারে অথবা কাল্পনিকও হতে পারে।

(৪) **Structural Form :**—শিশুদের অঙ্কিত এই ধরণের ছবি খুব একটা বেশী চোখে পড়ে না। এখানে ব্যবহৃত আকৃতি বা shape গুলি একটি জ্যামিতিক নিয়ম মেনে চলে। ফলে বিশেষ একটি চিন্তার Stylization অনুভূত হয়। দৃশ্যমান জগতের কোনও নিয়ম মেনে চলে না।

(৫) **Enumerative Type :**—এখানে শিল্পী বাস্তব জগতের কোনও বিষয়বস্তু দ্বারা প্রভাবিত হয়। শিশু শিল্পী অনেক পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করে বিষয়বস্তুর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করে। ফলে ছবি অনেকটা বাস্তবসম্মত হয়।

(৬) **Haptic Type :**—দৃশ্যমান জগতের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক থাকে না। অথচ আলংকারিকও নয়। আভ্যন্তরীণ শারীরিক সংবেদন, ছবিতে স্পষ্ট ভাবে ফুটে ওঠে।

(৭) **Decorative Type :**—শিল্পী এখানে ফর্মের দ্বিমাত্রিক ভাবধারার উপর নজর দেয় বেশী এবং রংএর উপর বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করে। ফলে spaceটি একটি মনোরম pattern-এ পরিণত হয়।

(৮) **Imaginative Type :**—শিল্পী কোনও সাহিত্য অথবা কোনও কাল্পনিক ঘটনাকে ছবির বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। যার ফলে ছবির কাল্পনিক ভাবটাই বিশেষ প্রাধান্য পায়।

শিশু বয়সের তিনটি স্তর

শিশুদের শিল্প শিক্ষা দিতে হলে, তিনটি সক্রিয়তার দিকে বিশেষ নজর দিয়ে পদ্ধতির সুষ্ঠু প্রয়োগ সম্ভব করে তুলতে হবে। সক্রিয়তাগুলি হোল (১) আত্ম অভিব্যক্তি প্রকাশ (Self expression). (২) পর্যবেক্ষন (Observation) এবং (৩) রসানুভূতি (Appreciation).

আত্ম অভিব্যক্তি প্রকাশ এমনই একটি সক্রিয়তা, যা কাউকেই শেখানো সম্ভব নয়। এটা মানুষের একটি সহজাত ধর্ম। প্রতিটি মানুষ নিজের ভাবনা, চিন্তা, আবেগ অনুভূতিকে অপরের কাছে প্রকাশ করতে চায় এবং অপরের ভাবনা, চিন্তার অংশীদার হতে চায়। ক্রমাগত অনুশীলনের মাধ্যমে এই সক্রিয়তাটি স্বতঃস্ফুর্ত ভাবেই অনেকের মধ্যে গড়ে ওঠে। এখানে শিক্ষককে শুধুমাত্র পথপ্রদর্শক বা ধাত্রীর ভূমিকা পালন করতে হয়।

জন্মগতভাবে অনেকেই প্রখর পর্যবেক্ষন শক্তির অধিকারী হন। যাঁরা জন্মগতভাবে এই গুণটির অধিকারী হন, তাঁরা উত্তর জীবনে জ্ঞানী, গুণী, পণ্ডিত ব্যক্তি বলে পরিচিতি লাভ করেন। চোখ, হাত ও মনের যুগপৎ ক্রিয়াকলাপে পর্যবেক্ষন শক্তি কিছুটা পরিমাণে আয়ত্বাধীনে চলে আসে। এক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা প্রায় নেই বললেই হয়।

অপর পক্ষে Appreciation বা রসানুভূতি, বই পুস্তক পঠন-পাঠন এবং শিক্ষণ পদ্ধতির সুষ্ঠু প্রয়োগে, যে কোনও শিক্ষার্থীর মধ্যে গড়ে তোলা যায়। এক্ষেত্রে শিক্ষকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অনস্বীকার্য। শিক্ষককে এখানে friend, philosopher এবং guide-এর ভূমিকা পালন করতে হয়। কিন্তু একথা অবশ্যই মনে রাখা উচিত যে, যে কোনও বয়সের শিক্ষার্থীদের appreciation শেখানো যায় না। যতক্ষণ পর্যন্ত না শিক্ষার্থী পূর্ণযৌবনে (Adotecent) পদার্পণ করছে, যতক্ষণ পর্যন্ত না শিক্ষার্থীর রং, রেখা, ফর্ম সম্বন্ধে সঠিক ধারণা জন্মাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত appreciation শেখানো যায় না, শেখানো উচিতও না।

অনেক শিক্ষার্থীদের মতে শিশুদের ড্রয়িং কুৎসিত, বীভৎস্য, অমানবিক, অবাস্তব। কারণ তাদের দেখার চোখ অনুন্নত, অনুভব করার শক্তিও অপরিণত। সেক্ষেত্রে অনেকের কাছেই প্রশ্ন হোল শিশুদের ড্রয়িং শেখানো উচিত কিনা? তার উত্তরে বলা যায়, যদিও শিশুদের ড্রয়িং কুৎসিত বীভৎস্য তবুও এগুলি তাদের সহজ, স্বাধীন অভিব্যক্তি। তারা তাদের নিষ্পাপ চোখ ও কাব্যিক অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে জগত সংসারকে প্রত্যক্ষ করে, অনুভব করে এবং

কল্পনার রংএ রাঙিয়ে সেই অনুভূতিকে প্রকাশ করে। তাই তাদের ড্রয়িং কখনও এক্সপ্রেশনিষ্টদের মত হয়, কখনও নেচারালিষ্টদের মত হয়, তা সত্বেও রং, রেখা, ফর্ম ও বিন্যাসের দিক থেকে শিশুদের কাজ বড়দের তুলনায় অনেক বেশী অপরিণত মনে হয়। ড্রয়িং শেখানোর ব্যাপারে বলা যায় "Drawing cannot or should not be taught, it should be spontaneous activity, a Free Expression of the child own self own thoughts." অর্থাৎ শিশুদের ড্রয়িং শেখানো উচিতও না শেখানো যায়ও না। ক্রমাগত অনুশীলনের মাধ্যমে ড্রয়িং বোধ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে চলে আসে। আমরা চাই না কোনও শিশু শিক্ষার্থী ড্রয়িং এবং পেণ্টিংএ পারদর্শী হয়ে বিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে আসুক। আমরা চাই যাতে সে Free child হিসেবে সমাজ জীবনে প্রবেশ করে অভিযোজনে (Adjustment) সক্ষমতা লাভ করে। আমরা চাই যাতে তার মধ্যে গড়ে ওঠে "An eye that sees, a hand that obeys and a soul that feels."

শিশুদের শিল্প শিক্ষার ক্ষেত্রে বয়স এবং গ্রহণ ক্ষমতা অনুযায়ী শিশুদের তিনটি স্বতন্ত্র স্তরে ভাগ করে নিতে হবে। যেমন:—

(ক) শৈশব স্তর (Infant Stage), ২ বছর থেকে ৭ বছর।

(খ) প্রাথমিক স্তর (Primary Stage), ৭ বছর থেকে ১৪ বছর।

(গ) মাধ্যমিক স্তর (Secondary Stage), ১৪ বছর থেকে ১৮ বছর।

সাত থেকে চৌদ্দ বছর বয়সটাকে বলা হচ্ছে Junior স্তর এবং চৌদ্দ থেকে আঠারো বছর বয়সটাকে বলা হচ্ছে Senior স্তর। সাত থেকে আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত যে শিক্ষণ পদ্ধতি অনুসৃত হয় তাকে Infant স্তরে বলা হয় খেলা (Play)। Primary স্তরে বলা হচ্ছে প্রকল্প (Project) এবং Secondary স্তরে বলা হচ্ছে সাংগঠনিক কাজ বা Constructive Works.

(ক) শৈশব স্তর (Infant Stage)

এই বয়সে শিক্ষার্থীরা কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করে। খেলাধুলার প্রতি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে হাতের কাছে যা পায় তাই নিয়েই তারা খেলতে শুরু করে দেয়। খেলার সময় নানা ধরণের প্রতীকের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। শিশু বয়সের এই স্তরে শিল্প শিক্ষার জন্য শিল্প বিষয়ে শিক্ষণপ্রাপ্ত কোনও শিক্ষকের প্রয়োজন নেই। বিদ্যালয়ের যে কোনও শিক্ষকই শিল্প শিক্ষকের ভূমিকা পালন করতে পারেন। এক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ভাবে শিল্প শিক্ষণের চেয়ে শিক্ষকের উৎসাহ, উদ্দীপনাই সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন।

অনেকে মনে করে শিশুরা একতাল কাদার মত। শিশুবয়স থেকেই তাদের যেভাবে গড়েপিটে তৈরী করা যায় সেইভাবেই তারা গড়ে ওঠে। কিন্তু

এ ধারণা সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত। কাদার কোনও নিজস্ব স্বত্বা নেই, কিন্তু প্রতিটি শিশুই নিজস্ব ব্যক্তি স্বত্বার অধিকারী। বরং শিশুদের একটা ক্ষুদ্র বীজের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে ক্ষুদ্র বীজের মধ্যে যেমন অনেক সম্ভাবনা লুকিয়ে থাকে। উপযুক্ত পরিবেশ জলমাটি হাওয়ায় একদিন যেমন একটি বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়, তেমনি প্রতিটি শিশুর মধ্যেই বিরাট সম্ভাবনা লুকিয়ে থাকে। উপযুক্ত যত্ন ও নির্দেশনায় সে একদিন ঐ মহীরুহের মতই প্রকৃত মানুষ হতে পারে। সেই সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করে তোলার দায়িত্ব শিক্ষক, পিতামাতা ও গুরুজনের।

শিশুরা আলোর কম্পন, বাতাসের মর্মর ধ্বনি, উড়ন্ত রঙিন বেলুন পছন্দ করে। কারণ এগুলো ছন্দোময়। শিশুদের এই সহজাত ছন্দবোধকে পূর্ণতা দেওয়ার জন্য, শিশু বয়সের এই স্তরে তাদের ছন্দের শিক্ষা বা Rhythmical training দেওয়ার প্রয়োজন। কোনও রূপ বাদ্যযন্ত্র ছাড়াও যাতে বিভিন্ন ধরণের খেলাধুলা, নাচ-গানের মাধ্যমে তারা তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যথাযথ ব্যবহার ঘটাতে সক্ষম হয় তার উপরই বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। শুধুমাত্র ড্রয়িং পেণ্টিং কোনও মতেই শেখানো সমীচীন নয়। কাজে বৈচিত্র্য আনার জন্য কখনও কখনও অতি সহজলভ্য জিনিষের মাধ্যমে নানা ধরণের মজার মজার খেলনা প্রস্তুত করানো যেতে পারে, যা এই বয়সের শিশুদের অত্যন্ত প্রিয়। শিশুরা গল্প শুনতে ভালবাসে, তাই মাঝে মাঝে তাদেরকে মজার মজার রূপকথার গল্প এবং ছড়া শেখানো যেতে পারে। সব সময় যে তারা শ্রোতার ভূমিকাই গ্রহণ করবে তা নয়। আধো আধো কথায় তারাও যাতে গল্প বলার স্বাধীনতা পায়, সেরকম স্বাধীনতা তাদেরকে দিতে হবে। তাহলেই সৌন্দর্য শিক্ষার একটি সামগ্রিক মান তাদের মধ্যে গড়ে উঠবে। এবিষয়ে শিক্ষক পিতামাতার বিশেষ নজর রাখা প্রয়োজন। শিশুবয়সের এই স্তরে যে জিনিষটার প্রয়োজন সব থেকে বেশী, তা হোল শিক্ষক-শিক্ষার্থীর পারস্পরিক হৃদ্যতার সম্পর্ক। এই সম্পর্ক স্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত সৌন্দর্য শিক্ষায় কোনও মতেই পূর্ণতা আসবে না। এমন অনেক শিক্ষক আছেন যাঁরা প্রচুর সাজ-সরঞ্জাম ছাড়াও উপযুক্ত শিক্ষক হতে পারেন। আবার এমন অনেক শিক্ষক আছেন যাঁরা প্রচুর সাজ-সরঞ্জাম থাকা স্বত্বেও উপযুক্ত শিক্ষক হিসেবে পরিগণিত নাও হতে পারেন। এখানে বৃত্তি শিক্ষায় শিক্ষিত শিক্ষকের স্থান একেবারেই নগন্য। শিশুর বয়স এবং মানসিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নানা বিধিনিষেধের মধ্য দিয়ে শিক্ষা অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলে। শিশুর প্রথম শিক্ষা শুরু হয় পিতামাতার কাছে। তারপর সে আসল শিক্ষা লাভ করে শিক্ষকের সান্নিধ্যে। এখানে শিক্ষক এবং পিতামাতা হলেন Agent of the process of Adjustment, অর্থাৎ জীবনের অগ্রগতির

সঙ্গে সঙ্গে যাতে সে প্রতিটি ক্ষেত্রেই অভিযোজনে সক্ষমতা লাভ করে সে বিষয়ে শিক্ষক ও পিতামাতার সক্রিয় ভূমিকা অপরিহার্য। তা হলেই শিশু বয়সের এই স্তরে শিল্পশিক্ষা সার্থক হয়ে উঠবে এবং ভালবাসা সর্বদাই প্রজ্জ্বলিত দীপশিখার মত বিরাজ করবে।

(খ) প্রাথমিক স্তর (Primary Stage)

এই বয়সে শিশুরা কল্পনার রাজ্য ছেড়ে ভাবের রাজ্যে পদার্পণ করে। নানা ধরণের তথ্যমূলক বা সৃষ্টিমূলক কাজে আগ্রহী হয়। ছবি আঁকা, ছবি দেখার প্রতি উৎসাহ বাড়ে। নানা ধরণের কৌতূহল জাগে। অজ্ঞাত বিষয় সম্বন্ধে উৎসাহ জন্মে। এক্ষেত্রে শিল্প-শিক্ষণ পদ্ধতির ক্রমানুগতিক ভাব বজায় রাখতে হবে। অর্থাৎ infant বা শৈশবে অনুসৃত পদ্ধতির অনুরূপ পদ্ধতির সুষ্ঠু প্রয়োগ ঘটাতে হবে। তাহলেই শিল্প শিক্ষার উদ্দেশ্য সার্থক হবে। কিন্তু বর্তমান ত্রুটীপূর্ণ শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষকদের মধ্যে বিষয়গত পার্থক্য থাকার দরুন পদ্ধতির ক্রমানুগতিক (Continuity) ভাব বজায় রাখা খুবই কষ্টকর। সুতরাং শিক্ষার যে কোনও স্তরেই হোক না কেন—এই ধরণের পার্থক্য থাকা সমীচীন নয়।

শিক্ষার্থীর জীবনে বাল্য, কৈশোর এবং যৌবন যদিও এক-একটি স্বতন্ত্র স্তর তবুও প্রতিটি স্তরের সঙ্গে প্রতিটি স্তর এক অখণ্ড যোগসূত্রে আবদ্ধ। শিক্ষার্থী বাল্য থেকে কৈশোর, কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণ করে। এতে শুধুমাত্র তার শারীরিক পরিবর্তন হয় না মানসিক পরিবর্তনও হয়। এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই পদ্ধতির সুষ্ঠু প্রয়োগ হওয়া উচিত।

এমন অনেক শিক্ষক আছেন যাঁরা শুধুমাত্র infantদের শিক্ষাদানে পারদর্শী। আবার এমন কিছু শিক্ষক আছেন যাঁরা Seniorদের শিক্ষাদানে পারদর্শী। এক্ষেত্রে সেই শিক্ষকই উপযুক্ত শিক্ষক যিনি প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তরের যে কোনও শ্রেণী কক্ষেই স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াবার উপযুক্ত।

শিশুবয়সের প্রাথমিক স্তরে নিছক ড্রয়িং, পেণ্টিং-এর উপর কোনও গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন নেই। যাতে তারা নাটকীয় অভিব্যক্তি (Dramatic Expression), সাংগীতিক অভিব্যক্তি (Musical Expression) এবং মৌখিক অভিব্যক্তি (Verbal Expression)তে পারদর্শিতা লাভ করে, সে বিষয়ে শিক্ষককে বিশেষ নজর দিতে হবে। কাজে বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য নানা ধরণের object drawing বা নিঃস্পন্দ জীবনের ছবি (Still life) করানো যেতে পারে। যার মাধ্যমে তারা বস্তুর মাপজোক, হিসাব-নিকাশ, বস্তুর আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক গড়ন কৌশল সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হতে পারে। শিশু শিক্ষার এই স্তরে নানা ধরণের হাতের কাজের প্রকল্প (Project) নিতে

হবে। প্রকল্পের মধ্যে থাকবে পরিকল্পনা কর্মপ্রস্তুতি, কর্মসম্পাদন ও মূল্যায়ণ। এই রকমের প্রকল্প বিদ্যালয়ের সারা বছরের পাঠসূচীর অন্তর্ভুক্ত হবে।

প্রাকৃতিক ইতিহাস, ভূগোল এবং খুব সহজ ধরণের রাসায়নিক ও পদার্থ-বিদ্যার নানা রকম সমস্যা প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এই ধরণের প্রকল্প বিদ্যালয়ে সারা বছরের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হলে বিদ্যালয় হয়ে উঠবে শিক্ষা-নাটকের রঙ্গমঞ্চ। শিক্ষার্থীরা সেখানে অভিনেতা অভিনেত্রীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে। আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থার প্রাথমিক স্তরে এইভাবে চারু ও কারু শিল্প শেখানোর রেওয়াজ নেই। কিন্তু পাশ্চাত্যে শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে চারু এবং কারু শিল্প বিষয়টি এই ভাবেই শেখানো হয়ে থাকে যার পরিচয় আমরা বই পুস্তক পঠনপাঠন থেকে জানতে পারি।

(গ) **মাধ্যমিক স্তর** (Secondary Stage)

এই বয়সে শিক্ষার্থীরা নাচ-গান সেলাই বোনা, খেলাধুলা, ছবি আঁকা, অভিনয়, করার প্রতি বিশেষ ভাবে আগ্রহান্বিত হয়। পদার্থ ও রসায়ণ বিদ্যার নানা রকম জটিল সমস্যা সমাধানে বেষ্টিত হয়। স্থূল চিন্তা ছেড়ে সূক্ষ্ম চিন্তায় আগ্রহান্বিত হয়। পার্থিব উপাদানের সাহায্যে কল্পনার সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। অংকিত ছবিতে ড্রয়িং এর প্রকার ভেদ এবং গল্পের আভাস অনুভূত হয়। সুতরাং শিশুশিক্ষার এই স্তরে শিল্প শিক্ষণের জন্য ড্রয়িং পেন্টিং এ শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের বিশেষ প্রয়োজন হয়।

মানুষের জীবনে বাল্য, কৈশোর, যৌবন যেমন একই সূত্রে গ্রোথিত তেমনি কোনও বিষয় পাঠ, কোনও বিষয় পাঠ থেকে স্বতন্ত্র নয়। আমরা জানি ইতিহাস ছাড়া যেমন ভূগোল পড়ানো যায় না। ভূগোল ছাড়াও অর্থনীতি পড়ানো অসম্ভব। শিশুশিক্ষার এই স্তরে শিল্পশিক্ষা দিতে হলে অনুবন্ধ প্রণালী (Correlation) র আশ্রয় নিতে হবে। অর্থাৎ চারু এবং কারু শিল্পটিকে মূল বিষয় ধরে নিয়ে অন্যান্য আনুসঙ্গিক বিষয়ে শিক্ষা দিতে হবে।

অনেক গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষের সমন্বয়ে যেমন মৌমাছির চাকের সামগ্রিক আকৃতিটি রূপ লাভ করে তেমনি অনেকগুলি শিক্ষনীয় বিষয় শেখানোর উদ্দেশ্যে একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে, যাকে আমরা বলি বিদ্যালয়। এখানে শিক্ষার্থীরা স্বাধীন ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেছে নেবে কোন বিষয়টি তার ভাল লাগে। কোন বিষয়ে তার আগ্রহ বেশী। সুতরাং পাঠ্যক্রমকে (Curriculum) কিছুটা নমনীয় করতে হবে। পাঠ্যক্রমের মধ্যে এই স্বাধীনতা না থাকলে পদ্ধতি নির্বাচনের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ রূপে ব্যর্থ হবে।

তাৎপর্য বা গুরুত্ব (Signification)

বিভিন্ন ধরণের অভিজ্ঞতা ও গবেষণার মধ্যে দিয়ে দেখা গেছে, যে প্রতিটি শিক্ষার্থীই নিজের কাজের প্রশংসা চায়। অতিরিক্ত প্রশংসা শিশুদের মানসিক বিকাশের পথ রুদ্ধ করে। শ্রেণী কক্ষে সকলের কাজ হয়ে যাওয়ার পর প্রতিটি শিক্ষার্থীর শিল্পকর্ম, যাতে শিক্ষক বা শিক্ষিকা বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কাজের দোষ গুণ বিচার করে উৎসাহিত করেন সে বিষয়ে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। তা না হলে তারা নিরুৎসাহিত হয়। আর সাথে সাথে তাদের কোমল মনটি ব্যথিত হয়ে ওঠে।

শিল্প শিক্ষক বা শিক্ষিকা শিক্ষার্থীদের ঠিক ততটুকুই সাহায্য করবেন যতটুকু না করলে শিক্ষার্থীরা সুষ্ঠু ভাবে কাজটি সম্পন্ন করতে পারবে না। কোনও শিক্ষার্থী ড্রয়িং করতে না পেরে যদি শিক্ষক বা শিক্ষিকার শরণাপন্ন হয় তাহলে শিক্ষক বা শিক্ষিকার উচিত বস্তুটি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পর্যবেক্ষণ করার পর যথাযথ ভাবে ড্রয়িং করতে নির্দেশ দেওয়া এবং সেই ভাবে কাজে উৎসাহিত করা।

শিল্পকক্ষের নিয়ম শৃংখলা (Discipline) একটা খুব বড় জিনিষ। শিশুরা যাতে কাজের প্রতি বীতরাগ না হয়, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে। যদি কোনও শিক্ষার্থী শিল্প কাজে নারাজ হয় তাহলে পরিবেশের গুণে সেও কাজে মনোযোগী হতে বাধ্য। সুতরাং শিল্পকক্ষের নিয়ম শৃংখলা এমনিই হওয়া প্রয়োজন যেখানে শিক্ষার্থীরা কাজ ও খেলা একই সঙ্গে করতে পারে।

এমন অনেক শিক্ষার্থী আছে যাদের বিশেষ কোনও বিষয়ে আগ্রহ নেই অথচ শ্রেণীর অন্যান্য শিক্ষার্থীরা সেই কাজ করতে ভালবাসে, সে ক্ষেত্রে শিক্ষক বা শিক্ষিকা কোনও রূপ চাপ সৃষ্টি করে সেই কাজ করাবেন না। বরং সহানুভূতি সম্পন্ন বোঝাপড়ার ভেতর দিয়ে তাদেরকে কাজে আগ্রহী করে তুলবেন।

শ্রেণীকক্ষের কোনও শিশুই বোকা নয়। বিভিন্ন শিশুর মধ্যে বিভিন্ন ধরণের সৃজন প্রতিভা সুপ্ত অবস্থায় থাকে, এবং বিভিন্ন মাধ্যমে বিভিন্ন শিশু পারদর্শী হতে পারে। এমন অনেক শিক্ষার্থী দেখা যায়, যারা চিত্রশিল্পে পারদর্শী বা আগ্রহী নয়। কিন্তু মাটির কাজে (Modelling) এ আগ্রহী, সে ক্ষেত্রে তাদের মনোমত কাজে আগ্রহী করে তুলতে হবে।

তাহলে প্রশ্ন হতে পারে, পদ্ধতি কি হওয়া উচিত ? এর উত্তরে বলা যায় সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিশুর মন পরিবর্তিত হচ্ছে। সুতরাং বিশেষ কোনও পদ্ধতি না গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত। এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে "Moment decides the method".

নষ্ট ছেলেদের (Spoilt child) সর্বদা সংশোধন করা যায় না। শিল্প চর্চার মাধ্যমে কিছুটা পরিমাণে সংশোধন করা যায়। তাদের এমন কোনও মাধ্যমে কাজ শেখানো উচিত, যে মাধ্যমে সে ইতিপূর্বে কাজ করেনি। এক্ষেত্রে কোনও শিক্ষার্থীকে শাস্তি বা তিরস্কার করা উচিত নয়। সহানুভূতি সম্পন্ন বোঝাপড়া ও ভালবাসার মাধ্যমে তাদের কাজে আগ্রহী করে তুলতে হবে।

বড়দের ছবি যাতে শিক্ষার্থীরা অনুকরণ (Copy) না করে সেদিকে শিক্ষকের সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত। অনুকরণে তাদের স্বতঃস্ফূর্ত মানসিক বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়। কারণ অনুকরণটা Art না, অনুকরণকারী কোনও দিন Artist হতে পারে না।

একজন আদর্শবাদী শিল্পশিক্ষক (Art teacher) সম্বন্ধে এই কথা বলা যেতে পারে—"The art teacher must be humblest and most modest person, who sees in a child a miracle of God not pupil material".

শিল্প শিক্ষকের কার্যাবলী
(Role of an Art teacher)

শিল্প এমন একটা বিষয় যা কেউ কাউকেই শেখাতে পারে না। কোনও দেশ কোনও জাতিই কোনও ব্যক্তিবিশেষ Art শেখাতে পারে না, Art সম্পূর্ণরূপে নিজস্ব ব্যক্তিসত্বার উপর নির্ভরশীল। প্রকৃত শিল্পী তৈরী করা কারও পক্ষেই সম্ভব না। প্রকৃত শিল্পী হাজারের মধ্যে একজন জন্ম গ্রহণ করেন। শিল্প শিক্ষার ব্যাপারে বিদ্যালয়েরও কোনও ভূমিকা নেই। বিদ্যালয় কেবলমাত্র শিক্ষার্থীর সুপ্ত শিল্পস্বত্বাকে সুস্পষ্ট রূপে প্রতিভাত হতে সহায়তা করে মাত্র। শিল্প শিক্ষার ব্যাপারে আদর্শবাদী অভিভাবকদের একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। এক্ষেত্রে অভিভাবকদের সাধারণতঃ তিনভাগে ভাগ করে নেওয়া যেতে পারে। একধরণের অভিভাবক আছেন যাঁরা সর্বদাই শিশুদের প্রতি একটা অবজ্ঞার ভাব পোষণ করেন, কারণ অকারণে শাস্তি দেন তিরস্কার করেন, এক্ষেত্রে শিশুরা অভিভাবকদের ভয় করে, যতটা সম্ভব এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করে। আর এক ধরণের অভিভাবক আছেন যাঁরা শিশুদের প্রতি উদাসীন ভাব পোষণ করেন। শিশুদের মানসিক প্রবনতার দিকে লক্ষ্য না রেখে, নিজেদের মনোমত পথে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেন। আর এক ধরণের অভিভাবক আছেন যাঁরা শিশুদের মানসিক প্রবণতা দূর থেকে লক্ষ্য করেন এবং স্নেহ ভালবাসা ও সহানুভূতির সাথে শিশুর কোমল মনটিকে জানার চেষ্টা করেন ও তার বাঞ্ছনীয় পথে পরিচালিত করতে চেষ্টা করেন। শিল্পশিক্ষার ক্ষেত্রে এরাই হলেন আদর্শবাদী অভিভাবক।

শিল্পশিক্ষকের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হোল, শিল্প কক্ষ বা Art room পছন্দ করা। শিল্পশিক্ষার ক্ষেত্রে Art room এর একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আলোবাতাস যুক্ত এমন একটি জায়গায় শিল্প শিক্ষার উপযুক্ত কক্ষ নির্বাচন করা উচিত, যেখানে প্রবেশ করা মাত্রই যে কোনও শিক্ষার্থীর মন কিছুটা শিল্পীসুলভ হয়ে পড়বে। আমাদের দেশের এবং বিদেশী শিল্পীদের আঁকা ছবি ও মূর্তির ভাল ছাপা ছবি দিয়ে এই পরিবেশটিকে মনোরম করে তোলার দায়ীত্ব শিল্প শিক্ষকের। শিল্প শিক্ষক যদি এই কাজে কৃতকার্য হন তাহলে শিল্প শিক্ষার অর্দ্ধেক কাজ আপনা-আপনি সমাপ্ত হয়ে যাবে। এই সৃজনমূলক পরিবেশটি তৈরী করার

অধিকাংশটাই নির্ভর করছে শিল্প শিক্ষকের রুচি, অভিজ্ঞতা ও অন্তর্দৃষ্টির উপর।

শিল্প শিক্ষকের দ্বিতীয় কাজ হোল কিছু সহজবোধ্য শিল্প নিদর্শণের বই শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেওয়া যাতে তাদের শিল্প দৃষ্টি ও শিল্পবোধ জাগ্রত হয়। মাঝে মাঝে যাদুঘর ও শিল্প সমৃদ্ধ স্থানে শিক্ষামূলক ভ্রমণের (Educational Excursion) ব্যবস্থা করতে হবে। বিদ্যালয় জীবনে শিক্ষার্থীর একটি ইন্দ্রিয় কাজ করে, এই ধরণের শিক্ষামূলক ভ্রমণে শিক্ষার্থীর পাঁচটি ইন্দ্রিয়কেই কাজে লাগানো সম্ভব হবে। দৈনন্দিন একঘেঁয়ে জীবন থেকে তাদের মন সাময়িকভাবে আনন্দলোকে মুক্তি পাবে। পড়ে জানার থেকে চোখে দেখে শিক্ষার্থীরা বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করবে। নিছক সৌন্দর্য উপভোগের সাথে সাথে দেশের শিল্পবস্তুর সঙ্গে তাদের পরিচয় ঘটবে। শিল্প বস্তুগুলির Sketch, Plaster casting করে নিয়ে এসে শিক্ষার্থীরা তাদের বিদ্যালয় Museum সমৃদ্ধ তো করবেই পরন্তু হাতে কলমে কাজ করার সুযোগ পাবে। শিল্প শিক্ষক সেখানকার শিল্প বস্তুগুলির শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়, কোনও বিদেশী প্রভাব কাজ করেছিল কিনা, সেই সময়কার ধর্ম, দর্শণ, ইতিহাস, ভৌগলিক পটভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করবেন। এই ভ্রমণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শিল্পবিষয়ক অনেক অজানা তথ্যের সন্ধান পাবে যা হাজারটা বক্তৃতার মাধ্যমেও সম্ভব না।

প্রকৃতির সাথে সখ্যতা স্থাপনের জন্য শিল্প শিক্ষক বিদ্যালয়ে বিভিন্ন ঋতুতে ঋতু উৎসবের আয়োজন করবেন। বিশেষ করে শহরের ছেলে মেয়েদের কাছে এর মূল্য অপরিসীম। কারণ সেই ঋতুর ফুল ফল সংগ্রহের মধ্যে দিয়ে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ (Nature Study) সম্ভব হয়ে উঠবে, এবং সৃষ্টিমূলক কাজে তা ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হবে। এই সমস্ত ঋতু উৎসবের জন্য বনভোজন (Picnic), ঋতু উৎসবের বেশভূষা খেলাধূলার ব্যবস্থা অবশ্যই থাকবে।

বছরের শেষে শিল্প শিক্ষকের উদ্যোগে বিদ্যালয়ে একটি শিক্ষামূলক শিল্প প্রদশনীর (Educational Art Exhibition) আয়োজন করতে হবে। প্রতিটি শিক্ষার্থীই যাতে নিজেদের তৈরী দু'একটি শিল্প কর্মের নমুনা ভালবাসার সঙ্গে এনে যোগ দিতে পারে যে সম্পর্কে শিল্প শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করবেন। প্রদর্শনীর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ধরণের হাতের কাজের সঙ্গে পরিচিত হবে। ফলে নিজেরাই নিজেদের কাজের মূল্যায়ণে সক্ষম হবে। একসাথে মিলেমিশে কাজ করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহযোগিতা মূলক মনোভাব গড়ে উঠবে। প্রদর্শনীকক্ষে একটি অনাড়ম্বর ভাবগম্ভীর পরিবেশ সৃষ্টির জন্য, প্রদর্শনীকক্ষ সাজানো, আল্পনা দেওয়া, প্রভৃতি কাজে শিক্ষার্থীরা নিজেদের শিল্পনৈপুণ্য প্রকাশে সহজতা লাভ

করবে। প্রতিটি শিশুই নিজের কাজের প্রশংসা চায়। যদি এই প্রদর্শনীতে পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকে তাহলে শিশু শিক্ষার্থীরা উৎসাহের সঙ্গে পরবর্তী কাজে অগ্রসর হবে। নিজের কাজের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাবে, যখন দেখবে তার শিল্প সামগ্রী ও অন্যান্য শিক্ষার্থীদের কাজের সঙ্গে সমান মর্যাদায় প্রদর্শনীকক্ষে স্থান পেয়েছে। এই ধরণের প্রদর্শনী উৎসব উপলক্ষ্যে শিক্ষার্থীরা শিল্প সমন্বিত একটি পত্রিকাও প্রকাশ করতে পারে। অবশ্য এই ব্যাপারে শিল্পশিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাধ্যমত উৎসাহিত করবেন। প্রদর্শনী উৎসবটি নৃত্য, গীত, এবং নানা ধরণের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন।

শিল্প ও কর্মশিক্ষা

Art & Work Education

শিক্ষাদান এবং শিক্ষাগ্রহণ এই কথা দুটো শিক্ষাক্ষেত্রে বহুল ব্যবহৃত হলেও সঠিক অর্থে ব্যবহৃত হয় না। আমরা জানি, যে বিষয়ই হোক না কেন, আমরা কেউ কাউকে কিছু শেখাতে পারি না। শিক্ষার্থী নিজে নিজে শেখে। শিক্ষক শুধু তাকে সঠিক পথটি বাৎলে দেন মাত্র। এক্ষেত্রে শিক্ষককে একটা কৌশল অবলম্বন করতে হয়। একটি বিশেষ কৌশলে প্রথমে তিনি শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটা ভাবজটের (apperceptivemass) সৃষ্টি করেন। তার থেকে আসে ধারণা, তারপর আসে জ্ঞান। শিল্প শিক্ষার ক্ষেত্রে এই কৌশলটি অপরিহার্য।

আধুনিক ভারতীয় শিক্ষা, পুস্তক কেন্দ্রিক শিক্ষার সাথে সম্পর্ক যুক্ত নয়। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর তাৎপর্য যেমন কিছুটা পাল্টেছে, শিক্ষকের তাৎপর্য ও কিছুটা পরিবর্ত্তিত হয়েছে। তাত্ত্বিক দিক থেকে তার গুরুত্ব কিছুটা হ্রাস পেলেও শিক্ষণের ক্ষেত্রে তার গুরুত্ব অনেকখানি বৃদ্ধি পেয়েছে। শিক্ষক এখানে কেবল মাত্র তাঁর পুঁথিগত বিদ্যা শিক্ষার্থীর কাছে উজাড় করে দেবেন না। তাদের তিনি সক্রিয় করে তুলবেন। তাই আধুনিক শিক্ষার মূলমন্ত্র হোল Learning through doing অর্থাৎ কাজের মাধ্যমে শিক্ষা। একটি বিশেষ বিষয়কে কেন্দ্র করে অন্যান্য আনুসঙ্গিক বিষয়ে শিক্ষা লাভ। সেই কারণে কর্মশিক্ষা (Work Education) কে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে একটি বিশেষ বিষয় হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। কর্মশিক্ষার আদর্শ বিজ্ঞান ভিত্তিক। কর্মের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞানের যথাযথ প্রয়োগই হোল কর্মশিক্ষার মূল মন্ত্র।

অনেকের মতে শিল্পশিক্ষা কর্মশিক্ষার পরিপূরক, কিন্তু আমরা খুব ভালভাবেই জানি, কোনও বিষয় কোনও বিষয়ের পরিপূরক নয় বরং অনুপূরক। সুতরাং কর্মশিক্ষা যেমন শিল্পশিক্ষার বিকল্প হতে পারে না, তেমনি শিল্পশিক্ষাও কর্মশিক্ষার বিকল্প নয়। কর্মশিক্ষা ও শিল্পশিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ভিন্ন হলেও এক জায়গায় দুই বিষয়ের মিল খুঁজে পাওয়া যায় যে দুই বিষয়ই ক্রিয়াকেন্দ্রিক (Activity Centered)। কি গৃহ পরিবেশ, কি বিদ্যালয় পরিবেশ, যে কোন ক্ষেত্রেই হোক না কেন, শিক্ষার্থীকে সক্রিয়তার সুযোগ দিতে হবে। এইভাবে শিশুবয়স থেকেই শিক্ষার্থীদের

সক্রিয়তার সুযোগ দিলে তাদের মধ্যে একটা উৎপাদন মূলক সক্রিয়তার (Productive Activity) অভ্যাস তৈরী হবে। এক্ষেত্রে কর্মশিক্ষা ও শিল্প এই দুই বিষয়ের মধ্যেই যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। কি গৃহে, কি গৃহের বাইরে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উৎসব অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের সক্রিয়তায় অংশ গ্রহণে সুযোগ পেলে তারা যে কোনও উৎপাদনাত্মক কাজে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করবে। আধুনিক যুগে শিক্ষার্থীদের কাছে অবসর বিনোদন একটা বিরাট সমস্যা। শিক্ষার্থীরা নানাভাবে অবসর বিনোদন করে থাকে, কেউ গল্পের বই পড়ে অবসর বিনোদন করে, কেউ তাস খেলে অবসর বিনোদন করে, কেউবা অলীক বা অবাস্তব কল্পনার জগতে বিচরণ করে অবসর বিনোদন করে। এর ফলে অনেকেই ভবিষ্যতে সুখী সুন্দর জীবন যাপনে ব্যর্থ হয়। অবাঞ্ছিত ভাবে অবসর বিনোদন মনোবিজ্ঞান সম্মত নয়। তাই শিশু বয়স থেকে সুপরিকল্পিত উপায়ে, বাঞ্ছিত আমোদ-প্রমোদের মাধ্যমে অবসর বিনোদনের অভ্যাস তৈরী করা উচিত। সেক্ষেত্রে কর্ম ও শিল্পশিক্ষাকে অবসর বিনোদনের উপায় হিসেবে ব্যবহার করলে একদিকে চারু শিল্প আমাদের দৈনন্দিন দুঃখ দ্বন্দ্বে সংকুচিত মনকে যেমন আনন্দলোকে মুক্তি দেবে, তেমনি কর্মশিক্ষা সৌন্দর্যের সোনার কাঠি ছুঁইয়ে জীবনযাত্রা পথকে শুধু সুন্দর করে গড়ে তুলবে, তাই নয়, আজকের দিনে যে আর্থিক সমস্যা, সেই সমস্যারও কিছুটা সমাধানে সহায়তা করবে বিদ্যালয়ে সারা বছরই নানা ধরণের কৃষ্টি মূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়ে থাকে যেমন ২৫শে বৈশাখ, রবীন্দ্র জয়ন্তী, শিক্ষক দিবস, বার্ষিক ক্রীড়া প্রদর্শনী, শিক্ষামূলক শিল্পমেলা প্রভৃতি। এই উৎসব অনুষ্ঠান গুলিকে সাফল্য মণ্ডিত করে তোলার জন্য রুচী সম্মতভাবে সাজসজ্জার প্রয়োজন, উৎসব অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আমন্ত্রণ লিপি প্রস্তুতকরণ, হাতে লেখা পত্রিকা প্রকাশ ও অলংকরণ, বিদ্যালয়ের নাট্যানুষ্ঠানের মঞ্চসজ্জা, অভিনেতা, অভিনেত্রীদের চরিত্র অনুযায়ী পোষাক-পরিচ্ছদ তৈরী প্রভৃতি নানা কাজে শিক্ষার্থীদের সুযোগ দিলে তারা সানন্দে এই গুরু দায়ীত্ব পালন করবে। ফলে একদিকে তাদের কর্মবিমুখ মন যেমন কর্মমুখী হয়ে উঠবে তেমনি নিজ নিজ শিল্প কাজে তারা তাদের শিল্প নৈপুণ্য প্রকাশে সহজতা লাভ করবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিবেশে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় করে তোলার জন্য শিল্পশিক্ষার গুরুত্ব যেমন অনস্বীকার্য তেমনি কর্মশিক্ষার গুরুত্বকেও অস্বীকার করা যায় না।

এছাড়া শুধুমাত্র চারু ও কারুকলার নৈপুণ্য প্রকাশের জন্য যে সমস্ত সক্রিয়তার কথা আমরা জানি, সেগুলি পরবর্তী স্তরে আলোচনা করা হোল।

আল্পনা—

বিশ্ব প্রকৃতি তার রূপের ভাণ্ডার আমাদের কাছে উজাড় করে দিয়েছে, সেই রূপসুধা পান করে মানুষের মন যখন ভাব-কল্পনা, রূপ ও ছন্দের, মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয় তখন তার নান্দনিক চেতনার উন্মেষ ঘটে। আল্পনা মানুষের সেই নান্দনিক চেতনারই বহিঃপ্রকাশ। মানব ইতিহাসের শৈশবে মানুষ গুহার চারিপাশে প্রথম আল্পনা দিয়েছিল, কোনও অশুভ শক্তির হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার উদ্দেশ্যে। তারপর সমাজ ও সময় অনুযায়ী আপনার রীতি পদ্ধতি ও প্রয়োজনের তারতম্য ঘটেছে। এখন আল্পনা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের সূচক নয়, অশুভ শক্তির প্রতিরোধকারী বস্তু ও নয় বরং এক উন্নত মানের শিল্পকলা।

'সংস্কৃত' আলিম্পন শব্দ থেকে আল্পনা শব্দটির উৎপত্তি। এর অর্থ হোল অলংকরণ। আল্পনায় রয়েছে আলংকারিক পরিকল্পনা। প্রাকৃতিক বস্তু যেমন আম্রপল্লব, ফুল ফল, আদ্ধচন্দ্র শঙ্খ, লতাপাতা, পদ্ম প্রভৃতির অসংখ্য ছন্দোময় রূপ। আল্পনা অঙ্কনে শৃংখলা নিয়মকানুন অবশ্যই থাকে, কিন্তু তা জ্যামিতিক বা গানিতিক কাঠিন্য বহির্ভূত। আল্পনা অঙ্কনে একই বস্তুর রূপ একাধিকবার ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আল্পনা যিনি আঁকেন এবং যে গতির সাথে তাঁর মন ও আঙ্গুল সঞ্চালিত হয়, তাতে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যটি তার শিল্প-কর্মের মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়।

প্রাচীনকালে ভারতীয় গৃহস্থ বধূরা পিটুলী গোলা জলে আল্পনা দিতেন। কোনও কোনও ক্ষেত্রে পিটুলী গোলা জলের সঙ্গে রং মিশিয়ে ব্যবহার করতেন, আধুনিক যুগে অবশ্য পিটুলী গোলা জল ছাড়াও নানা রং মিশ্রিত কাঠের গুঁড়ো, নানা রং এর ফুল পাতা, কলাইয়ের ডাল, নানা রং মিশ্রিত বালি প্রভৃতি আল্পনায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

আল্পনা শিল্প শিক্ষার একটি বিশেষ আঙ্গিক। শিশু শিক্ষার্থীদের বয়স এবং গ্রহণ ক্ষমতা অনুযায়ী আল্পনার রীতি পদ্ধতি সম্বন্ধে ধারণা দেওয়ার প্রয়োজন। যারা ফুল-ফল, লতা-পাতার আলংকারিক রূপ দিতে অপারগ, তদেরকে তাদের অতিপরিচিত অক্ষর মালাকে আল্পনার ঢং এ সাজিয়ে আল্পনা সমন্ধীয় প্রাথমিক ধারণা দিতে পারলে বিষয়টি যেমন সহজ হবে তেমনি তাদের নিজস্ব প্রতিভা বা নৈপুন্যের পরিচয় দিতে পারবে।

ফেলাফেলার ছবি বা কোলাজ:

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এমন কিছু অতি সাধারণ তুচ্ছ বস্তু নজরে পড়ে যেগুলো কোনও এক সময় প্রয়োজন ছিল এখন প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে বলে সেগুলোকে অবহেলা ভরে পথের ধুলায় ফেলে না দিয়ে সৃষ্টিমূলক কাজে

লাগিয়ে তার মূল্যবোধকে বর্দ্ধিত করাই হোল হেলাফেলা কাজের বৈশিষ্ট।

শিল্প ইতিহাসে হেলাফেলার ছবিকে বলা হয় "কোলাজ"। কোলাজ শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে ফরাসী ভাষার ক্রিয়াপদ Coller শব্দ থেকে। Coller শব্দের অর্থ হোল জোড়া বা সাঁটা ছবি। উনিশশো সাত থেকে উনিশশো চোদ্দ খৃষ্টাব্দে স্পেনের শিল্পী পাবলো পিকাসো এবং ফ্রান্সের শিল্পী জর্জ ব্রাক, সেজানের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে যখন 'ঘনকবাদ' (Cubism)কে আক্ষরিক অর্থে শিল্পক্ষেত্রে প্রয়োগ করলেন তখন 'ঘনকবাদ' কয়েকটি বিশেষ পর্যায়ে বিভক্ত হয়ে যায়। 'ঘনকবাদে'র বিশ্লেষণাত্মক পর্যায়ে, পিকাসো এবং ব্রাক রং তুলি ক্যানভাস ব্যবহার না করে বস্তুর বস্তুময়তা ছবিতে আনার জন্য টিকিট, বেতের বোনা, কাপড়ের টুকরো, খবরের কাগজের টুকরো, গাণিতিক অক্ষর প্রভৃতি পরিত্যক্ত জিনিষ, ক্যানভাসে সাঁটতে শুরু করলেন। এর পূর্বে ছবির উপকরণ বলতে রং, তুলি, ক্যানভাস ছাড়া আর কিছুই বোঝাতো না। পিকাসো এবং ব্রাক সেই রক্ষণশীল ধারায় আঘাত হানলেন এবং দেখালেন যে যেকোনও বস্তুই ছবির উপজীব্য উপকরণ হতে পারে। ফলে ছবির জগতের দিগন্ত বিস্তৃত হোল।

আধুনিক শিল্প শিক্ষার ক্ষেত্রে কোলাজ একটা গুরুত্বপূর্ণ আঙ্গিক। যারা রং-তুলির ব্যবহারে অপারগ তারা কোলাজ ছবির মাধ্যমে তাদের শিল্প পিপাসা সহজেই মেটাতে পারে। যাকে শিশু শিল্পে নাম দেওয়া হয়েছে "হেলাফেলার ছবি"।

লিনো ছাপ ছবি (Lino Cut and Print):

চতুর্দশ শতাব্দীর পর কাগজ আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে লিনো ছাপাই, ছবির জগতে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করে। চতুর্দশ শতাব্দীর পূর্বে লেখা, ছবি ও ড্রয়িং প্রভৃতি ছাপানোর কাজে পার্চমেণ্ট ব্যবহার করা হোত। পার্চমেণ্ট হোল চামড়ার এক ধরণের ফলক কিন্তু খুব স্পষ্ট, নিখুঁত ছাপের ক্ষেত্রে পার্চমেণ্ট খুব একটা উপযুক্ত নয়। কাগজ আবিষ্কারের পূর্বে ছাপাই ছবি খুব একটা অগ্রসর হতে পারেনি।

ছাপাই ছবির সুবিধা হোল যে একই ব্লক থেকে একই ছবির অজস্র প্রতিলিপি স্বল্প সময়ে ও স্বল্প খরচে পাওয়া সম্ভব। প্রথম ছাপাইয়ের কাজ ব্যবসার কাজে ব্যবহৃত হয়। কাঠের ব্লকের উপর নক্সা কেটে একটা সমতল পাটার উপর কাপড় টান টান করে বিছিয়ে ব্লকের উপর রং দিয়ে শাড়ি, বিছানার চাদর প্রভৃতি ছাপানোর কাজ শুরু হয় তারপর ছাপাইয়ের বিভিন্ন প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হয়।

ছাপাই ছবির প্রথম প্রক্রিয়া হোল রিলিফ, দ্বিতীয় প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় ইনতাগলিও এর তৃতীয়টি হোল সারফেস ছাপ ছবি।

উক্ত তিনটি প্রক্রিয়ার মধ্যে রিলিফ পদ্ধতি সব থেকে প্রাচীন। আলুর ছাপ, কাঠ খোদাই, লিনো খোদাই, রিলিফ পদ্ধতির মধ্যে পড়ে। লিনোর উপর ছবি এঁকে যে অংশগুলি সাদা থাকবে সেগুলি কেটে লিনোকাটার যন্ত্র বা ধারালো নরুনের সাহায্যে কেটে রোলারের সাহায্যে ছাপার কালি মাখিয়ে পাতলা নেপানী কাগজ বা প্রিন্টের উপযোগী কাগজের উপর ছাপ নিলেই কালোসাদার ছবিটি নিখুঁতভাবে ছাপা হয়ে আসে। উক্ত পদ্ধতিতে কাঠের ব্লকের উপরও ছাপা ছবি পাওয়া যায়। আধুনিক যুগে অবশ্য কালোসাদা ছাড়াও লিনো বা কাঠের ব্লক থেকে রঙিন ছবি পাওয়া সম্ভব হয়েছে। যদি তিন রংএর ছবির প্রয়োজন হয় তাহলে তিনটি সমান মাপের লিনোর উপর একই ছবি তিনবার ট্রেস করতে হবে। প্রথমটিতে একটি রংএর অংশ রেখে বাকি অংশ কেটে ফেলতে হবে। দ্বিতীয়টিতে অন্য রংএর অংশটি রেখে বাকি অংশ কেটে ফেলতে হবে। আর তৃতীয়টিকে কালো সাদায় কাটতে হবে। এক্ষেত্রে হালকা থেকে গাঢ় রংএ যেতে হবে। এরপর একই মাপের কাগজের উপর প্রথম ব্লকে হালকা রং মাখিয়ে ছাপ দিতে হবে। এরপর শুকিয়ে নিতে হবে। তারপর অপেক্ষাকৃত গাঢ় রং মাখিয়ে দ্বিতীয় ব্লকে একই কাগজের উপর ছাপ দিতে হবে। এবং সর্বশেষে সবচেয়ে গাঢ় ব্লকের ছাপ নিতে হবে। এইভাবে লিনোর মাধ্যমে একটি রঙিন ছবি পাওয়া যেতে পারে।

ইনতাগলিও পদ্ধতি বলতে এচিং, এনগ্রেভিং, ড্রাই পয়েন্ট, প্রভৃতি পদ্ধতিকে বোঝায়। সমতলিয় ফলকে ছাপা ছবিকে আধুনিক পদ্ধতি বলা যায়। লিথো হোল সমতল ছাপ পক্রিয়া। এই পদ্ধতিতেও একাধিক ছাপ ছবি পাওয়া যায়।

বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন সময় শিল্পীরা ছাপ ছবি নিয়ে নানারকম পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন যার পরিচয় আমরা শিল্প ইতিহাস থেকে জানতে পারি। একটা কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, ছাপ ছবি করতে হলে ছাপ নেওয়ার পূর্বে ফলক বা ব্লকে ছবির খসড়া সব সময় উল্টো করে আঁকতে হয় না হলে ছবির বিকৃতি ঘটে।

মাটির মডেল (Clay Modelling) :

প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যে শিশু শিক্ষার্থীদের শিল্প শিক্ষার ক্ষেত্রে মাটির মডেল একটি গুরুত্ব পূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। কারণ শিশু শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গিন বিকাশে এই মাধ্যমটির সমকক্ষ মাধ্যম আর নেই বললেই চলে। মডেল নানা জিনিষের মাধ্যমে শেখানো যায়—যেমন কার্ডবোর্ড, প্লাষ্টার,

মোম ইত্যাদি। কিন্তু গুনাগুন বিচারে মাটিই সব থেকে উল্লেখযোগ্য মাধ্যম। পাশ্চাত্যে অবশ্য মাটির বিকল্প হিসাবে প্লাষ্টিসিন (Plasticine) ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্লাষ্টিসিনের সুবিধা হোল এই যে প্লাষ্টিসিন শুকিয়ে যায় না। হাত-পা-জামা-কাপড় নোংরা হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে না। একবছরের কাজ যত্ন করে রেখে দিলে পরের বছর সেগুলি নতুন করে কাজে লাগানো যায়। কিন্তু যেহেতু আমাদের দেশে প্লাষ্টিসিনের মূল্য অনেক বেশী এবং সব পরিবেশে পাওয়া যায় না। সেই জন্য প্লাষ্টিসিনের বিকল্প হিসেবে এঁটেল মাটি ব্যবহার করাই যুক্তিযুক্ত। এঁটেল মাটির সঙ্গে পরিমান মত গোবর মিশিয়ে মাটিটিকে এমনভাবে তৈরী করে নিতে হয় যাতে মাটির মধ্যে কোনও পাথরের টুকরো থেকে না যায়। তারপর মডেলের কাজে ব্যবহার করা হয়। মডেল তৈরীর সময় কোনরূপ যন্ত্রপাতি ব্যবহার না করে শিক্ষার্থীরা যাতে ইচ্ছে মত হাত ও আঙ্গুল ব্যবহার করতে পারে সে বিষয়ে তাদেরকে সাবধান করে দিতে হবে। তাহলেই শিক্ষার্থীদের কাজে তাদের একান্ত স্পর্শানুভূতিটি অনুভব করা যাবে। মাটির মডেল দুভাবে করা যায়। প্রথমটি হোল রিলিফ পদ্ধতি। আর দ্বিতীয়টি হোল round পদ্ধতি। বিষয় বস্তু হিসেবে প্রাকৃতিক ফর্ম (Natural object) এবং মেকানিক্যাল ফর্ম (Mechanical object) দুইই গ্রহন করা যেতে পারে। প্রাকৃতিক ফর্মের মধ্যে চারাগাছ, নানাধরনের ফল, মাছ ইত্যাদি। আর মেকানিক্যাল ফর্মের মধ্যে চাবি, করাত, ভারতীয় জুতো, হাতুড়ী ইত্যাদি ব্যবহৃত হতে পারে। শিক্ষার্থীদের দৈহিক ও মানসিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিষয় বস্তু আর একটু জটিল ধরনের, যেমন Human figure Composition করানো যেতে পারে।

মৃৎপাত্র চিত্রণ (Pottery Decoration) :

মানব ইতিহাসের শৈশবকাল থেকেই মানুষ সৌন্দর্যের পুজারী। প্রথমাবস্থায় সে নিজেকে সুন্দর ভাবে সাজানোর কৌশল আয়ত্ব করে। তারপর আশপাশের ব্যবহার্য বস্তুগুলিকে আপন মনের মাধুরী মিলিয়ে শ্রীমণ্ডিত করে তুলতে প্রয়াসী হয়। যার পরিচয় আমরা পাই পৃথিবীর বিভিন্ন সভ্যতার ইতিহাস থেকে পাওয়া বিচিত্র মৃৎপাত্র গুলি থেকে।

সুপ্রাচীন কাল থেকেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে নানা লোকাচার, পুজাপার্বন ও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে চিত্রিত মৃৎ পাত্রের ব্যবহার হয়ে আসছে। এই অলংকরণগুলি অনেকটা আল্পনা ধর্মী। এই ধরনের অলংকরনে রয়েছে মুক্তাফল, লতাপাতা, ফুলফলের কেয়ারা, লক্ষ্মীর পদচিহ্ন, শঙ্খ প্রভৃতি। যেহেতু আধুনিক যুগে মৃৎপাত্র চিত্রণ একটি উন্নত মানের শিল্পকলা সেইহেতু অলংকরনের বিষয় বস্তুর মধ্যে কিছু কিছু পরিবর্তন পরিবর্দ্ধন লক্ষ্য করা যায়।

আধুনিক যুগে মৃৎপাত্রের উপর নানাধরণের জ্যামিতিক নক্সা, মুখোশ, মানুষের মূর্ত্তি, দৃশ্য চিত্র প্রভৃতিও অংকণ করা হয়ে থাকে। এগুলি ভারতীয় গৃহস্থ বাড়িতে দেওয়াল ও গৃহসজ্জা হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

শিশুদের শিল্পশিক্ষার ক্ষেত্রেও মৃৎপাত্র চিত্রণ একটি বিশেষ আঙ্গিক। এই আঙ্গিকে কাজ করিয়ে শিক্ষার্থীদের কর্মবিমুখ মনকে যেমন কর্মমুখী করে তোলা যায়, অন্য দিকে তেমনি শিক্ষার্থীদের শিল্পনৈপুণ্য প্রকাশেও অনুপ্রাণিত করা সম্ভব হয়।

অরিগামি (Origami)

অরিগামি শিল্প সম্বন্ধে দীর্ঘদিন আমরা অনভিজ্ঞ ছিলাম। কারণ বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে বিদেশী। সম্প্রতি নারায়ণ সান্যালের 'অরিগামি' বইটি প্রকাশিত হওয়ায় 'অরিগামি' শিল্প সম্বন্ধে জানতে পারি এবং করণ কৌশলও মূল্যবোধ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে শিশু শিল্পে অরিগামি শিল্পকে একটি বিশেষ আঙ্গিক হিসেবে গ্রহন করতে সক্ষম হই।

কাগজ প্রথম আবিষ্কৃত হয় চীনে, তাং পিড়িয়ডে। তখন থেকেই চীনারা নানা ধরণের কাগজের মডেল যেমন চীনা লণ্ঠন, নৌকো, পদ্মফুল প্রভৃতি বানাতে শুরু করে, চীনের প্রতিবেশী দেশ জাপান, কিছুদিনের মধ্যেই জাপান চীনাদের কাছ থেকে এই শিল্পের করনকৌশল আয়ত্ত করে, এই শিল্প নিয়ে উন্নত মানের চিন্তাভাবনা শুরু করে। 'অরিগামি' শব্দের অর্থ হোল কাগজ ভাঁজ করা।

জাপানে প্রতি বছর একটি উৎসব হয়, উৎসবটির নাম হোল শিচি-গো-সান। অর্থাৎ সাত-পাঁচ-তিন। এই উৎসব অনেকটা বাঙ্গালীদের বিজয়া সম্মেলনী অথবা মুসলমানদের ইদলফেতর উৎসবের মত। উৎসবে ধনী, নির্ধন, শত্রু-মিত্র সবাই একজায়গায় এসে জড় হয়। পরস্পর প্রীতি শুভেচ্ছা জানায়, কোলাকুলি করে। আর এই উৎসবের মধ্যমনি হয় সাত-পাঁচ-তিন বছরের শিশুরা। প্রথম দিকে শিশুদের নানা ধরণের মিঠাই দেওয়া হত। কিন্তু এক একজন শিশুর কাছে মিঠাইয়ের পরিমান বেশী হওয়ায়, শিশুদের কাছে তা অপ্রিয় হতে থাকে। ফলে জাপানীরা দু একটা মিঠাইয়ের সঙ্গে একটি করে 'অরিগামি' উপহার দিতে শুরু করে। এরপর জাপানীরা অরিগামির নতুন নতুন মডেল আবিষ্কারে অনুপ্রাণিত হয়, এবং জাপানীদের যে কোনও লৌকিক অনুষ্ঠানে 'অরিগামি' দেওয়ার প্রচলন হয়।

শিল্প শিক্ষার ক্ষেত্রে 'অরিগামি' একটি বিশেষ আঙ্গিক। 'অরিগামি' শিল্প বাড়ীতে বসে যে কেউ অভ্যাস করতে পারে। এর জন্য বিশেষ কোনও

মূল্যবান উপকরনের প্রয়োজন হয় না। সামান্য কিছু কাগজ, কাঁচি, কিছুটা বুদ্ধিও এলেম থাকলেই হোল।

পরবর্ত্তী যুগে জাপানে এই শিল্প এত উন্নত পর্যায়ে উপনীত হয় যে একটি অরিগামি মডেল অবনীন্দ্র নাথের 'উটের মৃত্যু,' লিওনার্দোর 'মোনালিসা'র সমকক্ষ বললেও অত্যুক্তি হয় না। 'অরিগামি' শিল্পকে এই অসাধারণত্বে পেঁছানোর জন্য যে জাপানী শিল্পীর সব থেকে কৃতিত্ব তাঁর নাম হোল 'আকিরা যোশী যাওয়া।' ভাবলে অবাক হোতে হয় যে তিনি এইভাবে কাগজ ভাঁজ করে 'নিজস্ব প্রতিকৃতি' (self portrait) সৃষ্টি করেছেন। এটা যে কি অসাধ্য কাজ তা না দেখলে বা 'অরিগামি' শিল্প সম্বন্ধে না জানলে বিশ্বাস করা যায় না।

('অরিগামি' শিল্প অনুশীলনের জন্য নারায়ণ সান্যালের 'অরিগামি' বইটি অনুসরণযোগ্য)।

নিমন্ত্রণপত্র প্রস্তুতকরণ (Preparation of Invitation Card) :

ভারতীয় তথা বাঙ্গালীরা উৎসব প্রিয় জাতি। এখানে বারোমাসে তেরো পার্বন লেগেই আছে। এই উৎসব গুলোর কোনটা ঘরোয়া কোনটা বা সার্বজনীন।

দুর্গাপূজা এমনই একটি উৎসব। এই সময়ে দূর দূরান্ত থেকে বন্ধু-বান্ধব আত্মীয় স্বজনেরা ঘরে ফেরে। যারা একান্তই ফিরতে পারে না, তাদের উদ্দেশ্য শুভ বিজয়ার মিলনোৎসবের শুভবার্তা পাঠানো হয়। প্রিয়জন, আত্মীয় বন্ধু বান্ধব সকলকেই এইভাবে সম্বর্ধনা ও শুভেচ্ছা জানানো যায়।

দুর্গাপূজার মত নববর্ষ উৎসবও বাঙ্গালী জীবনে একটি মহাসমারোহের দিন। এই দিনটি বাঙ্গালী জনজীবনে নিয়ে আসে নতুন দিনের আশার বাণী। এই মঙ্গলসূচক দিনটিতে তাই আত্মীয়, প্রিয়জন সবাই প্রত্যেকের সুখ ও সমৃদ্ধি কামনা করে। যারা দূরে থাকে তাদের উদ্দেশ্যে পাঠানো হয় মঙ্গলসূচক বাণী।

আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে বাজারে রং চং-এ নানা ধরণের নানা ডিজাইনের নিমন্ত্রণ পত্র পাওয়া যায়। কিন্তু নিজের তৈরী কার্ড'এ যে আন্তরিকতা থাকে তা কেনা কার্ডে থাকে না। কার্ড তৈরীর করণ কৌশল জানা থাকলে যে কেউ ঘরে বসে স্বল্প খরচে, স্বল্প সময়ে নিজের পছন্দ মত কার্ড তৈরী করে প্রিয়জনকে পাঠাতে পারে। এতে একধরণের আত্মতৃপ্তিও লাভ করা যায়। তাই আধুনিক শিল্প শিক্ষার ক্ষেত্রে কার্ড তৈরী একটি বিশেষ আঙ্গিক। শিক্ষার্থীদের বয়স এবং গ্রহণ ক্ষমতা অনুযায়ী যদি তাদের কার্ড তৈরীর পদ্ধতি ও প্রয়োগ কৌশল সম্বন্ধে সচেতন করা যায় একদিকে তারা যেমন শিল্প সচেতন হয়ে উঠতে পারে তেমনি ঘরে বসে তাদের অর্থাগমের পথটিও সহজ হয়ে উঠতে পারে।

নিঃস্পন্দ জীবনের ছবি (Still Life Bainting) ঃ

নিঃস্পন্দ জীবনের ছবি আধুনিক শিল্প শিক্ষার এক অপরিহার্য আঙ্গিক। যে সমস্ত বস্তু গতিহীন, নিশ্চল সেগুলোকে মনোমত করে সাজিয়ে অংকন করাকেই নিঃস্পন্দ জীবনের ছবি বা Still life বলা হয়। যেমন মৃত জন্তু-জানোয়ার, ফল, তরিতরকারী ইত্যাদি এই ধরণের ছবি অংকনের মাধ্যমে। বস্তুর নিখুঁত গড়ন, চরিত্র, ত্বক ও রং এবং বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও বৈপরিত্ব সম্বন্ধে নিখুঁত ধারণা লাভ করা যায়।

প্রাচীন কাল থেকেই প্রাচ্য ও পাশ্চাতে স্থির বস্তুর চিত্র অংকনের একটা বিশেষ-প্রবনতা লক্ষ্য করা যায়। শিল্পীরা বিভিন্ন ধরণের বিষয় বস্তুর মধ্যে নানা ধরণের স্থির বস্তু ব্যবহার করে আসছেন। ষোড়শ শতাব্দীর পরে স্থির বস্তুগুলিকে আলাদা ভাবে সাজিয়ে অংকন করার প্রবণতা শিল্পীদের মধ্যে বৃদ্ধি পায়। স্থির বস্তুর চিত্র অংকন করতে হলে একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে অংকন করতে হয় এবং স্থির বস্তুগুলিকে এমন ভাবে সাজাতে হয় যাতে সমস্ত বস্তুগুলি একমুখী না হয়ে একঘেয়ে বা গতিহীন না মনে হয়। Still life শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন মিলহেবন নামক একজন ওলন্দাজ শিল্পী।

১৯ শতকের ফরাসী শিল্পীরা স্থির বস্তু নিয়ে নানা চিন্তাভাবনা করেছেন পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন অনেক। উত্তর ইমপ্রেসানিষ্ট যুগের দ্বিতীয় দিকপাল ভিনসেণ্ট ভ্যানগঘ-এর 'সূর্যমূখী ফুল', একজোড়া বুটজুতো, প্রথম দিকপাল পল সেজানের আপেলের ছবি, টেবিলের ঢাকনা, প্লেট ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। পিকাসো এবং ব্রাক অজস্র Still life এর ছবি এঁকেছেন। এই ধরনের ছবিতে বস্তুর রূপ, আলোছায়া নির্মিত ও ছন্দভঙ্গিমা ইত্যাদি সম্বন্ধে সঠিক বোধ জাগায়। সেই জন্য শিল্পশিক্ষার প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের Still life বা নিঃস্পন্দ জীবনের ছবির উপর বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করা হয়।

ধোঁয়াটে ছবি (Wash Painting) ঃ

ধোঁয়াটে ছবির উৎপত্তি স্থল হোল জাপান। ভারতবর্ষের শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর জাপানী শিল্পীদের কাছে ধোঁয়াটে ছবির করণ কৌশল সম্বন্ধে অবহিত হয়ে ধোঁয়াটে ছবির একটি স্বতন্ত্র রীতি আবিষ্কার করেন। যাকে বলা যায় অবনীন্দ্রনাথের নিজস্ব অনুসৃত পদ্ধতি। যে কোনও কাগজের উপর ওয়াশ ছবি করা যায় না। কেণ্ট পেপার, পুনা হ্যাণ্ড মেড, এবং হোয়াট ম্যান কাগজ, এ কাজের জন্য সব থেকে উপযুক্ত।

জাপানীরা সমস্ত ছবি হয়ে যাবার পর, ছবিতে একটা বিশেষ মুড আনার জন্য সমস্ত ছবিতে একটা বিশেষ রংএর ওয়াশ দিতেন। শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ

ছবিতে রং ব্যবহারের প্রাথমিক পর্যায়ে থেকেই সমস্ত কাগজটি জলে ভিজিয়ে নিতেন। আবার জল শুকিয়ে যাওয়ার সঙ্গেসঙ্গেই আবার রং ব্যবহার করতেন। এইভাবে জলে চুবানো এবং রং লাগানো বেশ কয়েকবার চলার পর আস্তে আস্তে সমস্ত ছবিটির সমস্ত অংশ স্পষ্ট হয়ে উঠত এবং ধীরে ধীরে একটি নির্মল ধৌত, কুয়াশাচ্ছন্ন ভাব ফুটে উঠতো। এই ধরণের ছবিতে শুরু থেকেই ফিনিসিং এর কাজ করতে হত।

রং ব্যবহারের জ্ঞাতব্য বিষয় হোল রং-এর বাক্সের মধ্যে স্বচ্ছ রং পৃথক ভাবে রাখতে হয়। এই রংগুলিতে জলের পরিমাণ বেশী দিয়ে রঙিন কাঁচের পর্দার মত ব্যবহার করা হয়। ওয়াশের কাজে ব্যবহার যোগ্য স্বচ্ছ রং গুলি হল প্রুনিয়াম ব্লু, ইনডিগো, কারমাইন, ক্রিমসন, বার্ণ্টসায়না, র-সায়না মভ, ক্রীমইয়োলো ইত্যাদি। আর অসচ্ছ রংগুলি হোল ইয়োলো ওকার, ইণ্ডিয়ান রেড, লাইট রেড, টেরাভার্ট গ্রীণ, ক্রোম গ্রীন, রআম্বার প্রভৃতি। এই ধরনের অসচ্ছ রং ওয়াশের কাজে ব্যবহৃত হয় না।

টেম্পারা ছবি (Tempera Painting)

চিত্র শিল্পের ইতিহাসে টেম্পারা অত্যন্ত প্রাচীন পদ্ধতি। টেম্পারা পদ্ধতি থেকেই তেল রংএর উৎপত্তি। আমাদের দেশের অজন্তা, রাজপুত, মোগল প্রভৃতি চিত্র টেম্পারা পদ্ধতিতেই করা হয়েছে। তেল রং আবিষ্কারের বহু পূর্বে ইউরোপের শিল্পীরা টেম্পারা পদ্ধতিতে অজস্র ছবি এঁকেছেন। যে কোনও পটের উপর এই পদ্ধতিতে ছবি করা যায়, তা বস্ত্রপট, পত্রপট বা দেওয়াল পট যাই হোক না কেন। তবে এ পদ্ধতিতে চিত্রাংকনের জন্য নেপালী কাগজ, খুব মসৃন কাপড়, প্রভৃতি সব থেকে উপযুক্ত। এক্ষেত্রে ছবির মাপ অনুযায়ী একটা সাদা বা ব্রাউন কাগজ প্রথমে জলে ভিজিয়ে একটা মসৃন কাঠের পাটাতনের উপর পেস্ট করে দেওয়া হয়। তারপর উপরে তুঁতে মেশানো ময়দার আঠার একটা পাতলা প্রলেপ পরিতলে দিতে হয়। পরিতলের উপর মসৃণ কাপড় বা নেপালী কাগজটি এমন ভাবে সাঁটতে হয় যাতে ভেতরে বাতাস না থেকে যায়। এরপর ছবির পট এবং কাঠের পাটার উপর আড়াআড়ি করে ব্রাউন কাগজ বা সাদা কাগজের পট্টী পরিতলের চারদিকে পেষ্ট করে দিতে হয় যাতে শুকিয়ে যাওয়ার পর ছবির কোনও অংশ উঠে না আসে। এটাকে বলা হয় Mounting, পরে জিংক অক্সসাইড বা Earth white এর সঙ্গে পরিমান মত শিরিষ, বা গঁদের আঠা অথবা ফেবিকলের আঠা মিশিয়ে জমির (ground) উপর দু'একবার প্রলেপ দিয়ে শুকিয়ে নিতে হয়। সামান্য ভিজে থাকা অবস্থায় জমির উপর ট্রেসিং কাগজ বসিয়ে পরিত্যক্ত বিজলি বাতির বাল্ব দিয়ে ঘসে নিলেই টেম্পারার উপযুক্ত জমি তৈরী হয়ে যায়।

টেম্পারা কথার অর্থ হোল টেম্পার দেওয়া বা মজবুত করা। অস্বচ্ছ গুঁড়ো রং এর সঙ্গে ডিমের কুসুমও নিরপেক্ষ সাদা রং মিশিয়ে ভারী পর্দায় ছবিতে ব্যবহার করাকে বলা হয় Egg tempera। অজন্তা চিত্রে রং এইভাবে ব্যবহৃত হয়েছে বলে অনুমিত হয়। ছবির স্থায়ীত্ব বৃদ্ধির জন্য ডিমের কুসুমের সাথে পরিমাণ মত Clobe Oil এবং বরিক পাউডার মেশানো হয়ে থাকে। অন্যত্র ডিমের কুসুম ছাড়াও পরিমান মত শিরিষ আঠা মিশিয়ে নিলেই টেম্পারার কাজ করা যায়। Egg tempera তে একটা সুন্দর চক্‌চকে ভাব পরিলক্ষিত হয়।

রঙিন কাগজের ছবি (Coloured Paper Design)

জন্ম সূত্রে আমরা প্রত্যেকেই বর্ণময় প্রকৃতির সঙ্গে পরিচিত। পৃথিবীতে এমন কোনও বস্তু নেই যার নিজস্ব কোনও রং নেই। রং ও রূপ একে অন্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে যুক্ত। রেখা রূপকে প্রাণবন্ত করে তোলে, ছবিতে গতিশীল ছন্দের সৃষ্টি করে আর রং রূপকে বাস্তব সম্মত করে তোলে।

যে কোনও সুস্থ স্বাভাবিক মানুষেরই বর্ণ সম্বন্ধে একটা বোধ থাকে। বর্ণ মানুষের আবেগের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। লাল বর্ণ ভীতির উদ্রেককারী, ক্রোধকে প্রতীকায়িত করে। নীল আমাদের মনকে শান্তি দেয়, অনেক গভীরতায় পৌঁছে দেয়। হলুদ আনন্দকে প্রতীকায়িত করে। মানুষ কেবলমাত্র একটা বর্ণের পরিপ্রেক্ষিতে কোনও বস্তুকে দেখতে চায় না। অনেকগুলো বর্ণের পরিপ্রেক্ষিতে কোনও বস্তুকে দেখতে চায়। কারণ অনেকগুলো বর্ণের বোধ শক্তি অনেক বেশী সৌন্দর্য বর্ধক।

বর্ণ আলোক রশ্মির পরিপ্রেক্ষিতে বস্তুর উপর যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে তা আমাদের চোখে এসে পৌঁছালে আমরা বর্ণের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যটি অনুভব করতে পারি। অপর পক্ষে বর্ণ মানুষের মনের বিভিন্ন অবস্থাকে প্রকাশ পটু করে তুলতে পারে। যেমন সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, রাগ-অনুরাগ প্রভৃতি।

বয়স্কদের মত শিশুরাও বর্ণের প্রতি একটা স্বাধীন ধারণা ও সুতীব্র আকর্ষণ অনুভব করে। যদি একটি বিশেষ বয়সের শিশুদের একসাথে বসিয়ে ছবি আঁকতে দেওয়া হয়। তাহলে দেখা যাবে তারা আগ্নেয়গিরির রং দিয়েছে লাল, আকাশের রং দিয়েছে নীল, গাছের রং দিয়েছে সবুজ, যদিও আগ্নেয়গিরি কালো, আকাশ ধূসর এবং গাছের রং বাদামী। এধরনের রং ব্যবহার অনেকটা প্রতীক ধর্মী।

শিশুদের রং এর প্রতি এই সুতীব্র আকর্ষণের চাহিদা মেটানোর জন্য শিল্প শিক্ষার ক্ষেত্রে রঙিন ছবি একটি বিশেষ আঙ্গিক। কিন্তু রং তুলি ব্যয়

সাপেক্ষ, সব পরিবেশে পাওয়া যায় না। তাছাড়া করণ কৌশলগত দক্ষতার ও প্রয়োজন হয়। তাই রং তুলির পরিবর্ত্তে রঙিন কাগজের ছবিকেই শিল্পে বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। এতে শিশুদের রঙিন ছবির চাহিদা যেমন মিটবে তেমনি রং সম্বন্ধে যে স্বাধীন বোধ থাকে তা পূর্ণতা পাবে।

কাপড়ের উপর বাটিকের কাজ (Dona Batik Work)

বাটিকের উৎপত্তিস্থল হচ্ছে জাভা। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুকে সঙ্গে নিয়ে যখন জাভা সফরে গিয়েছিলেন তখন জাভা শিল্পীদের বাটিকের কাজ দেখে তিনি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। নন্দলাল বসুকে জাভা শিল্পীদের কাছ থেকে বাটিকের করণ কৌশল আয়ত্ব করিয়ে শান্তিনিকেতন কলাভবনে প্রথম চারুকারু শিল্পে বাটিককে অন্তর্ভূক্ত করান। তখন থেকেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে বাটিক শেখানোর প্রচলন হতে থাকে। এক সময় বাটিকের শাড়ী এত বেশী জনপ্রিয়তা লাভ করে যে, মেয়েরা বিয়ের সময় বেনারসীর পরিবর্তে বাটিকের শাড়ী ব্যবহার করতেন বলে জানা যায়।

কাপড় নির্বাচন

যে কোনও মিহি সুতীর কাপড়, সিল্ক, মুগা প্রভৃতি কাপড়ের উপর বাটিক বেশী খোলে। তবে বাটিক করার পূর্বে মাড় থাকলে তা তুলে ফেলতে হয় নয়তো বাটিকের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায় না। বাটিক পদ্ধতিতে শাড়ি ছাড়াও ব্লাউজের কাপড়, বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড়, দরজা জানালার পর্দা, লুঙ্গী, নেক-টাই, সার্টের কাপড় প্রভৃতি ছাপানো যায় এবং বৈচিত্র্য আনা যায়।

উপকরণ

কাপড় (পরিমাণ মত), প্যারাফিন বা সাদা মোম। মৌমাছির মোম (Bees wax), রজন, হ্যারিকান, ট্রেসিং টেবিল, কাগজ, 6B পেনসিল, ট্রেসিং কাগজ, দস্তানা বা glubes, বিভিন্ন রং তৈরীর পাত্র, প্যারাফিন গরম করার পাত্র, রং বিভিন্ন সল্ট, মনোপল সোপ, কষ্টিক। দুটি বাথটব বিকল্পে বড় গামলা, মগ একটি, একটি ১½" চ্যাপ্টা তুলি (Flat Brush)। সূক্ষ্ম কাজের জন্য ২টো 3 No. ক্যামেল হেয়ার তুলি, মোটা কাজের জন্য ২টো 6 No. ক্যামেল হেয়ার (Camel hair) তুলি, একটি Stove বা হিটার।

রংএর তালিকা

এখানে ১ মিটার কাপড়ে ব্যবহার যোগ্য রংএর তালিকা দেওয়া হোল।

যদি ৫ মিটার কাপড়ের উপর বাটিক করা হয় তাহলে রং, সল্ট, সোপ, কষ্টিক-৫ গুণ বাড়িয়ে নিতে হবে।

১. **Lemon yellow.**

AT—৫¼ গ্রাম,
Scarlet RC Salt—১০ গ্রাম,
Caustic Soda—১½ গ্রাম,
Monopal Soap—১ চামচ।

২. **Golden yellow.**

AT—৫ গ্রাম,
GP Salt—১০ গ্রাম,
Caustic—১½ চামচ,
Monopol Soap—১ চামচ।

৩. **Light orange.**

AT—৫ গ্রাম,
Orange Salt GC—১০ গ্রাম,
Caustic Soda—১½ চামচ,
Monopol Soap—১ চামচ।

৪. **Deep orange.**

আগের সব কিছু রং + MN – ৫·গ্রাম,
Orange Salt GC—১০ গ্রাম,
Caustic Soda—১½ চামচ,
Monopol Soap—১ চামচ।

৫. **Deep Red.**

MN—৫ গ্রাম,
Scarlet Rc Salt—১০ গ্রাম,
Caustic Soda—১½ চামচ,
Monopol Soap—২ চামচ।

৬. **Blood Red.**

AS—২½ গ্রাম,
Scarlet Rc Salt—১০ গ্রাম,

Caustic Soda—১½ চামচ,
Monopol Soap—১ চামচ।

৭. **Maroon.**

MN—৫ গ্রাম,
GP Salt—১০ গ্রাম,
Caustic Soda—১½ চামচ,
Monopol Soap—১ চামচ।

৮. **Magenta** (বেগুনী)

MN—৫ গ্রাম,
Scarlet Rc—১০ গ্রাম,
Blue Salt B—৫ গ্রাম,
Caustic Soda—২ চামচ,
Monopol Soap—১ চামচ।

৯. **Deep Violet.**

MN—৫ গ্রাম
AS—২½ গ্রাম,
GP Salt—১০ গ্রাম,
Blue Salt—৫ গ্রাম,
Caustic—২ চামচ,
Monopol Soap—১ চামচ।

১০. **Blue.**

MN—৫ গ্রাম,
Blue Salt B—১০ গ্রাম,
Caustic Soda—১½ চামচ,
Monopol Soap—১ চামচ।

১১. **Black.**

BN বা MN—৫ গ্রাম,
Black Salt K—১০ গ্রাম,
Caustic Soda—১½ চামচ,
Monopol Soap—১ চামচ।

১২. **Brown**.

AT—৫ গ্রাম,
Blue Salt B—১০ গ্রাম,
Caustic Soda—১½ চামচ,
Monopol Soap—১ চামচ।

পদ্ধতি

প্রথমে Design বা নক্সা একটি কাগজে এঁকে নিলে সুবিধা হয়। যদি Tracing Table থাকে তাহলে Trace করার কাজ সহজেই হয়ে যাবে। তা না হলে, একটি টেবিল উল্টো করে নিয়ে চারটি পায়ার উপর একটি কাঁচ বসিয়ে নিতে হবে। নীচে একটি পাওয়ার যুক্ত বাল্ব জ্বেলে দিলে নীচের আলো কাঁচে প্রতিফলিত হবে। কাঁচের উপরে কাগজে আঁকা Designটি রেখে তার উপর কাপড় টান টান করে বিছিয়ে খুব সহজে Tracing করা যাবে।

এরপর পাঁচ ভাগ মৌমাছির মোম ও চার ভাগ রজন একটা টিনের ছোট গ্লাসে দিয়ে হ্যারিকেনের মাথার চাকতিটি খুলে তার উপর বসিয়ে মৃদু উত্তাপে গরম করতে হবে। মোম রজন যখন সম্পূর্ণ গলে যাবে তখন সরু তুলি ডুবিয়ে দেখে নিতে হবে কাজের উপযোগী হয়েছে কিনা। সরষের তেলের মত মনে হলেই কাজের উপযোগী হয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে।

এরপর Design-এর যে অংশগুলি সাদা থাকবে সেই অংশগুলিতে রজন মিশ্রিত গরম মোম তুলির সাহায্যে দু'পিঠে লাগিয়ে দিতে হবে। একটু সাবধানে কাজ করতে হবে যাতে গরম মোম হাতে বা পায়ে কোথাও পড়ে না যায়। যদি জমিতে সাদার উপর Cracks আনতে চাই তাহলে প্যারাফিন গরম করে চ্যাপ্টা তুলি দিয়ে দু'পিঠে আড়াআড়ি ভাবে লাগাতে হবে। কিন্তু কাজটি করতে হবে খুব সাবধানে।

ধরা গেল তিনটি রং ব্যবহার করা হবে—Golden Yellow, Brown আর Black। বাটিকের কাজে সবসময় হাল্কা থেকে গাঢ় রংএ যেতে হবে। সুতরাং এখানে 1st Colour হোল Golden yellow, 2nd Colour হোল Brown আর Last Colour হোল Black।

রং প্রস্তুত প্রণালী

প্রথমে স্টোভে বা হিটারে সামান্য জল গরম করে নিতে হবে। জল একটু উষ্ণ হলে Monopol Soapটি ফেলে দিতে হবে। Monopol Soap সম্পূর্ণ গলে যাওয়ার পর তাতে Colourটি ফেলে দিতে হবে। একটু পরেই Caustic

দিয়ে নামিয়ে নিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে না নামালে দুধ উৎলে ওঠার মত সমস্ত রংটি উৎলে পড়ে যেতে পারে।

এরপর দুটি বড় বড় পাত্রে বাটিকের কাপড়টি ভেজার উপযুক্ত জল দিতে হবে। একটি পাত্রে Saltটি দিয়ে জলের সঙ্গে ভালভাবে মেশাতে হবে। অপর পাত্রে তৈরী রংটি জলের সঙ্গে ভালভাবে মেশাতে হবে। এরপর মোম লাগানো কাপড়টি প্রথমে Colour এর পাত্রে তারপর Salt এর পাত্রে ডোবালেই কাপড়ের যে অংশগুলি ফাঁকা ছিল অর্থাৎ মোম লাগানো ছিল না, যে জায়গাগুলিতে রং ধরে যাবে। 1st Colour শুকিয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরে Design-এ বা কাপড়ের যে অংশগুলিতে 1st Colour রাখতে চাই, সেগুলো আবার রজন মিশ্রিত মৌমাছির মোম দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। এবং জমিতে সাদা না রেখে 1st Colour এর উপর Cracks চাই তাহলে সমস্ত জমিটিতে প্যারাফিন গরম করে চ্যাপটা তুলির সাহায্যে দুপিঠে আড়াআড়ি-ভাবে লাগাতে হবে। শুকিয়ে গেলে আঙ্গুল দিয়ে টিপে টিপে ভেঙ্গে দিতে হবে যাতে ভাল Cracks আসে। 1st Colour এর কাজ সমাপ্ত হলে অনুরূপ ভাবে 2nd এবং Last Colour করে নিতে হবে। সব সময় মনে রাখতে হবে যে প্রতিটি Colour করার সময় glubes বা দস্তানা ব্যবহার করতে হবে এবং রং এর গামলা খুব ভালভাবে ধুয়ে ফেলতে হবে।

মোম তোলার উপায়

রং এর কাজ হয়ে যাওয়ার পর কাপড়টি কিছুক্ষণ শুকিয়ে, জল ও সার্ফ মেশানো একটি পাত্রে দিয়ে উনুনে বা Stove এ বসিয়ে দিতে হবে। জলটি উষ্ণ হলেই দেখা যাবে মোম আস্তে আস্তে উঠে আসছে। পরে ঠাণ্ডা জলে ধুয়ে নিলেই সম্পূর্ণ কাপড় মোম মুক্ত হবে এবং Design ও Cracks স্পষ্ট-ভাবে বোঝা যাবে।

বাটিকের নানা রকম পদ্ধতি আছে—যেলন প্যাচ (patch) ওয়ার্ক, বাধ্‌নী ইত্যাদি অযথা। কলেবর বৃদ্ধি যাতে না হয় সেইজন্য এক্ষেত্রে সেগুলি আলোচনা করা গেল না। শুধু কাপড় বা সিল্কের বাটিক সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা নেওয়া হল। সম্ভব হলে অন্যত্র খুঁটিনাটি আলোচনার ইচ্ছা রইল।

শিক্ষাক্ষেত্রে শিল্পবিদ্যার প্রয়োগ

চারু ও কারুশিল্প এমন একটা বিষয় যা বিদ্যালয়ের প্রতিটি পাঠ্য বিষয়ের সঙ্গে একটি ঘনিষ্ট যোগসূত্রে আবদ্ধ। বিদ্যালয়ে যে কোনও পাঠ্য বিষয়, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, ইংরেজী, বাংলা, অংক শেখানোর

সময় কখনও কখনও শিক্ষার্থীদের কাছে দুর্বোধ্য ঠেকে, হাজার বক্তৃতা করেও বিষয়টি শিক্ষার্থীদের কাছে প্রাঞ্জল করে তোলা যায় না, কিন্তু যখনই শব্দের গন্ডী পেরিয়ে ছবি, চার্ট বা মডেলের আশ্রয় নেওয়া হয় তখনই সেই বিমূর্ত বিষয় শিক্ষার্থীদের কাছে মূর্ত হয়ে ওঠে, শিক্ষার্থীরা খুব সহজেই বিষয়টির গভীরে প্রবেশ করতে পারে। শিক্ষাদান এবং শিক্ষা-গ্রহণ প্রক্রিয়া সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ওঠে। বিদ্যালয়ে শিক্ষক পড়ান, শিক্ষার্থীরা কানে শুনে চলে যায়। এখানে শিক্ষার্থীর একটি ইন্দ্রিয় কাজ করে। শোনার সঙ্গে সঙ্গে যদি দেখার অভ্যাস তৈরী করা যায়, তাহলে দেখা শোনার যুগপৎ ক্রিয়াকলাপে বিষয়টি শিক্ষার্থীদের কাছে সহজে ধরা দেয়। সুতরাং শ্রেণীকক্ষে পড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে দেখার আভ্যাস তৈরী করার জন্য যে সমস্ত উপকরণ ব্যবহৃত হয়ে থাকে, সেগুলোকেই শিক্ষোপকরণ প্রদীপণ বা Teaching aids বলা হয়। প্রদীপণ দুই প্রকারের (১) শ্রুতিনির্ভর প্রদীপণ (Audio), (২) দৃষ্টিনির্ভর প্রদীপণ (Visual)।

দৃষ্টিনির্ভর প্রদীপনের মধ্যে পড়ে কালোপাটা (Block Board), ছবি, চার্ট বা মডেল। শ্রুতিনির্ভর প্রদীপণের মধ্যে পড়ে রেডিও, টেপ-রেকর্ডার, রেকর্ড প্লেয়ার, গ্রামোফোন।

আর প্রোজেক্টর, টেলিভিশনগুলি একদিকে শ্রুতি নির্ভর অন্যদিকে দৃষ্টি নির্ভর প্রদীপন হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে এগুলি ব্যয় সাপেক্ষ, সব প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ক্রয় করে ব্যবহার করা সম্ভব নয়। চারু এবং কারু শিল্পশিক্ষার মাধ্যমে দৃষ্টি নির্ভর প্রদীপণগুলি সহজেই তৈরী করা যায়। কিন্তু শ্রুতি নির্ভর প্রদীপণ সবার পক্ষে তৈরী করা সম্ভব নয়। এর জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয়। যাঁরা প্রকৌশলের ছাত্র (Engineering) তাঁরা এই ধরনের প্রদীপন সহজেই তৈরী করতে পারেন।

দৃষ্টিনির্ভর প্রদীপণের মধ্যে সব থেকে সহজলভ্য ও সবচেয়ে কাজের বস্তু হোল Block Board বা কালোপাটা। পাঠদান ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শিক্ষক বা শিক্ষিকা যদি যথাযথ ভাবে কালোপাটা ব্যবহার করতে পারেন তাহলে পাঠদান ক্রিয়া সহজ ও ত্রুটিহীন হয়। শিক্ষার্থীরা বিষয়টি সহজেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। অবশ্য কালোপাটা সাধারণতঃ যে ভাবে ব্যবহৃত হয় সেভাবে কালোপাটা ব্যবহার যুক্তিযুক্ত নয়। কালোপাটা ব্যবহারের একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে। যেমন :—

(ক) কালোপাটা ব্যবহারের পূর্বে কালোপাটার ফ্রেম বা বর্ডার থেকে ১" বা ১½" পরিসর সবসময় ছেড়ে দিয়ে কালোপাটায় লেখা বা আঁকার কাজ করতে হয়।

(খ) কালোপাটার চতুর্দিকে বেষ্টিত ফ্রেমের উপর কিছু লেখা যুক্তি যুক্ত নয়।

(গ) প্রতিটি বাক্য যেন একটি সরল রেখার উপর থাকে।

(ঘ) বাক্যের প্রতিটি অক্ষর যেন সমান মাপের এবং স্পষ্ট হয়। যাতে প্রথম থেকে শেষ বেঞ্চ পর্যন্ত প্রতিটি শিক্ষার্থী একনজরে দেখতে পায়।

(ঙ) লেখার সময় যেন স্বাভাবিক গতি বা Speed বজায় থাকে। তা না হলে অযথা খস্‌খসে আওয়াজ হয় এবং ক্ষণে ক্ষণে খড়িমাটি ভাঙ্গার সম্ভাবনা থাকে।

(চ) লেখা মোছার সময় সর্বদা duster (ঝাড়ন) ব্যবহার যোগ্য। মোছার কাজে কখনই হাত ব্যবহার করা উচিত নয়।

(ছ) Duster সমান্তরাল ভাবে ব্যবহার না করে লম্বালম্বি ভাবে ব্যবহার যোগ্য। নচেৎ খড়িমাটির গুঁড়ো বাতাসে ছড়িয়ে ক্লাসঘর নোংরা হতে পারে।

এই কারণে শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে বছরের শেষের দিকে দু/একটি বিশেষ ক্লাশের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। এ ক্লাসটি হবে Use of Black board and Free hand Drawing and preparation of Teaching aids। এই ক্লাশটির ভার শিল্প শিক্ষকের উপর থাকা উচিত। তিনি এই ক্লাসে কালোপাটার ব্যবহার এবং তার প্রয়োগ কৌশল সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের ধারণা দেবেন। প্রয়োজন বোধে নির্দ্ধারিত সময় সূচীর মধ্যে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে Black Board ব্যবহারের জন্য আহ্বান জানাবেন এবং ভুল ত্রুটি সংশোধন করে দেবেন। Black Board-এ লেখার কাজের সঙ্গে সঙ্গে কি কৌশলে খুব সহজেই ড্রয়িং করা যায়, তা দেখিয়ে দেবেন। কারণ কালোপাটা বা Black Board ই হোল শিক্ষকের মনের মুকুর অর্থাৎ Mirror of the Teacher's mind।

একথা ঠিকই যে বড় শিল্পী হতে হলে Drawing এর উপরে ভাল দখল থাকা চাই। কিন্তু প্রদীপন তৈরীর জন্য নিখুঁত drawing জ্ঞান না থাকলেও চলবে। কারণ পড়ানোর সময় যদি কোনও উন্নত মানের ছবি বা মডেল শ্রেণীকক্ষে রাখা হয় তাহলে শিক্ষার্থীদের ঐ দিকেই দৃষ্টি থাকবে পড়াশুনার মনোযোগ একেবারেই থাকবে না।

বিদ্যালয়ে ইংরেজী, বাংলা, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, অংক প্রভৃতি বিষয় পড়ানো হয়ে থাকে। এই বিষয়গুলি পড়ানোর সময় ছবি, চার্ট বা মডেলের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। বিষয় শিক্ষক এবং শিল্প শিক্ষকের যুগ্ম প্রচেষ্টায় শিক্ষার্থীরা এগুলি সহজেই তৈরী করে ব্যবহার করতে পারে। যদি কোনও শিক্ষক অংকন বিদ্যায় কিছুটা পারদর্শী হন, তাহলে তিনি বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী হবেন।

পূর্ব্বে বিদ্যালয়ে বিষয়ের সংখ্যা ছিল সীমিত, বর্ত্তমানে বিষয়ের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বিশেষ বিশেষ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ শিক্ষকও আছেন। এক্ষেত্রে পুরোনো দিনের মত একজন শিক্ষককে নিজের বিষয় ছাড়া অন্য বিষয় পড়াতেও হয় না। সেক্ষেত্রে প্রতিটি শিক্ষক যদি নিজ নিজ বিষয়ে চিন্তাভাবনা করে প্রদীপনগুলি তৈরী করে ব্যবহার করেন তাহলে শিক্ষণ ক্রিয়া স্বতঃস্ফূর্ত ও প্রাঞ্জল হয়।

ইতিহাসের জন্য রাজারাজড়াদের প্রতিকৃতি, মানচিত্র, বিভিন্ন ধরনের শিল্প, ভাস্কর্য, স্থাপত্যের নিদর্শনের জন্য ছবি, মডেল, রিলিফমডেল প্রভৃতি ব্যবহার করা যেতে পারে। বাংলা, ইংরেজীর কবিতা, প্রবন্ধের জন্য ছবি বা মডেল ব্যবহার করা যেতে পারে। ব্যাকরণ পড়ানোর সময় লেখা এবং ছবি মিলিয়ে চার্ট ব্যবহার করাই যুক্তিযুক্ত। ভূগোলের ব-দ্বীপ, সমভূমি, ম্যাপ প্রভৃতির জন্য রিলিফ মডেল ব্যবহার করলে ভাল হয়। খনিজ বা বনজ সম্পদের জন্য ছবি বা রিলিফ ম্যাপ ব্যবহার করা যেতে পারে। জীবন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মশা, মাছি বা ব্যাঙের জন্ম কাহিনী বোঝাতে ছবি ব্যবহার করাই যুক্তিযুক্ত। অংকের ক্ষেত্রে সব সময় প্রদীপন ব্যবহার করা যায় না। এক্ষেত্রে কালোপাটাই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রদীপন। তবুও সময় দূরত্বের অংকে বা ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কোনও কোনও ক্ষেত্রে ছবি বা চার্টের ব্যবহার হতে পারে, প্লাইউডের উপর জ্যামিতির মডেল তৈরী করা যায়। বীজগণিতের কিউবিক ফর্মুলা বোঝাতে কাঠের টুকরো ব্যবহার করা যেতে পারে।

পাঠ টীকা (Lesson Plan) প্রস্তুতকরণ প্রণালী

পূর্ব্ব পরিকল্পনা ব্যাতিত কোনও কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় না। তা সে হাতের কাজই হোক বা পড়া শোনার কাজই হোক। এখন প্রশ্ন হোল পরিকল্পনা বা Plan বলতে কি বোঝায়? এর উত্তরে বলা যায় Systematic way of doing some thing i. e planing. অর্থাৎ একটা নিয়ম বা শৃংখলার মধ্যে দিয়ে কাজ করাকেই পরিকল্পনা বা Plan বলে। শিল্পীরা যখন ছবি আঁকেন, বা মূর্ত্তি তৈরী করেন, তখন কি ভাবে ধাপে ধাপে অগ্রসর হবেন তার জন্য একটা Sketch বা খসড়া পূর্ব্বেই প্রস্তুত করে থাকেন। তারপর হয়তো কিছু কিছু অংশ প্রয়োজনের তাগিদে অদলবদল করে কাজটি সম্পন্ন করেন। ঠিক সেই ভাবেই উপন্যাসিক তাঁর সৃষ্ট উপন্যাসে একটা ধারণার উপর ভিত্তি করে অসংখ্য চরিত্রের সৃষ্টি করেন এবং দু একটি চরিত্রের উপর অপেক্ষাকৃত বেশী গুরুত্ব অর্পণ করে একটা পরিণতিতে এসে পৌঁছান।

আমরা যখন বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের কিছু শেখাই বা পড়াই তখন

প্রথমেই আমাদের মনে কয়েকটি প্রশ্নের উদয় হয়। যেমন—কি শেখাব? এর উত্তর পাওয়া গেল, একটা বিশেষ বিষয়। উত্তর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার প্রশ্নের উদয় হোল, কাদেরকে শেখাব? উত্তর পাওয়া গেল একটা বিশেষ বয়সের শিশুদের। উত্তর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার প্রশ্নের উদয় হল, কেমন করে শেখাব? এই শেষ প্রশ্নের উত্তর হল "একটি সুপরিকল্পিত উপায়ে"। এই সুপরিকল্পিত উপায়টিই হোল plan বা পরিকল্পনা। তাহলে আমরা যারা শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে শেখাতে যাই, তখন যে বিষয় শেখাতে যাই সে বিষয়ের উপর একটি সুপরিকল্পিত খসড়া প্রস্তুত করে নিয়ে যেতে হয়। তা না হলে শিক্ষণ পদ্ধতি সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন হয় না। এই খসড়াটিই হোল Lesson plan বা পাঠটীকা, বা পাঠপরিলেখ।

এখন মনে রাখা উচিত যে, যে বয়সের শিক্ষার্থীদের শেখানো হবে, সেই বয়সের শিক্ষার্থীদের মানসিকতা ও গ্রহণ ক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে পাঠটীকা বা Lesson plan তৈরী করতে হবে। তা না হলে সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

চারু ও কারু শিল্পের একটি পাঠ টীকার খসড়া নিম্নে উল্লিখিত হোল:—

বিদ্যালয়ের নাম :— শ্রেনী : শাখা :— ছাত্র / ছাত্রীদের গড় বয়স :— ছাত্র / ছাত্রীর সংখ্যা :— শিক্ষক / শিক্ষিকার নাম :— তারিখ :—	বিষয় :— বিশেষ বিষয় :— অদ্যকার শিক্ষনীয় বিষয় :—

উদ্দেশ্য	প্রত্যক্ষ :—যে আঙ্গিকে কাজ শেখানো হচ্ছে সেই আঙ্গিকের প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য কি? পরোক্ষ :—যে আঙ্গিকে কাজ শেখানো হচ্ছে সেই আঙ্গিকের পরোক্ষ উদ্দেশ্য।
লক্ষ্য	যে আঙ্গিকে কাজ শেখানো হচ্ছে সেই আঙ্গিকে কাজ শেখানো লক্ষ্য।
উপকরণ	যে আঙ্গিকে কাজ শেখানো হচ্ছে সেই আঙ্গিকে আঙ্গিক মুখী করে তুলতে হলে যে যে উপকরণগুলির প্রয়োজন হয়। তার একটি তালিকা।

আয়োজন (Preparation)	যে আঙ্গিকে কাজ শেখানো হচ্ছে সেই আঙ্গিকে আঙ্গিক-মুখী করে তোলার জন্য শিক্ষার্থীদের পূর্ব্বজ্ঞানের ভিত্তিতে এখানে তিনটি প্রশ্নের অবতারনা করা হবে। প্রশ্ন তিনটির বেশী বাঞ্ছনীয় নয়। ১ম প্রশ্নের উত্তর থেকে ২য় প্রশ্নটি সহজেই বেরিয়ে আসবে, ২য় প্রশ্নের উত্তর থেকে ৩য় প্রশ্নটি সহজেই বেরিয়ে আসবে। প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ বা না হবে না। এই পর্ব্বটিকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য প্রথমে একটি কবিতা দিয়ে তার থেকে প্রশ্ন করা যেতে পারে।
পাঠঘোষণা (Announcement)	যে বিষয়ে কাজ শেখানো হবে, সেই বিষয় ঘোষণা। তবে মনে রাখতে হবে বিষয়ের উপযোগিতা যেন অবশ্যই উল্লেখ করা হয়।
উপস্থাপনা (Presentation)	আলোচনার সুবিধার জন্য প্রয়োজন বোধে এই পর্ব্বটিকে তিনটি শীর্ষে ভাগ করে নেওয়া হবে। যেমন 'ক' শীর্ষ—বিষয়বস্তু, 'খ' শীর্ষ—শিক্ষক/শিক্ষিকার কাজ, 'গ' শীর্ষ—ছাত্র/ছাত্রীদের কাজ।

'ক' শীর্ষ বিষয় বস্তু	'খ' শীর্ষ শিক্ষক/শিক্ষিকার কাজ	'গ' শীর্ষ ছাত্র/ছাত্রীদের কাজ
যে বিষয় শেখানো হবে সে বিষয় সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত সার।	শিক্ষক/শিক্ষিকা কি ভাবে পদ্ধতি অনুযায়ী শেখাবেন সেগুলি ক্রমান্বয়ে উল্লেখ করতে হবে।	শিক্ষক/শিক্ষিকার কথামত ছাত্র/ছাত্রীর কিভাবে অংশ গ্রহন করছে তা ক্রমান্বয়ে উল্লেখ করতে হবে।

অভিযোজন (Application)	শ্রেণী কক্ষে নির্দ্ধারিত সময়সূচী অনুযায়ী যা শেখানো হোল শিক্ষার্থীরা তার কতটুকু আয়ত্ব করতে পেরেছে তা অভীক্ষা বা যাচাই করার জন্য এখানে তিনটি বা চারটি প্রশ্নের অবতারনা করতে হবে। প্রশ্নগুলি যেন প্রতিটির সঙ্গে প্রতিটির সম্পর্ক থাকে। খাপছাড়া না হয়।
শ্রেণীপ্রদর্শন (Class Exhibition)	সমস্ত শিক্ষার্থীদের শিল্পকাজ সম্পন্ন হলে শিক্ষক/শিক্ষিকা, কাজগুলি একত্রিত করে শ্রেণীকক্ষে তাৎক্ষনিক একটি অস্থায়ী প্রদর্শনীর আয়োজন করবেন এবং প্রতিটি কাজের

	বোধ দু'টি আলোচনা করে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে উৎসাহিত করবেন।
গৃহকাজ (Home task)	শিক্ষক/শিক্ষিকা পরের দিন বাড়ীতে অনুরূপ শিল্পকর্ম করে নিয়ে আসতে নির্দেশ দেবেন অথবা অনুশীলন করতে নির্দেশ দেবেন।

কয়েকটি আদর্শ পাঠ টীকার নমুনা

॥ রঙিন কাগজের ছবি ॥

বিদ্যালয়ের নাম :— শ্রেণী—৭ম, শাখা :— ছাত্র/ছাত্রীর গড় বয়স :— শিক্ষক/শিক্ষিকার নাম :— তারিখ—	বিষয় :—চারু ও কারু শিল্প বিশেষ বিষয় :—রঙিন কাগজের ছবি অদ্যকার শিক্ষণীয় বিষয় :—ঐ

উদ্দেশ্য	প্রত্যক্ষ :—শিল্পশিক্ষার অমল ধারায় শিক্ষার্থীর মানস ভূমি সিঞ্চিত করা। শিল্পজগতের বৃহত্তর আঙ্গিনায় পদার্পণের পথ প্রস্তুত করা এবং শিল্পকর্মে উদ্বুদ্ধ করা। পরোক্ষ :—রুচী, শালীনতা ও সৌন্দর্যবোধ জাগ্রত করা। পুস্তক পাঠের একঘেয়েমি ও ক্লান্তিবোধ থেকে সাময়িক ভাবে মুক্তি দেওয়া ও সুষ্ঠু অবসর বিনোদনকে সম্ভব করে তোলা।
লক্ষ্য	সামান্য সৃষ্টির অসামান্য আনন্দ লাভে সহায়তা করা।
উপকরণ	এই আঙ্গিকে কাজের জন্য যে উপকরণগুলির প্রয়োজন, সে গুলি হোল, দু তিন রকমের রঙিন কাগজ (মার্বেল) কাঁচি, তুঁতে মেশানো ময়দার আটা, সাদা কার্টিজ কাগজ, ট্রেসিং কাগজ, কার্বন কাগজ, কয়েকটি আদর্শ প্রদীপন, এবং শ্রেণীপযোগী অন্যান্য উপকরণাদি, যেমন—রঙিন খড়িমাটি, কালোপাটা, ঝাড়ন ইত্যাদি।
আয়োজন	শ্রেণী কক্ষে অদ্যকার শিক্ষনীয় বিষয়ের উপযুক্ত একটি শৈল্পিক বাতাবরণ সৃষ্টির জন্য শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞানের ভিত্তিতে কয়েকটি প্রশ্নের অবতারণা করা হবে :—

	(১) কোন কোন মাস বসন্ত কাল ? (২) বসন্ত কালে ফোটা কয়েকটি ফুলের নাম বল ? (৩) পলাশ ফুল আর শিমুল ফুলের রং এর মধ্যে পার্থক্য কি ?
পাঠঘোষণা	"এস আজ আমরা বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের দেওয়াল সজ্জার জন্য প্রত্যেকে একটি করে রঙিন কাগজের ছবি তৈরী করার কৌশল আয়ত্ব করি।"—এই ভাবে পাঠ ঘোষনার পর শিক্ষক/শিক্ষিকা উপকরণগুলি শ্রেণী শিক্ষার্থীদের মধ্যে এমন ভাবে বিতরণ করবেন যাতে শ্রেণীশৃংখলা বজায় থাকে।
উপস্থাপনা	আলোচনার সুবিধার্থে শিক্ষক/শিক্ষিকা এই পর্বটিকে স্বতন্ত্র তিনটি শীর্ষে ভাগ করে নিতে পারেন। যেমন—'ক' শীর্ষ, বিষয় বস্তু, 'খ' শীর্ষ শিক্ষক/শিক্ষিকার কাজ। 'গ' শীর্ষ—ছাত্র/ছাত্রীদের কাজ।

বিষয়বস্তু	শিক্ষক/শিক্ষিকার কাজ	ছাত্র/ছাত্রীদের কাজ
৫৯নং পাতায় "রঙিন কাগজের ছবি" অংশটি দ্রষ্টব্য।	(১) প্রথমে শ্রেণীকক্ষে উক্ত বিষয়ের উপর একটি সংক্ষিপ্ত মুখবন্ধ পেশ করবেন।	(১) শিক্ষক/শিক্ষিকার মুখ-বন্ধ মনোযোগ সহকারে শ্রবন করবে। প্রশ্ন থাকলে জেনে নেবে।
	(২) সঙ্গে নিয়ে যাওয়া প্রদীপনগুলি দেখাবেন এবং বিশ্লেষণ করবেন।	(২) প্রদীপণগুলি মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করবে এবং শিক্ষক / শিক্ষিকাকে অনু-ধাবন করবে।
	(৩) প্রত্যেককে নিজ নিজ সাদা কাগজে কল্পনা অনু-যায়ী মনোমত নক্সা অঙ্কন করতে বলবেন এবং নক্সাদি যাতে বড় ব্লকে ভাগ করা হয় যে সম্বন্ধে ধারণা দেবেন।	(৩) বড় বড় ব্লক বলতে কি বোঝায় তা জেনে নেবে এবং কল্পনা অনুযায়ী নিজ নিজ কাগজে নক্সা আঁকবে।
	(৪) বড় বড় ব্লক সম্বন্ধে ধারণা দেওয়ার জন্য কালো-পাটা ব্যবহার করবেন।	(৪) শিক্ষক / শিক্ষিকার নির্দ্দেশ মেনে চলবে।

বিষয়বস্তু	শিক্ষক/শিক্ষিকার কাজ	ছাত্র/ছাত্রীদের কাজ
	(৫) মাত্র ২/৩টি রং-এর কাগজ ব্যবহার করে কাজটি সম্পন্ন করতে বলবেন। এ প্রসঙ্গে ইচ্ছে মত রং ব্যবহার করা যাবে না। সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবহিত করবেন।	(৫) শিক্ষক/শিক্ষিকার কথা মত কাজ করবে।
	(৬) নক্সা কি ভাবে ট্রেসিং কাগজে ট্রেস করতে হয়, দেখিয়ে দেবেন। এবং ট্রেস করার সময় কি ধরনের সাবধানতা অবলম্বন করবেন তা জানিয়ে দেবেন।	(৬) ট্রেস করার কৌশল জেনে নেবে এবং ক্ষেত্র বিশেষে প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বন করবে।
	(৭) ছবিব প্রতিটি ব্লকে রঙিন কাগজ বসানোর জন্য কিভাবে রঙিন কাগজের উল্টো দিকে ট্রেসিং কাগজ উল্টে ট্রেস করতে হবে সে সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের অবহিত করবেন।	(৭) শিক্ষক / শিক্ষিকার নির্দেশ মেনে চলবে।
	(৮) ছবিতে দূরের অংশ আগে, কাছের অংশ পরে কেন কাগজ সাঁটতে হবে সে সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের জানাবেন। প্রয়োজন বোধে কালোপাটা ব্যবহার করে কয়েকটি প্রশ্ন করতে পারেন।	(৮) রঙিন কাগজ সাঁটার পদ্ধতি আয়ত্ব করতে সচেষ্ট হবে এবং শিক্ষক/শিক্ষিকার নির্দেশ মত কাজে অগ্রসর হবে।
	(৯) ছবির সমস্ত ব্লকগুলিতে রঙিন কাগজ বসানো হলে ছবির সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য কিভাবে ছবির খুঁটিনাটি জিনিষগুলি ফুটিয়ে তোলা	(৯) ছবির সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য কিভাবে খুঁটি নাটি কাজ করতে হয় সে সম্বন্ধে শিক্ষক / শিক্ষিকার নির্দেশ মেনে চলবে।

বিষয়বস্তু	শিক্ষক / শিক্ষিকার কাজ	ছাত্র / ছাত্রীদের কাজ
	যায় সে সম্বন্ধে হাতে কলমে নির্দ্দেশ দেবেন।	
	(১০) ময়দার আঠাতে তুঁতে মেশানোর কারণ জানিয়ে দেবেন।	(১০) শিক্ষার্থীরা তুঁতে মেশানোর কারণ জেনে নেবে এবং অন্য আঠা ব্যবহারের অসুবিধা কি সে সম্বন্ধে প্রশ্ন থাকলে জিজ্ঞেস করবে।
	(১১) কাজ চলাকালিন শ্রেণী কক্ষে পক্ষপাতিত্বহীন মনো-ভাব নিয়ে প্রত্যেকের কাজ ঘুরে ঘুরে দেখবেন এবং প্রয়োজন বোধে সাহায্য করবেন।	(১১) শিক্ষক / শিক্ষিকাকে সহযোগিতা করবে।
	(১২) শ্রেণী শৃংখলা বজায় রাখার নির্দ্দেশ দেবেন।	(১২) শ্রেণী শৃংখলা বজায় রেখে কাজটি সম্পন্ন করবে।
অভিযোজন	এতক্ষণ শ্রেণী কক্ষে যা শেখানো হোল শিক্ষার্থীরা তার কতটুকু আয়ত্ব করতে পেরেছে, তা অভীক্ষার জন্য নিম্নরূপ কয়েকটি প্রশ্নের অবতারনা করা হবে। (১) রঙিন কাগজের ছবিতে বড় বড় ব্লক নেওয়ার সুবিধা কি ? (২) ধর একটি ছবিতে সামনে মাঠ, দূরে কয়েকটি ঘরবাড়ী তার পিছনে আকাশ, এখানে ছবির কোন অংশটিতে আগে, কোন্ অংশটিতে পরে রঙিন কাগজ সাঁটবে। (৩) এই ধরনের ছবি দৈনন্দিন জীবনে কি কি ভাবে ব্যবহার করতে পার ?	
শ্রেণী প্রদর্শণী	শ্রেণী কক্ষে সমস্ত শিক্ষার্থীর শিল্পকাজ সমাপ্ত হলে শিক্ষক/শিক্ষিকা নির্দ্ধারিত সময় সূচীর মধ্যে একটি অস্থায়ী প্রদর্শনীর আয়োজন করবেন এবং প্রতিটি কাজের দোষগুণ পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা করে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে কমবেশী উৎসাহিত করবেন।	

গৃহকাজ	শিক্ষক / শিক্ষিকা পরের দিন বাড়ি থেকে অনুরূপ শিল্পকর্ম করে নিয়ে আসতে নির্দেশ দেবেন।

মাটির মডেল

বিদ্যালয়ের নাম— শ্রেণী—অষ্টম, শাখা— ছাত্র / ছাত্রীদের সংখ্যা— ছাত্র / ছাত্রীদের গড় বয়স— শিক্ষক / শিক্ষিকার নাম— তারিখ—	বিষয়—চারু ও কারু শিল্প। বিশেষ বিষয়—"মাটির কাজ"। অদ্যকার শিক্ষণীয় বিষয়— একটি বৃন্ত সমেত পাতার রিলিফ মডেল।

উদ্দেশ্য	প্রত্যক্ষ :—শিল্প শিক্ষার অমলধারায় শিক্ষার্থীর মানসভূমি সিঞ্চিত করা। ভাস্কর্য শিল্পের বৃহত্তর আঙ্গিনায় পদার্পণের পথ প্রস্তুত করা এবং শিল্পকর্মে উদ্বুদ্ধ করা। পরোক্ষ :—শিক্ষার্থীর রুচী, শালীনতা ও সৌন্দর্যবোধ জাগ্রত করা। পুস্তক পাঠের একঘেঁয়েমি ও ক্লান্তিবোধ থেকে সাময়িক ভাবে মুক্তি দেওয়া, সুষ্ঠু অবসর বিনোদনের উপায় হিসেবে ব্যবহার করা।
লক্ষ্য	সামান্য সৃষ্টির অসামান্য আনন্দলাভে সহায়তা করা।
উপকরণ	এঁটেল মাটি, পরিমাণ মত গোবর, একটি ১½' / ২' কাঠের পাটা, সেলিফন কাগজ, বৃন্ত সমেত একটি গাছের পাটা, বিভিন্ন ধরনের কয়েকটি রিলিফ মডেলের নমুনা, জল এবং শ্রেণীপযোগী অনান্য উপকরণাদি।
আয়োজন	অদ্যকার পাঠে শ্রেণীকক্ষে একটি শৈল্পিক বাতাবরণ সৃষ্টির জন্য শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান পরীক্ষার জন্য নিম্নরূপ কয়েকটি প্রশ্নের অবতারণা করা হবে। (১) কালোপাটায় একটি চতুর্ভুজ এঁকে জিজ্ঞেস করা হবে—এটা কয় মাত্রা বিশিষ্ট ? (২) এই চতুর্ভুজটিকে কিভাবে ত্রিমাতৃক ভাব দেওয়া যায় ? (কোনও শিক্ষার্থীকে তা কালোপাটায় করতে বলা হবে) (৩) এখন বল একটি রিলিফ মডেল যদি দ্বিমাত্রিক হয় তাহলে একটি রাউন্ড মডেলকে কয় মাত্রা বিশিষ্ট বলা যেতে পারে?

পাঠ ঘোষণা	"এস আজ আমরা বিদ্যালয়ের বার্ষিক শিক্ষামূলক প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণের জন্য প্রত্যেকে একটি করে মাটির রিলিফ মডেল তৈরী করা শিখি"—এইভাবে পাঠ ঘোষণার পর শিক্ষক / শিক্ষিকা শ্রেণী শৃংখলার প্রতি নজর রেখে উপকরণগুলি শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করবেন।
উপস্থাপনা	বিষয়টি শিক্ষার্থীদের কাছে সহজবোধ্য করে তোলার জন্য শিক্ষক / শিক্ষিকা প্রয়োজনবোধে এই পর্বটিকে তিনটি স্বতন্ত্র স্তরে ভাগ করে নেবেন।—যেমন 'ক' শীর্ষ—বিষয়বস্তু, 'খ' শীর্ষ—শিক্ষক / শিক্ষিকার কাজ, 'গ' শীর্ষ—ছাত্র ছাত্রীদের কাজ।

'ক' শীর্ষ বিষয়বস্তু	'খ' শীর্ষ শিক্ষক / শিক্ষিকার কাজ	'গ' শীর্ষ ছাত্র/ছাত্রীদের কাজ
৫৩ নং পাতায় "মাটির মডেল" অংশটি দ্রষ্টব্য	(১) প্রথমে শিক্ষক/শিক্ষিকা উক্ত বিষয়ের উপর সংক্ষিপ্ত একটি মুখবন্ধ পেশ করবেন।	(১) শিক্ষক/শিক্ষিকার বক্তব্য মনোযোগ সহকারে অনুধাবন করবে। কোনও কিছু দুর্বোধ্য মনে হলে তা জেনে নেবে।
	(২) প্রদীপনগুলি দেখাবেন এবং বিশ্লেষণ করবেন প্রয়োজন বোধে দু/একটি প্রশ্ন করবেন।	(২) প্রদীপনগুলি ভালভাবে লক্ষ্য করবে এবং প্রশ্নগুলির উত্তরদানে সচেষ্ট হবে।
	(৩) শিক্ষার্থীরা কিভাবে কাজ শুরু করবে তা শিক্ষক / শিক্ষিকা একটু যত্ন সহকারে দেখিয়ে দেবেন।	(৩) শিক্ষক/শিক্ষিকার নির্দেশ মত কাজ করবে।
	(৪) সমস্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ হাতের কাছে গুছিয়ে নিয়ে কাজ শুরু করতে বলবেন।	(৪) উপকরনগুলি হাতের কাছে গুছিয়ে নেবে।
	(৫) কোনওরূপ যন্ত্রপাতির সাহায্য নিতে নিষেধ করবেন।	(৫) কোনওরূপ যন্ত্রপাতির সাহায্য ব্যতিরেকেই কাজটি সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করতে চেষ্টা করবে।

বিষয়বস্তু	শিক্ষক / শিক্ষিকার কাজ	ছাত্র / ছাত্রীদের কাজ
	(৬) কাজ চলাকালিন পক্ষপাতিত্বহীন মনোভাব নিয়ে প্রত্যেকের কাজ ঘুরে ঘুরে দেখবেন এবং প্রয়োজন মত সাহায্য করবেন।	(৬) শিক্ষক / শিক্ষিকাকে সহযোগিতা করবে।
	(৭) কারও উপর কোনও রূপ পক্ষপাতিত্ব না করে সহানুভূতি সম্পন্ন মনোভাব নিয়ে শ্রেণী পরিচালনা করবেন।	(৭) শিক্ষক / শিক্ষিকাকে শ্রেণী পরিচালনায় সহযোগিতা করবে।
/	(৮) শ্রেণী কক্ষে কাজ চলা কালীন শ্রেণী পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য মৃদুলয়ে গুন গুন স্বরে রবীন্দ্র সংগীত বা নজরুল গীতি গাইবার স্বাধীনতা দেবেন।	(৮) গান জানা থাকলে শিক্ষক / শিক্ষিকার নির্দেশমত গানে অংশ গ্রহণ করবে। নতুবা শ্রেণী শৃংখলা বজায় রেখে কাজ করবে।
	(৯) শ্রেণী শৃংখলা বজায় রাখার নির্দেশ দেবেন।	(৯) শ্রেণী শৃংখলা বজায় রাখতে সচেষ্ট হবে।
	(১০) শ্রেণী কক্ষে সবার কাজ সমাপ্ত হলে, সামান্য জলের ছিটে দিয়ে সেলিফন কাগজ দিয়ে মডেলটি ঢেকে দিতে বলবেন।	(১০) শিক্ষক / শিক্ষিকার নির্দেশ মেনে চলবে।
অভিযোজন	শ্রেণী কক্ষে অদ্যকার শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষার্থীরা কতখানি আয়ত্ব করতে পেরেছে তা যাচাই করার জন্য শিক্ষক / শিক্ষিকা নিম্নরূপ কয়েকটি প্রশ্নের অবতারণা করবেন। (১) মাটিকে কাজের উপযোগী করে কিভাবে তৈরী করবে ? (২) মাটিতে অতিরিক্ত জল ব্যবহারের অসুবিধা কি ? (৩) কাজ সম্পূর্ণ হলে সেলিফন কাগজ দিয়ে ঢেকে রাখতে হয় কেন ? (৪) মডেলটি কিভাবে দীর্ঘস্থায়ী করবে ?	

শ্রেণী প্রদর্শণী	শিক্ষক/শিক্ষিকা শ্রেণী কক্ষের শিক্ষার্থীদের সমস্ত শিল্প-কর্মগুলি একত্রিত করে নির্ধারিত সময়সূচীর মধ্যে একটি অস্থায়ী প্রদর্শনীর আয়োজন করবেন, এবং প্রতিটি কাজের দোষ গুণ বিচার করে, প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে কম বেশী উৎসাহিত করবেন।
গৃহকাজ	প্রত্যেককে পরের দিন বাড়ি থেকে অনুরূপ পদ্ধতিতে একটি করে 'হাতুড়ী' বা 'চাবির' রিলিফ মডেল করে নিয়ে আসতে নির্দেশ দেওয়া হবে।

অরিগামি

বিদ্যালয়ের নাম— শ্রেণী—৭ম, শাখা— ছাত্র / ছাত্রী সংখ্যা— ছাত্র / ছাত্রীর গড় বয়স— শিক্ষক / শিক্ষিকার নাম— তারিখ—	বিষয়—চারু ও কারু শিল্প। বিশেষ বিষয়—অরিগামি। অদ্যকার শিক্ষণীয় বিষয় :— অরিগামি পদ্ধতিতে একটি মাছের মডেল।

উদ্দেশ্য	প্রত্যক্ষ :—শিল্পশিক্ষার অমলধারায় শিক্ষার্থীর মানসভূমি সিঞ্চিত করা। অরিগামি শিল্পের বৃহত্তর আঙ্গিনায় পদার্পণের পথ প্রস্তুত করা এবং শিল্পকর্মে উদ্বুদ্ধ করা। পরোক্ষ :—রুচী, শালীনতা ও সৌন্দর্যবোধ জাগ্রত করা, পুস্তক পাঠের একঘেয়েমি ও ক্লান্তিবোধ থেকে সাময়িক ভাবে মুক্তি দেওয়া। সুষ্ঠু অবসর বিনোদনের উপায় হিসেবে ব্যবহার করা।
লক্ষ্য	সামান্য সৃষ্টির অসামান্য আনন্দলাভে সহায়তা করা।
উপকরণ	সাদা কাগজ, কাঁচি, একটি উপযুক্ত চার্ট, কয়েকটি বিভিন্ন ধরনের মডেল, এবং শ্রেণীপযোগী অন্যান্য উপকরণাদি।
আয়োজন	শ্রেণী কক্ষে অদ্যকার শিক্ষণীয় বিষয়ের উপযোগী একটি শৈল্পিক বাতাবরণ সৃষ্টির জন্য, শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞানের ভিত্তিতে নিম্নানুরূপ কয়েকটি প্রশ্নের অবতারনা করা হবে।

	(১) জাপান কোন মহাদেশে অবস্থিত ? (২) ফুল সজ্জা ছাড়া ইদানিং আর কোন শিল্পের জন্য জাপান বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছে ? (৩) অরিগামি শব্দের অর্থ কি ?
পাঠঘোষণা	"এস আজ আমরা নববর্ষ উপলক্ষে বন্ধুবান্ধবদের উপহার দেওয়ার জন্য প্রত্যেকে অরিগামি পদ্ধতিতে কাগজ ভাঁজ করে কি ভাবে একটি মাছের মডেল তৈরী করা যায় তার কৌশল আয়ত্ব করা শিখি"—এই ভাবে পাঠ ঘোষণার পর শিক্ষক / শিক্ষিকা শ্রেণী শৃংখলা বজায় রেখে উপকরণগুলি শিক্ষার্থীদের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে বিতরণ করবেন।
উপস্থাপনা	কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য শিক্ষক / শিক্ষিকা আলোচ্য পর্বটিকে স্বতন্ত্র তিনটি শীর্ষে ভাগ করে নেবেন। যেমন—"ক" শীর্ষ—বিষয়বস্তু। "খ" শীর্ষ—শিক্ষক / শিক্ষিকার কাজ, "গ" শীর্ষ—ছাত্র বা ছাত্রীদের কাজ।

বিষয়বস্তু	শিক্ষক / শিক্ষিকার কাজ	ছাত্র / ছাত্রীদের কাজ
৫৫ নং পৃষ্ঠার 'অরিগামি' অংশটি দ্রষ্টব্য।	(১) প্রথমেই শিক্ষক/শিক্ষিকার শ্রেণী কক্ষে 'অরিগামি' সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত একটি মুখবন্ধ পেশ করবেন। প্রয়োজন বোধে দু একটি প্রশ্ন করবেন ও উত্তর নেবেন। সঙ্গে সঙ্গে কালোপাটা ব্যবহার করবেন।	(১) শিক্ষার্থীরা শিক্ষক / শিক্ষিকার বক্তব্য মনোযোগ সহকারে অনুধাবন করবে এবং প্রশ্ন গুলির উত্তরদানে সচেষ্ট হবে।
	(২) সঙ্গে নিয়ে যাওয়া বিভিন্ন ধরণের অরিগামির মডেলগুলি দেখাবেন।	(২) শিক্ষক / শিক্ষিকার নির্দেশমত কাজ করবে।
	(৩) শিক্ষক/শিক্ষিকা মাছের মডেল তৈরী করার জন্য মাপ মত কাগজ নেবেন এবং	(৩) শিক্ষার্থীরা শিক্ষক / শিক্ষিকার নির্দেশমত কাজ করবে, অসুবিধা বোধ করলে

শিক্ষার্থীদের মাপ মত কাগজ নিতে নির্দেশ দেবেন। প্রথম ভাঁজ নিজে করে দেখাবেন, শিক্ষার্থীদের অনুরূপ ভাঁজ করতে নির্দেশ দেবেন। চার্টের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে বলবেন এবং প্রত্যেকের কাগজের ভাঁজ ঠিক হয়েছে কিনা দেখবেন।	শিক্ষক/শিক্ষিকার কাছ থেকে জেনে নেবে।
(৪) দ্বিতীয় ভাঁজ নিজে করবেন কাগজটি কি আকৃতি পেল চার্টের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে বলবেন। প্রত্যেককে দ্বিতীয় ভাঁজ করতে নির্দেশ দেবেন। প্রত্যেকের কাজ দেখবেন, ভুল ত্রুটী হলে সংশোধন করে দেবেন।	(৪) শিক্ষার্থীরা শিক্ষক/শিক্ষিকার নির্দেশ মেনে চলবে।
(৫) অনুরূপ ভাবে নির্দেশ দান করে কাজটি সমাপ্ত করতে বলবেন।	(৫) শিক্ষক / শিক্ষিকার নির্দেশ মেনে চলবে। এবং কাজটি সম্পন্ন করতে সচেষ্ট হবে।
(৬) পক্ষপাতিত্বহীন মনোভাব নিয়ে শ্রেণী পরিচালনা করবেন।	(৬) শ্রেণী পরিচালনায় ব্যাপারে শিক্ষক/শিক্ষিকাকে সহযোগিতা করবে।
(৭) শ্রেণী শৃংখলার প্রতি নজর রাখতে নির্দেশ দেবেন।	(৭) শ্রেণী শৃংখলা বজায় রাখতে সচেষ্ট হবে।

অভিযোজন	অদ্যকার শ্রেণীকক্ষের শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষার্থীরা কতখানি আয়ত্ব করতে পেরেছে তা অভিক্ষার জন্য নিম্নানুরূপ প্রশ্নের অবতারণা করা হবে। (১) অরিগামি কোন দেশীয় শব্দ ? (২) শিচি-গো-সান কথার অর্থ কি ?

	(৩) একজন বিখ্যাত অরিগামি শিল্পীর নাম বল ? (৪) তিনি কোন কাজের জন্য পৃথিবীতে অমর হয়ে আছেন ?
শ্রেণী প্রদর্শনী	সমস্ত শিক্ষার্থীদের শিল্পকর্ম সমাপ্ত হলে, শিক্ষক/শিক্ষিকা সমস্ত শিল্প কর্মগুলি শ্রেণীকক্ষে সাজিয়ে একটি অস্থায়ী প্রদর্শনীর আয়োজন করবেন এবং প্রতিটি কাজের দোষগুণ বিচার করে প্রত্যেককে কম বেশী উৎসাহিত করবেন।
গৃহকাজ	বাড়ীতে নারায়ণ সান্যালের 'অরিগামি' বইটি থেকে পছন্দ মত চারটি মডেল অনুশীলন করে পরের দিন বিদ্যালয়ে নিয়ে আসতে বলা হবে।

আল্পনা

বিদ্যালয়ের নাম— শ্রেণী— শাখা— ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা— ছাত্র/ছাত্রীর গড় বয়স— শিক্ষক/শিক্ষিকার নাম— তারিখ—	বিষয় ঃ—চারু ও কারু শিল্প। বিশেষ বিষয় ঃ—অক্ষরের আল্পনা। অদ্যকার শিক্ষনীয় বিষয় ঃ— 'ভ' অক্ষরের আল্পনা

উদ্দেশ্য	প্রত্যক্ষ ঃ—শিল্পশিক্ষার অমলধারায় শিক্ষার্থীর মানস ভূমি সিঞ্চিত করা। অংকনশিল্পের বৃহত্তর আঙ্গিনায় পদার্পণের পথ প্রস্তুত করা এবং প্রত্যক্ষভাবে শিল্পকর্মে উদ্বুদ্ধ করা। পরোক্ষ ঃ—রুচী, শালীনতা ও সৌন্দর্যবোধ জাগ্রত করা। পুস্তক পাঠের একঘেঁয়েমি ও ক্লান্তিবোধ থেকে সাময়িক ভাবে মুক্তি দেওয়া এবং সুষ্ঠু অবসর বিনোদন সম্ভব করে তোলা।
লক্ষ্য	সামান্য সৃষ্টির অসামান্য আনন্দলাভে সহায়তা করা।
উপকরণ	কাগজ, পেনসিল নানা ধরনের রং তুলি, কয়েকটি অক্ষরের আল্পনার নমুনা এবং শ্রেণী কক্ষের অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরনাদি।

আয়োজন	অদ্যকার শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহী করে তোলার জন্য এবং শ্রেণীকক্ষে একটি শৈল্পিক বাতাবরণ সৃষ্টির জন্য শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞানের ভিত্তিতে নিম্নানুরূপ প্রশ্নের অবতারণা করা হবে। (১) সঙ্গে নিয়ে যাওয়া প্রদীপণটি দেখিয়ে জিজ্ঞেস করা হবে, এতে কি কি অক্ষর ব্যবহার করা হয়েছে? (২) বাংলা অক্ষরমালার কোন কোন অক্ষরে আল্পনার ঢং বেশী আছে। (৩) ধর বিদ্যালয়ের স্বাধীনতাদিবস উপলক্ষে পতাকা উত্তোলনের দিন, যে জায়গায় আল্পনা দেওয়ার কথা ছিল আগের দিন সে জায়গাটি বৃষ্টির জলে ভিজে গেছে, সেখানে কোন মাধ্যমে রঙিন আল্পনা দেওয়া যেতে পারে।
পাঠঘোষণা	"এস আজ আমরা বিদ্যালয়ে রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষে বাংলার 'ভ' অক্ষরের সাহায্যে কি ভাবে আল্পনা দিয়ে উৎসব কক্ষের মেঝের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা যায় তার করণ কৌশল আয়ত্ব করা শিখব।—এই ভাবে পাঠঘোষণার পর শিক্ষক / শিক্ষিকা সঙ্গে নিয়ে যাওয়া উপকরণগুলি শিক্ষার্থীদের মধ্যে সুষ্ঠু ভাবে বিতরণ করবেন।
উপস্থাপনা	শ্রেণীকক্ষে কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য আলোচ্য পর্বটিকে স্বতন্ত্র তিনটি শীর্ষে ভাগ করে নেওয়া হবে। 'ক' শীর্ষ—বিষয়বস্তু, 'খ' শীর্ষ—শিক্ষক / শিক্ষিকার কাজ। 'গ' শীর্ষ—ছাত্র বা ছাত্রীদের কাজ।

বিষয়বস্তু	শিক্ষক / শিক্ষিকার কাজ	ছাত্র / ছাত্রীদের কাজ
৫১ নং পৃষ্ঠায় 'আল্পনা' অংশটি দ্রষ্টব্য।	(১) প্রথমে শিক্ষক / শিক্ষিকা আলোচ্য বিষয়ের উপর সংক্ষিপ্ত একটি মুখবন্ধ পেশ করবেন। (২) প্রদীপনগুলি দেখাবেন এবং আল্পনার করনকৌশল সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের অবহিত করবেন।	(১) শিক্ষার্থীরা শিক্ষক/ শিক্ষিকার বক্তব্য মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করবে। (২) শিক্ষার্থীরা প্রদীপন গুলি ভালভাবে লক্ষ্য করবে।

বিষয়বস্তু	শিক্ষক/শিক্ষিকার কাজ	ছাত্র/ছাত্রীদের কাজ
	(৩) কালোপাটার 'ভ' অক্ষরটিকে ত্রিভূজ, চতুর্ভূজ এবং বর্গক্ষেত্রের মধ্যে বসিয়ে কিভাবে আল্পনায় রূপ দেওয়া যায় সে সম্বন্ধে ধারণা দেবেন এবং কাজ শুরু করতে নির্দেশ দেবেন।	(৩) শিক্ষার্থীরা মনোযোগ সহকারে শিক্ষক / শিক্ষিকার নির্দেশ মেনে চলবে।
	(৪) আল্পনার আকৃতি ঠিক করার সময় জ্যামিতি বাক্সের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে নির্দেশ দেবেন।	(৪) শিক্ষক / শিক্ষিকার নির্দেশ মেনে চলবে।
	(৫) রং ব্যবহারের সময় কি কৌশলে কতনং তুলি ব্যবহার করবে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করবে সে সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের অবহিত করবেন।	(৫) রং তুলি ব্যবহারের করণকৌশল জেনে নেবে এবং সাবধানতার সঙ্গে কাজ করবে।
	(৬) কি ভাবে আল্পনাটির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা যায় সে সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের অবহিত করবেন।	(৬) সৌন্দর্য বৃদ্ধির কৌশল জেনে নেবে।
	(৭) শ্রেণীকক্ষে কাজ চলাকালিন প্রত্যেকের কাজ ঘুরে ঘুরে দেখবেন এবং প্রয়োজন বোধে সাহায্য করবেন।	(৭) কাজ চলাকালিন কোনও সমস্যার উদ্ভব হলে শিক্ষক / শিক্ষিকার সাহায্য নেবে।
	(৮) সহানুভূতি সম্পন্ন মনোভাব নিয়ে শ্রেণী পরিচালনা করবেন।	(৮) শিক্ষক / শিক্ষিকাকে শ্রেণী পরিচালনায় সহযোগিতা করবে।
	(৯) শ্রেণী শৃংখলা বজায় রাখার নির্দেশ দেবেন।	(৯) শ্রেণীশৃংখলা বজায় রাখতে সচেষ্ট হবে।

অভিযোজন	অদ্যকার শিক্ষনীয় বিষয় শিক্ষার্থীরা কতখানি আয়ত্ব করতে পেরেছে তা পরীক্ষার নিমিত্ত শিক্ষক/শিক্ষিকা নিম্নরূপ প্রশ্নের অবতারণা করবেন। (১) আল্পনা শব্দটি কোন শব্দ থেকে এসেছে। (২) এই ধরনের আল্পনায় কি কি উপকরনের প্রয়োজন হয়? (৩) আধুনিক যুগে কোন কোন জিনিষের আল্পনা বেশী দেখা যায়?
শ্রেণী প্রদর্শনী	শ্রেণীকক্ষের সমস্ত শিক্ষার্থীর শিল্পকর্ম সমাপ্ত হলে শিক্ষক/শিক্ষিকা প্রত্যেকের কাজগুলি সাজিয়ে শ্রেণীকক্ষে একটি অস্থায়ী প্রদর্শণীর আয়োজন করবেন। এবং প্রতিটি কাজের দোষ গুণ বিচার করে প্রত্যেককে কমবেশী উৎসাহিত করবেন।
গৃহকাজ	পরের দিন শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে একটি করে রঙিন 'ম' অক্ষরের বৃত্তকার আল্পনা বাড়ি থেকে করে নিয়ে আসতে নির্দেশ দেবেন।

লিনোর ছবি

বিদ্যালয়ের নাম— শ্রেণী— , শাখা— ছাত্র / ছাত্রীর গড় বয়স— শিক্ষক / শিক্ষিকার নাম— তারিখ—	বিষয় :—চারু ও কারু শিল্প। বিশেষ বিষয়—লিনোর কাজ। অদ্যকার শিক্ষণীয় বিষয় :— বিদ্যালয়ের বার্ষিক পত্রিকার প্রচ্ছদ অলংকরণের জন্য লিনোর উপর ব্লক কেটে ছবি ছাপানো।

উদ্দেশ্য	প্রত্যক্ষ :—শিল্পশিক্ষার অমলধারায় শিক্ষার্থীর মানসভূমি সিঞ্চিত করা। ছাপাই ছবির বৃহত্তর আঙ্গিনায় পদার্পণের পথ প্রস্তুত করা এবং প্রত্যক্ষভাবে শিল্পকর্মে উদ্বুদ্ধ করা।

	পরোক্ষ :—শিক্ষার্থীর রুচি, শালীনতা ও সৌন্দর্যবোধ জাগ্রত করা। পুস্তক পাঠের একঘেয়েমি ও ক্লান্তিবোধ থেকে সাময়িকভাবে মুক্তি দিয়ে সুষ্ঠু অবসর বিনোদনের অভ্যাস তৈরী করা।
লক্ষ্য	সামান্য সৃষ্টির অসামান্য আনন্দলাভে সহায়তা করা।
উপকরণ	পরিমাণ মত লিনোলিয়াম, লিনোর ছবি ছাপানোর কালি, রোলার, একটি কালি মাখানোর উপযোগী সমতল কাঁচের টুকরো, লিনোকাটার বিকল্পে নরুন, ট্রেসিং কাগজ, কার্বন কাগজ এবং শ্রেণীর অন্যান্য উপকরণাদি ও কয়েকটি আদর্শ নমুনা।
আয়োজন	শ্রেণী কক্ষে অদ্যকার শিক্ষণীয় বিষয়ের উপযুক্ত বাতাবরণ সৃষ্টির জন্য শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞানের ভিত্তিতে নিম্নরূপ প্রশ্নের অবতারণা করা হবে। (১) তোমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহজপাঠ বইটি কোন ক্লাসে পড়েছ ? (২) বইটিতে ছোটদের জন্য মজার মজার কবিতা ছাড়া আর কি উপভোগ্য জিনিষ আছে ? (৩) এই ছবিগুলির রচয়িতা কে ? (৪) ছবিগুলি কি মাধ্যমে করা হয়েছে বলতে পার ?
পাঠঘোষণা	"এস আজ আমরা বিদ্যালয়ে পত্রিকার প্রচ্ছদ অলংকরণের জন্য লিনোর উপর ব্লক কেটে ছবি ছাপানোর কৌশল আয়ত্ব করা শিখব। এইভাবে বিষয় ঘোষণার পর শ্রেণী শৃংখলার প্রতি নজর রেখে, দু/একজন শিক্ষার্থীর সাহায্যে উপকরণগুলি সমস্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে বিতরণ করবেন।
উপস্থাপনা	অদ্যকার শিক্ষনীয় বিষয়টি শিক্ষার্থীদের কাছে সহজবোধ্য করে তোলার জন্য এই পর্বটিকে তিনটি স্বতন্ত্র শীর্ষে ভাগ করে নেওয়া হবে। 'ক' শীর্ষ—বিষয়বস্তু, 'খ' শীর্ষ—শিক্ষক / শিক্ষিকার কাজ, 'গ' শীর্ষ—ছাত্র বা ছাত্রীদের কাজ।

বিষয়বস্তু	শিক্ষক / শিক্ষিকার কাজ	ছাত্র/ছাত্রীদের কাজ
৫২ পৃষ্ঠায় 'লিনো ছাপ ছবি' অংশটি দ্রষ্টব্য	(১) প্রথমেই শ্রেণী কক্ষে লিনোর ছবির উপর একটি সংক্ষিপ্ত মুখবন্ধ পেশ করবেন।	(১) শিক্ষক / শিক্ষিকার কথা মনোযোগ সহকারে অনুধাবন করবে।
	(২) পত্রিকার নামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কি ধরনের Design উপযুক্ত হবে তার কয়েকটি সহজ নমুনা কালো-প্যাটায় এঁকে দেখাবেন।	(২) শিক্ষক/শিক্ষকার নির্দেশ মেনে চলবে। কিছু জানার থাকলে জেনে নেবে।
	(৩) সঙ্গে নিয়ে যাওয়া নমুনা চিত্রগুলি দেখাবেন প্রয়োজন বোধে দু/একটি প্রশ্ন করবেন।	(৩) নমুনা চিত্রগুলি মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করবে।
	(৪) পত্রিকার প্রচ্ছদের মাপ মত কালোপাটায় অঙ্কিত Sketch থেকে সাদা কাগজে ছবি আঁকতে নির্দেশ দেবেন। আঁকার সময় 6B পেনসিল ব্যবহার করতে বলবেন।	(৪) শিক্ষকের নির্দেশমত কাজ করবে।
	(৫) প্রাথমিক নক্সা আঁকার কাজ সমাপ্ত হলে ছবিটি ট্রেসিং কাগজে ট্রেস করতে বলবেন। ট্রেস করার সময় বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ ধরনের সাবধানতা অবলম্বন করতে বলবেন।	(৫) ট্রেস করার কৌশল আয়ত্ব করতে সচেষ্ট হবে।
	(৬) ট্রেস করার পর লিনোর মসৃণ দিকে ট্রেসিং কাগজ উল্টে কার্বনের সাহায্যে ট্রেস করতে বলবেন। এবং এই ভাবে ট্রেস করার কারণ সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের অবহিত করবেন।	(৬) শিক্ষক / শিক্ষিকার নির্দ্দেশ মত কাজ করবে।

বিষয়বস্তু	শিক্ষক / শিক্ষিকার কাজ	ছাত্র/ছাত্রীদের কাজ
	(৭) কাজের সুবিধার জন্য সমস্ত ছবিটিতে চীনাকালি ও তুলির সাহায্যে কালো সাদার অনুপাত ঠিক করে নিতে বলবেন।	(৭) শিক্ষক / শিক্ষিকার নির্দেশ মত চীনাকালির সাহায্যে কালো সাদার অনুপাত ঠিক করবে।
	(৮) এর পর লিনোকাটার বা নরুনের সাহায্যে ছবির সাদা অংশগুলি কেটে ফেলতে নির্দেশ দেবেন। এবং সূক্ষ্ম কাজ কিভাবে করা যায় যে সম্বন্ধে অবহিত করবেন।	(৮) লিনোকাটার কৌশল আয়ত্ব করার চেষ্টা করবে।
	(৯) কাটার কাজ শেষ হলে রোলারের উপর কালি মাখিয়ে কি কৌশলে ঈপ্সিত ছবিটি ব্লক থেকে কাগজে ছাপানো যায় সে সম্বন্ধে ধারণা দেবেন।	(৯) ছবি ছাপানোর কৌশল আয়ত্ব করতে সচেষ্ট হবে।
	(১০) শিক্ষার্থীদের অনুরূপ ভাবে কাজ করতে নির্দেশ দেবেন।	(১০) শিক্ষক / শিক্ষিকার নির্দেশ মেনে চলবে।
	(১১) লিনোর ছবিতে কি কৌশলে বিভিন্ন ধরনের রং ব্যবহার করা যায় সে সম্পর্কে আলোচনা করবেন।	(১১) রং ব্যবহারের প্রক্রিয়া জেনে নেবে।
	(১২) শ্রেণীকক্ষে কাজ চলাকালিন কোনও রূপ পক্ষপাতিত্ব না করে, শ্রেণী শৃংখলার প্রতি নজর রেখে, সহানুভূতি সম্পন্ন মনোভাব নিয়ে শ্রেণী পরিচালনা করবেন।	(১২) শ্রেণী শৃংখলার ব্যাপারে শিক্ষক/শিক্ষিকাকে সহযোগিতা করবে।

অভিযোজন	শ্রেণী কক্ষে অদ্যকার শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষার্থী কতখানি আয়ত্ত করতে পেরেছে তা অভীক্ষার জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন করা হবে। (১) লিনোর ছবির সুবিধা কি ? (২) লিনোর ছবি কি কি ভাবে ব্যবহার যোগ্য ? (৩) প্রাথমিক স্তরে ট্রেসিং কাগজ উল্টে লিনোর উপর ট্রেস করা হয় কেন ? (৪) লিনো কাটার জন্য প্রয়োজন হয় ছুরি, ব্লেড, নরুণ। কোনটি ঠিক ?
শ্রেণী প্রদর্শণী	শ্রেণীকক্ষে সমস্ত শিক্ষার্থীদের কাজ সমাপ্ত হলে শিল্পকর্ম একত্রিত করে নির্দ্ধারিত সময়সূচীর মধ্যে শিক্ষক / শিক্ষিকা একটি অস্থায়ী প্রদর্শনীর আয়োজন করবেন। এবং প্রতিটি কাজের দোষগুণ বিচার করে প্রত্যেককে কম বেশী উৎসাহিত করবেন।
গৃহকাজ	প্রত্যেককে পরের দিন বাড়ী থেকে একটি করে লিনোর উপযুক্ত সাদা কালোর একটি কম্পোজিসন করে নিয়ে আসতে বলা হবে।

॥ ভারতীয় চিত্রকলা সমুহ ॥

বৌদ্ধ চিত্রকলা

খৃষ্টধর্মের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় চিত্রকলার ইতিহাসে ক্ল্যাসিকাল যুগের সূত্রপাত ঘটে। ব্রাহ্মণ্যধর্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বহু পূর্বেই সমস্ত ভারতবাসী বৌদ্ধধর্মে দীক্ষালাভ করে। এই সময় সমগ্র প্রাচ্যে তথা সমগ্র এশিয়া মহাদেশে বিশেষ করে ভারতবর্ষই বৌদ্ধধর্মের প্রেরণাস্থল ছিল। অনুমান করা যায় কোশালার পবিত্র স্থানগুলিতে বিখ্যাত যাজক শিল্পীদের আবাসস্থল ছিল। শুধুমাত্র বৌদ্ধ ধর্মের মহাত্ম্যের জন্যই এই যুগ সুবর্ণযুগ নামে অভিহিত হয়নি। বরং এই যুগে ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতি চরম শিখরে আরোহণ করে বহিঃভারতের সভ্যতা সংস্কৃতিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে বলেই এই যুগ সুবর্ণযুগ নামে ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে আছে। এই যুগের শিল্প সংস্কৃতি সিংহল, জাভা, বালি, বোর্ণিও প্রভৃতি দেশে অল্পকালের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তী দেশীয় শিল্পকেও মহান ও মহীয়ান করে তোলে। এ প্রসঙ্গে ১৭ শতকের বিখ্যাত ঐতিহাসিক তারানাথ মত প্রকাশ করেন যে, "Where ever Buddhism prevailed skillfull religious Artists were found and in India this undoubtedly applie to the Art of painting." যাজক শিল্পীদের অসাধারণ সৃষ্টিরাজির নজীর আজ প্রায় অবলুপ্তির পথে। তা সত্বেও একথা বিশ্বাসযোগ্য যে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে, পরবর্তী যুগে যে বিখ্যাত শিল্প শিক্ষালয়গুলি গড়ে উঠেছিল তা পূর্বোক্ত শিল্পীদের কীর্ত্তি। স্বভাবতই বৌদ্ধ চিত্রকলা গ্রাফীক ধর্মী। শিল্পীরা বৌদ্ধধর্মের সারমর্মগুলি কলমের সাহায্যে লিপিবদ্ধ না করে তুলির সাহায্যে ব্যক্ত করেছেন। ধর্মীর উপদেশগুলি ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে আপামর জনসাধারণের কাছে যাতে সহজে বোধগম্য হয় তার জন্য গৌতমবুদ্ধের বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির আগে ও পরের ঘটনা অবলম্বনে অঙ্কিত কাপড়ের ঝুলমলে Scroll painting গুলি নিয়ে যাজক শিল্পীরা দূরদূরান্তে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমাতেন। নেপাল এবং তিব্বতে এই ছবিগুলিকে Temple Banner বা টঙ্কা নামে অভিহিত করা হয়। ধর্মপ্রচারের এই কৌশল হস্তলিপির থেকে যথেষ্ট কার্যকরী ছিল। তখনকার দিনে দেশের মানুষকে ধর্মভাবে প্রভাবিত করার এর থেকে সহজ মাধ্যম আর কিছু ছিল না।

৬৭ খৃষ্টাব্দে সম্রাট মিং টিং-এর অনুরোধে কাসিয়াথা মাবুংগা নামে

একজন ভারতীয় রাজকুমার কিছু সংখ্যক এই ধরণের চিত্রকলা সংগে নিয়ে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের নিমিত্ত চীনে যাত্রা করেছিলেন। ৭ম শতকের বেশ কিছু পূর্বে কিছু সংখ্যক যাজক শিল্পী বৌদ্ধধর্ম প্রচারের নিমিত্ত সুদূর মধ্য প্রাচ্যে যাত্রা করেন। তাদের মধ্যে অনেকেই সেখানে পাকাপাকিভাবে বসবাস শুরু করেন, এবং দেওয়াল চিত্র Fresco অংকন শুরু করেন। এইভাবে দেওয়াল চিত্র অংকনের জয়যাত্রা শুরু হয়। ১৭ শতকের দিকে জাপানে নারা যুগের চিত্রশিল্পে এর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। দেওয়াল চিত্রগুলিতে ধর্মীয় ভাব এবং গভীরতা লক্ষ্য করার মত। সম্ভবতঃ তারা সকলেই চীনা শিল্পী নন, অনেকের মতে তাঁরা ভারতীয় শিল্পী বলে অভিহিত। পারতপক্ষে সমসাময়িক ভারতীয় চিত্রকলা বলতে অজন্তা চিত্রকলাকেই বোঝায়। ৮ম শতকের প্রথমভাগে জাপানের হরিবুদি মন্দির গাত্রে অঙ্কিত চিত্রাবলী সম্বন্ধে Binyon বলেন। "This quite Indian in character recalling the Frescoes of cave temples of Ajanta in its grand, strongly out lined figures and in feeling for character and life, which it is reveals. There seems no doubt that it is modelled upon the Ajanta frescoes and the fact is eloquent and significant testing to the freedom of the intercourse then existing between India and Japan.'

তখন ভারত ও জাপানের মধ্যে স্বাধীন চলা-ফেরায় কোনও বিধিনিষেধ ছিল না। ছবিগুলি তারই সাক্ষ্য বহন করে। পনেরো শতকে জাপানের একটি প্রাচীন শিল্প শিক্ষালয় তোসা বৌদ্ধ প্রভাবে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়। এই সময়কার চিত্রগুলিতে চীনা Calligraphy-র প্রভাব অত্যন্ত বেশী। অপরপক্ষে ধর্মপ্রচারের সাথে সাথে ভারতীয় নন্দনতত্ত্ব সম্বন্ধীয় প্রাথমিক ধারণা লাভের জন্য দেশ বিদেশের শিল্পশিক্ষার্থীরা ভারতবর্ষে ছুটে আসতেন। ৯ম শতকে চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হি-য়েন এবং ৭ম শতকে হিয়ু-য়েন-সাং-এর মত আরও অনেক পরিব্রাজক ভারতে এসে দীর্ঘদিন ছিলেন এবং খ্যাতনামা ভারতীয় চিত্র শিল্পীদের কাছ থেকে চিত্রবিদ্যা আয়ত্ত করে দেশে ফিরে গেছেন। অনুরূপভাবে ভারতীয় বৌদ্ধ চিত্রকলার প্রভাব বহির্ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। এইভাবে প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে বহু উন্নতমানের Fresco-র সৃষ্টি হয় যার পরিচয় শিল্প ইতিহাস থেকে পাওয়া যায়।

যেহেতু বৌদ্ধধর্মের জন্মস্থান ভারত, সুতরাং একথা সহজেই অনুমেয় যে, বৌদ্ধ চিত্রশিল্পের জন্মস্থানও ভারত। অজন্তা চিত্রশিল্পই এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এ প্রসঙ্গে সিংহলের ষিগিরায়া এবং গোয়ালিয়রের বাগগুহার চিত্রের উল্লেখ করা যায়।

প্রায় ১০০ বছর ধরে এই সমস্ত গুহাগুলি গভীর জঙ্গলে পরিপূর্ণ, বন্যজন্তুর বাসস্থান ছিল। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে প্রথম ইউরোপীয়দের নজরে পড়ে। অজস্র গুহাচিত্রের মধ্যে সামান্য কিছুই এখন অক্ষত অবস্থায় আছে। এগুলি প্রাচ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠসম্পদ। এখানে বুদ্ধের বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির আগের ঘটনাবলীকে বৌদ্ধ শিল্পীরা এমন নিপুণতার সঙ্গে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন যা আজকের যুগের জ্ঞানীগুণী পণ্ডিত শিল্পীদের বিস্ময় উদ্রেক করে। ডাঃ ফার্গুসন অজন্তাকে "বৌদ্ধ চিত্রশাস্ত্রের এ্যালবাম" বলে অভিহিত করেছেন। অজন্তার পাথরকাটা গুহাগুলি হায়দ্রাবাদ নিজামের অধীনস্ত ফরদাপুর গ্রামের ৪ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। জলগাঁও রেলষ্টেশন থেকে এর দূরত্ব ৩৫ মাইল। এখানে একটি নির্জ্জন সুগভীর খাঁজের প্রায় ১০০ ফুট উপরে একটি অশ্ব খুরাকৃতি পাথরের মালাতে ২৯টি গুহা খনন করা হয়েছে। গুহামন্দিরগুলি ইন্দ্রিয়াদী গুহা নামে প্রসিদ্ধ। নিম্নে প্রবাহিত একটি শীর্ণকায়া স্রোতস্বিনী। এমন একটি শান্ত মনোমুগ্ধকর পরিবেশে যাজক সম্প্রদায় পাকাপাকিভাবে বসবাস করে কয়েকশো বছর ধরে শিল্পের আরাধনা করে গেছেন। মোট ২৯টি গুহার মধ্যে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মোট ১৬টি গুহার চিত্র অক্ষত অবস্থায় ছিল। কালের প্রকোপে এবং রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ১৯১০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মোট ১৬টি গুহার মধ্যে ৬টি গুহাচিত্র বৌদ্ধ শিল্পীদের অসাধারণ শিল্পকর্মের পরিচয় বহন করে চলেছে। এই ৬টি গুহা হোল ১, ২, ৯, ১০, ১৬ এবং ১৭ নং গুহা। গুহাগুলির স্তম্ভ, দেওয়াল, ছাদ সবই রং-এ রেখায় এমন মনোমুগ্ধকর ভাবে সাজানো যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। প্রতিটি গুহা ৬০ ফুট বর্গাকৃতি। ছবিগুলি একজন বা কয়েক জন শিল্পীর একটা বিশেষ সময়ের কাজ নয়। শিল্পীরা গোষ্ঠীবদ্ধভাবে কাজ করেছেন এবং একটা গুহার কিছু কাজ হয়ে যাওয়ার ১৫০/২০০ বছর পর ঐ গুহার অন্য কাজগুলি করা হয়েছে। ঐতিহাসিকরা এগুলির সময়সীমা নির্দ্ধারণের আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

খুব সম্ভব ২য় শতকে সম্রাট নাগার্জুনের রাজত্বকালে অজন্তায় 'নাগা' শিল্পীদের দ্বারা কিছু চিত্র রচনা করা হয়েছে বলে অনুমিত হয়। সম্ভবত ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতকে বুধাপক্ষের রাজত্বকালে মধ্যদেশীয় শিল্প দিক্ষিপনের অনুসরনে তৎকালিন বিখ্যাত শিল্পী বিস্বাসর কিছু উন্নতমানের চিত্রকলা ও ভাস্কর্যশিল্প রচনা করেন যা দেবতাদের তৈরী বলে ভ্রম হয়। এই যুগের পর ৯ নং এবং ১০ নং গুহাচিত্রে সাময়িকভাবে কিছুটা অধোগতি লক্ষ্য করা যায়। আবার পরের কাজগুলিতে ক্রমোন্নতি পরিলক্ষিত হয়।

জাতকের কাহিনী ছাড়াও ঐতিহাসিক বিষয় নিয়ে সম্ভবত দুটি চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। বিষয়গুলিতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে।

বৌদ্ধ শিল্পীরা কখনও রং-এ রেখায় কখনও বা পাথর খোদাই করে জাতকের বিভিন্ন ঘটনাবলীকে সুন্দরভাবে উপস্থিত করেছেন। এই সমস্ত চিত্রগুলি Fresco এবং টেম্পারা পদ্ধতিতে রচিত বলে অনুমান করা হয়। ৯ নং এবং ১০ নং গুহাগুলি সব চেয়ে প্রাচীন। সম্ভবতঃ এগুলি প্রথম শতকের দিকে অঙ্কিত হয়েছিল। চিত্র গুলিতে সাঁচী, ভারুত এবং অমরাবতী প্রভৃতি ভাস্কর্যের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এখানকার চিত্রশিল্পগুলি থেকে শিল্পীদের কারিগরী দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। অজন্তার প্রথমদিকে অঙ্কত ছবিগুলি শিল্পীদের প্রাথমিক চেষ্টা নয় বরং পরিণত শিল্পকৃতির পরিচয় বহন করে। এগুলি অতি উন্নত ভারতীয় শিল্পধারায় শিক্ষিত অভিজ্ঞ শিল্পীদের অঙ্কিত শিল্পকর্ম বলেই মনে হয়। এখানে কোনও কাঁচা হাতের কাজের নিদর্শন নেই বল্লেই হয়।

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে বলা হয়েছে যে চিত্রকলা হোল উন্নত মানের শৈল্পিক অভিব্যক্তি, এমনকি বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের পূর্বেও 'এই ধারণাই পোষণ করা হোত। অজন্তার প্রাচীন দেওয়াল চিত্রগুলি সর্বদাই একথা প্রমান করে।

৯ নং এবং ১০ নং গুহামন্দিরগুলি যখন চিত্রিত করা হয় তখন দেশটি ছিল দ্রাবিড় অন্ধ্র রাজাদের অধীনে। তাঁরা ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু তা সত্বেও তারা বৌদ্ধদের উপর কোনও রূপ অত্যাচার করতেন না। এই সমস্ত গুহামন্দিরগুলি খোদিত এবং অলংকৃত করা হয়েছিল একজন স্থানীয় রাজকুমারের নির্দেশে। শাসকবর্গের সঙ্গে যাজক সম্প্রদায়ের সহযোগিতার ফলে এমন অভূতপূর্ব কাজ সম্ভব হয়েছিল। প্রতিটি যাজক সম্প্রদায় রাজনীতির আবর্ত্তের মধ্যে সংশ্লিষ্ট থেকে সৃষ্টি করে গেছেন অজস্র চিত্রাবলী এবং ভাস্কর্য শিল্প। স্বায়ত্ব শাসক একজন যাজকের আনুগত্যে তাঁরা স্বতন্ত্র এক গণ্ডির মধ্যে বিচরণ করতেন। এই জগত ছিল বহিঃর্জগত থেকে সম্পূর্ণ রূপে বিচ্ছিন্ন।

অজন্তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট অত্যন্ত সহজ সরল। রীতির দিক দিয়ে শক্তিশালী এবং রেখার দিক দিয়ে একান্ত ভারতীয়। প্রতিটি দৃশ্যের কম্পোজিশন খুব সুন্দরভাবে সংযোজিত। নরনারীর আকৃতিগুলি খুব দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এবং প্রতিটি মানুষাকৃতির হাতের মুদ্রার ভেতর দিয়ে অভিব্যক্তি প্রকাশের চেষ্টা অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর। অজন্তার ১০ নং গুহাতে মনুষাকৃতি দিয়ে যে চিত্রটি রচিত হয়েছে, তাদের পরিধেয় বসনের ভাঁজগুলিতে গান্ধারশিল্পের প্রভাব সুস্পষ্ট। এদের দাঁড়ানো ও বসার ভঙ্গিমা খুবই জীবন্ত, মার্জ্জিতরূপে শিল্পীরা ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন।

১৬ নং এবং ১৭ নং গুহাচিত্রগুলি খুব সম্ভবত ৬ষ্ঠ শতকের অবদান। ১৬ নং গুহার চিত্রগুলি ১৭ নং গুহা চিত্রগুলি থেকে কিছু আগে অঙ্কিত

হয়েছে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। এই গুহাচিত্রগুলির মধ্যে কিছু কিছু কম্পোজিশন আছে যেগুলি অনবদ্য। মানুষের আকৃতির সঙ্গে সংযোজিত কিছু দৃশ্যচিত্রও অত্যন্ত নিপুনতার সঙ্গে অঙ্কিত হয়েছে। কোথাও স্থাপত্যের আকৃতি দিয়ে দুটো কম্পোজিশনকে একত্রিত করা হয়েছে। স্থাপত্যের আকৃতিগুলিতে বৌদ্ধ প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে। ১৭ নং গুহার কিছু কিছু চিত্র অক্ষত অবস্থায় আছে যেগুলি বৌদ্ধ চিত্রশিল্পের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। কতকগুলি চিত্র প্রকৃতপক্ষে মনে ছাপ ফেলতে সক্ষম, যেমন 'বুদ্ধের জন্ম, জীবন ও মহানির্বাণ'। চিত্রগুলি আদর্শের দিক দিয়ে যতখানি উল্লেখযোগ্য তার থেকে বেশী উল্লেখযোগ্য এর নাটকীয় অভিব্যক্তি।

সব থেকে পরের চিত্রগুলি ১ নং এবং ২নং গুহাতে দেখতে পাওয়া যায়। ১নং গুহার একটি দৃশ্য থেকে এর জন্ম তারিখ নির্ণয় করা যায়। সম্ভবতঃ ভারতীয় রাজা দ্বিতীয় পুলকেশী দ্বারা পারস্য রাজদূত খসরু পরভীজকে স্বাগত জানানোর দৃশ্য। ঐতিহাসিক ঘটনাবলী ছাড়াও এ ছবিটিতে পারস্য শিল্পের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

১ নং গুহায় সব থেকে বেশী চিত্রের নিদর্শণ আছে। সমস্ত ছবির মধ্যে গৌতম বুদ্ধের চিত্রখানিই গুহামন্দিরটিকে আলোকিত করে আছে। এই গুহার চিত্রগুলি উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে এখানকার চিত্রগুলির সাথে মধ্য জাভার সহজ সরল বৌদ্ধ ভাস্কর্যগুলির মধ্যে যথেষ্ট মিল খুঁজে পাওয়া যায়। যার নির্মিত কাল হোল ৮৫০ খৃষ্টাব্দ। জাভার বরবুদুরের স্তূপভাস্কর্য গুলি ভারতীয় ভাস্করদের শিল্পকৃতি বলে অনুমান করা হয়।

২ নং গুহার দৃশ্যাবলী সব থেকে পরে হয়েছে। এই দৃশ্যাবলীর কিছু কিছু অংশ ভারতশিল্পের অধোগতির সাক্ষ্য বহন করে। এর পরবর্ত্তী পর্যায়ে বৌদ্ধচিত্র সম্ভারের উপর মৃত্যুর কালোছায়া ঘনিয়ে আসে। ২নং গুহামন্দিরে দুইরীতির ছাপ লক্ষ্য করা যায়। একটিতে রীতিগত নক্সার প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায় যা সমসাময়িক খোটানের চিত্ররীতির কথা মনে করিয়ে দেয়। অন্য রীতিটিতে কম্পোজিশনের পটুতার অভাব লক্ষ্য করা যায়। এখানে মধ্যবর্ত্তী মূর্তিটি খুব সুপটু হাতের আঁকা মনে হলেও অন্যান্য মূর্তিগুলি পরিণত হাতের আঁকা বলে মনে হয় না। অন্যান্য বৌদ্ধ চিত্র-কলার নিদর্শন পাওয়া যায় সিংহলের যিগিরায়া এবং গোয়ালিয়রের বাগ গুহার দেওয়াল চিত্রগুলিতে। যিগিরায়ার দেওয়াল চিত্র সম্ভবত ৪৭৯ থেকে ৪৯৭ খৃষ্টাব্দে কাথিয়াপ্পার রাজত্ব কালে অঙ্কিত হয়। ছবিগুলি অজন্তার ১৬ নং এবং ১৭ নং গুহাচিত্রগুলির সমসাময়িক, কিছু কিছু দৃশ্যাবলীতে সিংহলের চিত্ররীতির ছাপ সুস্পষ্ট। এখানে যে রাজা-রাণীর চিত্রটি আছে তা রাজা কাথিয়াপ্পা এবং তার রাণীর চিত্র বলে পণ্ডিতরা মনে করেন।

মূর্ত্তিগুলির ভঙ্গিমা সাবলীল ও মার্জিত, মডেলিং ও কলাগত নৈপুন্য অজন্তার উন্নত চিত্রশৈলীর কথা মনে করিয়ে দেয়।

বাগগুহার চিত্রাবলীর প্রকৃত সন তারিখ জানা যায় নি। এই গুহামন্দির-গুলি অজন্তা থেকে ১৫০ মাইল দূরে অবস্থিত। অজন্তার পরবর্তী Fresco গুলির সাথে এগুলির কোনও মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। সম্ভবত ৬ষ্ঠ বা ৭ম শতকে এই চিত্রগুলি অঙ্কিত হয়েছিল। অধিকাংশ চিত্রই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তবে চিত্রগুলিতে একটি স্বতন্ত্র রীতি বা style লক্ষ্য করা যায়। অজন্তার মতই বাগগুহার স্তম্ভ, ছাদ ও দেওয়ালগুলি সুন্দর সুন্দর চিত্রাবলী দিয়ে অলংকৃত। এখানে ধর্মীয় বিষয় নিয়ে শিল্পীরা কাজ করেন নি। পরিবর্তে শোভাযাত্রা, নৃত্যগীত, দরবারের বিভিন্ন ঘটনার উপর শিল্পীরা বিশেষ প্রাধান্য দিয়েছেন। এখানকার ছবিগুলির মধ্যে তখনকার দিনের অভিনীত সঙ্গীতমুখর নাটক 'হল্লীসক' এর একটি দৃশ্যচিত্র বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। দৃশ্যের মধ্যে নাটকটি খুব স্বাচ্ছন্দের সঙ্গে অভিনীত হতে দেখা যাচ্ছে।

অজন্তা, বাগ ও যিগিরায়ার অধিকাংশ চিত্রাবলীই বৌদ্ধচিত্রকলার নিদর্শন স্বরূপ। ঐতিহাসিক 'তারানাথ' ভারতীয় বৌদ্ধচিত্রকলার প্রতি কিছুটা আলোক পাত করেছেন। তিনি তিনটি রীতি বা style এর কথা উল্লেখ করেছেন। সেগুলি হোল—দেব, যক্ষ এবং নাগা রীতি। এই রীতি বা style গুলির মধ্যে দেব রীতি ভগবান বুদ্ধের আবির্ভাবের বেশ কয়েকশ বছর পরে খৃঃপূঃ ৬ষ্ঠ শতক থেকে ৩য় শতকের মধ্যে 'মগধে' প্রচলিত ছিল। 'যক্ষ' রীতি সম্রাট অশোকের সময় মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। ঐতিহাসিক 'তারানাথ' এগুলিকে সম্রাট অশোকের সমসাময়িক বলে মনে করেন। আর নাগারীতির প্রচলন হয় লেখক দার্শনিক নাগার্জুনের সময়, সম্ভবতঃ তৃতীয় শতকের দিকে।

তৃতীয় শতাব্দীর পর তারানাথ মতপ্রকাশ করেন যে "It seemed as if the knowledge of art had vanished from among men" এর পরবর্তী যুগে ভারতীয় চিত্রকলার ইতিহাসে বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

তখনকার দিনে বৌদ্ধ চিত্রকলার রীতিগুলির মধ্যে তিনটি রীতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথমটি হল মধ্যদেশে, দ্বিতীয়টি হোল পশ্চিমদেশে এবং তৃতীয়টি হোল পূর্বদেশে। মধ্যপ্রদেশের রাজা বুধাপক্ষের রাজত্বকালে যে বিখ্যাত চিত্রশিল্পী ও ভাস্করের আবির্ভাব হয়েছিল, তিনি হলেন বিম্বাসর। তিনি মগধে জন্মগ্রহণ করেন। দেবরীতির সাথে যক্ষরীতির বিশেষ মিল আছে। পশ্চিম দেশীয় রীতিটি রাজপুতানায় অবস্থিত। এখানকার প্রধান শিল্পী

ছিলেন শ্রীঙ্গাধর। রাজা শীলার রাজত্বকালে তিনি মারওয়ারে জন্মগ্রহণ করেন। এই রীতির চিত্রকলা নাগা রীতির সংমিশ্রণে রাজা দেবপাল ও ধর্মপালের সময়ে বাংলা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। চিত্রকলার এই রীতিকে 'নাগা' রীতি বা style বলা হয়। ধীমান এবং তাঁর ছেলে বীটপাল ছিলেন পূর্বদেশীয় রীতির প্রধান প্রধান শিল্পী। তাঁরা দুজনেই ছিলেন চিত্রকলা, ভাস্কর্য এবং ধাতুর কাজে বিশেষ পারদর্শী।

৬ষ্ঠ এবং ১০ম শতকের দিকে অনুরূপ শিল্পরীতি কাশ্মীর, নেপাল, ব্রহ্মদেশ এবং দক্ষিণ ভারতে গড়ে ওঠে। ঐতিহাসিক তারানাথের মতে এই শিল্প রীতিগুলি প্রেরণা পেয়েছিল উল্লিখিত তিনটি প্রধান রীতির কাছ থেকে।

রাজপুত চিত্রকলা

(জৈন, রাজস্থানী ও পাহাড়ী কলম)

রাজপুত চিত্রকলা আলোচনা করতে হলে জৈন, রাজস্থানী এবং পাহাড়ী চিত্র সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা প্রয়োজন। প্রথম শতকের বহু পূর্ব থেকেই ভারতবর্ষে পবিত্র পুঁথি পত্রে উদাহরণ স্বরূপ (illustration) ছবির ব্যবহার হয়ে আসছে। ভারতবর্ষে প্রথম পুস্তক রচিত হয় সুতোয় বাঁধা কাঠের মলাট বিশিষ্ট দুই ইঞ্চি দৈর্ঘের পাতলা তালপাতার উপর। এইভাবে ১১ শতক পর্যন্ত বিহার, বাংলা এবং পশ্চিম ভারতে পুঁথি রচিত হতে থাকে। লিপি লেখার পর পুঁথিগুলি আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য লিখিত বিষয়ের উদাহরণস্বরূপ শিল্পীদের কাছে ছবি আঁকার জন্য পাঠানো হোত। এটা প্রায় অনেকটা প্রথার মত হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

অনুরূপভাবেই গুজরাটের সুবিস্তৃত অঞ্চলে জৈন্য জাহাজ ব্যবসায়ীদের আনুকুল্যে পশ্চিম ভারতে জৈন পুঁথিচিত্রের উদ্ভব ঘটে এবং পবিত্র পুঁথি রক্ষনাবেক্ষণের জন্য একটি গ্রন্থাগারও (Litarary) গড়ে ওঠে। পুঁথি চিত্রগুলি রীতির দিক দিয়ে আলংকারিক। সমতল বিশিষ্ট (Flat) লাল, হলুদ, নীল, সোনালী রং-এর উজ্জ্বল ব্যবহারে মার্জিত না হলেও চটকদার ছিল। সাদা ও কালো রং-এর বহিঃরেখা দিয়ে ছবিগুলি সম্পূর্ণ করা হত। ছবিগুলির একমাত্র বৈশিষ্ট হোল যে মনুষ্য মূর্তির মুখগুলি একপেশে (profile), কিছুটা ছুঁচোলো ধরণের। দেহকাণ্ডটা সামনের দিকে, দুটো চোখই পরিস্কার দেখা যাচ্ছে। মনে হয় যেন মূর্তিগুলি চশমা পরে আছে। অনেকটা বিশ শতকে ইউরোপীয় ঘনকবাদের (cubism) কায়দায় উল্টোপাল্টা করে দেখানোর চেষ্টা। ছবিগুলিতে যে স্থাপত্যের আভাস ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তা অনেকটা মাউণ্ট আবুর স্থাপত্যের ইঙ্গিতবাহী।

আনুমানিক ১৩ শতকের দিকে পারস্য থেকে ভারতে কাগজ আমদানী হয়। ১৫ শতকের দিকে পুঁথি রচনার জন্য তালপাতার পরিবর্তে কাগজ ব্যবহৃত হতে থাকে। তখন থেকেই পুঁথি চিত্রে নীল রং-এর ব্যবহার শুরু হয়। এবং পুঁথিঅঙ্কন রীতির কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ১৬শতকের পুঁথি-চিত্রে অধিকাংশ ছবির পশ্চাৎপটে টকটকে লাল রং-এর পরিবর্তে নীল রংএর প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়, কোনও ছবিতে আবার সবুজ ও নীলের ব্যবহারে ছবিগুলি উজ্জ্বল হতে থাকে। তুলির কাজ সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হতে থাকে।

তালপাতার পুঁথি চিত্রে ছবির ডান দিকের কোণ ঘেঁষে ছবিগুলো আঁকা হোত এবং বাম দিকে লেখার কাজ করা হোত। পরবর্তীকালে ছবিগুলি সেইভাবেই রচিত হতে থাকে। তবে পারস্য চিত্রশিল্পের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে শিল্পীরা লম্বালম্বিভাবে প্রথম ছবির নীচে দ্বিতীয় ছবি আঁকতে শুরু করেন, আর লিপি লিখতে শুরু করেন একেবারে উপরে। পূর্বে অঙ্কিত চিত্রের বিষয়বস্তুর সঙ্গে পরবর্তীকালে অঙ্কিত চিত্রের বিষয়বস্তুর মধ্যে যথেষ্ট পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। শিল্পীরা জৈন সাধু, দেবদেবী এবং জৈন তীর্থঙ্করদের পরিবর্তে নানাধরণের ফুলফল-লতাপাতার আলংকারিক রূপ এবং স্থাপত্যকে ছবির বিষয়বস্তু হিসাবে ব্যবহার করতে শুরু করেন। এ প্রসঙ্গে ১৫ শতকে উত্তরপ্রদেশ থেকে সংগৃহীত পুঁথিচিত্র লৌর-চন্দা (Love-Story) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এখানে নায়ক-নায়িকার মুখ-চোখ ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপস্থাপনা প্রাচীন পুঁথি চিত্রেরই সমগোত্রিয়, তবে রং ব্যবহারে কৌশল ও নাটকীয় অভিব্যক্তিতে কিছুটা নতুনত্ব আছে বলে অনেক বেশী উন্নত মানের মনে হয়।

রাজপুত পটশিল্পের সঠিক জন্মইতিহাস আমাদের কাছে অজ্ঞাত। তবে একথা সহজেই অনুমেয় যে গুজরাটী পট ও রাজস্থানী চিত্রকলার উন্নত ও মার্জিত সংস্করণই হোল রাজপুত পটশিল্প। ৭ম শতকে বিদেশী শত্রুর আক্রমণে পশ্চিম ভারতের শিল্প সংস্কৃতি যথেষ্ট পরিমাণে বিপন্ন হয়। কিন্তু শোলাঙ্কী রাজাদের আনুকুল্যে মালব এবং গুজরাটে শিল্পচর্চা অব্যাহত গতিতে এগিয়ে যেতে থাকে। ঐতিহাসিকদের মতে এই রাজারাই চিতোরের জয়স্তম্ভ এবং আবুপর্বতের জৈন মন্দির নির্মাণের কাজ করিয়ে ছিলেন। আনন্দ কুমারস্বামীর মতে তৎকালিন ভারতে হিন্দু চিত্রকলার দুটি স্বতন্ত্র রীতি দুটি ভিন্ন প্রদেশে গড়ে উঠেছিল। একটি ভারতের কেন্দ্রস্থলে সমতল অঞ্চলে যাকে রাজস্থানী কলম নামে অভিহিত করা হয়। অপরটি হিমালয়ের পাদদেশে যা পাহাড়ী কলম নামে বিশেষভাবে পরিচিত। পরে অবশ্য মোগল প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে রাজস্থানী ও পাহাড়ী কলম মার্জিত রূপ লাভ করে। গুজরাটী পট ও রাজস্থানী চিত্রকলার উন্নত ও মার্জিত সংস্করণই হোল রাজপুত চিত্রকলা।

রাজস্থানী কলম

১400 থেকে ১500 খৃষ্টাব্দের মধ্যে হুসেন শাহের রাজত্বকালে ভারতের কেন্দ্রস্থলে ইসলাম ধর্ম্ম প্রবলভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠলে হিন্দুধর্ম বিপন্ন হয় এবং বহু হিন্দুরাজ্য ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে। সংস্কৃত সাহিত্য অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে। ফলে ভাষা আন্দোলন হিন্দু মিনিয়েচার চিত্রকে

তরান্বিত করে। ১৪ শতকের দিকে হিন্দু ধর্মের নবজাগরণ শুরু হলে, হিন্দু সাহিত্য পুরাণ নিয়ে দিকে দিকে আলোচনা শুরু হতে থাকে ভক্তিবাদের প্রবল বন্যায় শিল্প-সংস্কৃতি জীবনযাত্রা প্রণালীর এক অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে ওঠে। বিষ্ণুভাবে বিভোর হয়ে রাধাকৃষ্ণের নাম গান শুরু হয়। দেশবাসী নতুন জীবনলাভে ধন্য হয় এবং ধর্মের সঙ্গে শিল্পের একটা গভীর যোগসূত্র স্থাপিত হয়।

শুরুতে রাজস্থানী চিত্রশিল্প প্রচলিত সাহিত্যকর্মের উদাহরণ রূপেই তার জয়যাত্রা ঘোষণা করে। যার পরিচয় মিলে ভগবৎপুরাণ, গীতগোবিন্দ, চৌর-পঞ্চাশিকা, রসিক প্রিয়া ও বারমাস্যায় প্রভৃতি কাব্যে। ভগবৎপুরাণের প্রথম অধ্যায়ে বিষ্ণুর মাহাত্মই প্রচার করা হয়েছে এবং বিষ্ণুর প্রতীক হিসেবে মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের জন্ম থেকে গোকুলের রাখাল জীবন, পরে দ্বারকার রাজকুমার হওয়া পর্যন্ত বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ১২ শতকের বাঙ্গালী কবি জয়দেব 'গীতগোবিন্দের' রচয়িতা, এখানে কৃষ্ণ নায়ক, রাধা নায়িকা। রাধাকৃষ্ণের এই রাগ অনুরাগের কাহিনী রাজস্থানী শিল্পীদের তুলিকাস্পর্শে অপরূপ রূপ লাভ করেছে। 'চৌর পঞ্চাশিকা' বিলহনা নামে একজন দরবারী কবির রচনা। এতে পঞ্চাশটি প্রেমকাব্য আছে। 'রসিকপ্রিয়া' ১৫১৯ খৃষ্টাব্দে অর্চার দরবারী শিল্পী কেশুজাসের রচনা। এখানে নায়ক-নায়িকার আবেগ প্রধান প্রেমের বৈশিষ্টগুলি নিখুঁতভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

মোগল চিত্রকলা বাস্তবধর্মী। সেক্ষেত্রে রাজপুত পটচিত্র হিন্দু সাহিত্যের প্রতীকধর্মী কাব্যিক উপস্থাপনায় সমৃদ্ধ। যেহেতু এতে উন্নত ও মার্জিত রুচীর পরিচয় পাওয়া যায় সেইজন্য অনেকে এটাকে হিন্দু এবং বৌদ্ধ সংস্কৃতির সংমিশ্রণ মনে করে থাকেন। রাজপুত শিল্পীরা রাধাকৃষ্ণের বিরহ মিলনের ভেতর দিয়ে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের গার্হস্থ জীবনের প্রতিচ্ছবিকে তুলে ধরেছেন। চিত্রগুলিতে প্রতীকধর্মী রং ব্যবহৃত হয়েছে। প্রতিটি রং-এর স্বতন্ত্র অর্থ আছে। যেমন লাল ক্রোধের প্রতীক, হলুদ বিস্ময়ের প্রতীক, বাদামী প্রেমের প্রতীক। এক্ষেত্রে শিল্পীরা বর্ণ লেপনের মাধ্যমে সুরের ঐক্যতান সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন, রাগমালা চিত্রশৈলী এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

'রাগমালা' কথার অর্থ হোল সুমিষ্ট সংগীতের মালা। ভারতীয় মার্গ সংগীতে যে ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিনীর উল্লেখ আছে তা একমাত্র রাজপুত শিল্পীদের কাজের মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়। মোট ৬টি পুরুষ রাগ, আবার প্রতিটি পুরুষরাগের ৬টি করে স্ত্রীরাগ। এক একটি রাগ বিশেষ বিশেষ ঋতু, সময় ও দিনকে প্রতীকায়িত করে। রাগ বলতে অনেকে সকাল ও সন্ধ্যের কথা উল্লেখ করেছেন। একমাত্র ভারতীয় চিত্রকলাতেই সংগীতের ছয় রাগ

ছত্রিশ রাগিনীর কথার উল্লেখ আছে। এই সমস্ত রাগ-রাগিনীর চিত্রে সংগীত ও কলার একত্র সমাবেশ ঘটেছে।

প্রথম রাগমালা চিত্রের শুরু হয় মেওয়ারে ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে যার মধ্যে রাজপুত সভ্যতা, সংস্কৃতির ছাপটি সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়। প্রথম দিকে এখানেও পুঁথি চিত্রের প্রচলন ছিল। ১৬ শতকের কিছু আগে সম্রাট জাহাঙ্গীর যখন শেষ বারের মত মেওয়ার আক্রমণ করেন তখন এই রাজ্যের দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত 'চাউয়ান্দ' নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রামে রাগমালা চিত্রের জয়যাত্রা শুরু হয়। ছবিগুলির বিষয় ছিল 'প্রিয়ার বিরহ'। একটি ছবিতে নায়িকা, শূন্য বিছানায় শায়িত অবস্থায় একটি পদ্মের পাপড়ি ছিঁড়ছে এবং অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে বলছে "তুমি কি সত্যিই ভালবাস, না ভালবাস না?" এই ছবিগুলি প্রথম দিকের রাজস্থানী চিত্রের অনুরূপ, পশ্চাৎপটে গাঢ় লাল, হলুদ, সবুজ ও কালোর সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবহার ছবির ভাব ব্যঞ্জনাকে পরিপুষ্ট করতে যথেষ্ট সহায়তা করেছে। ছবিটি সমতলধর্মী (Flat), কোনও মডেলিং বা পরিপ্রেক্ষিত দেখানো হয়নি। অনেকটা লোক শিল্পের সমগোত্রীয়। 'চৌর-পঞ্চাশিকার' নায়ক-নায়িকা হলেন 'বিলহার' এবং 'চম্পাবতী'। ১৫২৫ থেকে ১৫৭০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে উত্তর প্রদেশে চিত্রিত হয়। এখানে প্রাচীন রাজস্থানী রীতি বজায় থাকলেও নায়ক-নায়িকার পোশাক-পরিচ্ছদে আফগান শিল্পের প্রভাব আছে বলে অনুমিত হয়। উত্তর প্রদেশ থেকে আগত এই চিত্ররীতি পরবর্তী দিল্লী কলমকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে।

১৬২৫ খৃষ্টাব্দের পর ক্রমশঃ হিন্দু মিনিয়েচার চিত্ররীতির পরিবর্তন হতে থাকে। এই সময় মালব রাজ্যে কিছু কিছু রাগমালা চিত্র রচিত হয়। এই চিত্রের কম্পোজিশানে কিছু অভিনবত্ব লক্ষ্য করা যায়। ছবিগুলির বিষয়বস্তু হোল তোড়ি রাগিনী। ১৮ শতকের বুন্দি মিনিয়েচার চিত্রেও তোড়ি রাগিনীর হদিশ পাওয়া যায়। এখানে কৃষ্ণকে রাধার পোষাকে লীলারত অবস্থায় চিত্রিত করা হয়েছে। যেহেতু তখন বুন্দি রাজাদের সঙ্গে মোগল বাদশাদের সরাসরি যোগাযোগ ছিল, সেইজন্য এই রাগমালা চিত্রগুলিতে মোগল প্রভাব সুস্পষ্ট। এই চিত্রগুলিতেই প্রথম আলোছায়ার বিন্যাস দেখানোর চেষ্টা হয়েছে। পরে অবশ্য বুন্দি রাজস্থানী চিত্রের একটি কেন্দ্রস্থল হয়ে ওঠে। কিছুদিন পরে রাজপুতানার কোটা রাজ্যে বুন্দি রাজাদের আনুকুল্যে শিল্পচর্চা শুরু হয়। ১৮ শতকের দিকে বুন্দি শিল্পীদের কাজে একটি স্বতন্ত্র রীতির পরিচয় পাওয়া যায় যা নাকি বুন্দি রীতি নামে অভিহিত। ছবিতে পাহাড়-পর্বত, গাছ-পালা খুব নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে কোটা রাজ্যের রাজা উমেদ সিং-এর বাঘ শিকার চিত্রটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

রাজস্থানের সঙ্গে জয়পুরের মোগল বাদশাদের ঘনিষ্ঠতা বহুদিনের।

ফলে ১৯ শতকের প্রথম দিকে রাজস্থানী চিত্র মোগল প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে জয়পুর একটি শিল্পচর্চার কেন্দ্রে পরিণত হয়। যা শিল্পইতিহাসে জয়পুরী কলম নামে অভিহিত। জয়পুরী পটগুলি মার্জিত ও রুচিসম্পন্ন। এখানে শিল্পীরা মোগল রীতিতে বহু প্রতিকৃতি এঁকেছেন। প্রতিকৃতিগুলি খুবই উন্নতমানের। জয়পুরী শিল্পীরাই সর্বপ্রথম চৌহানরাজ পৃথ্বীরাজ এবং রানা প্রতাপ সিং-এর প্রতিকৃতি আঁকেন। সপ্তদশ শতকের দিকে জয় সিং এবং রামসিং এর দুখানি ছবি জয়পুর রাজপ্রাসাদে যত্নসহকারে সংরক্ষিত আছে। ছবিগুলির চরিত্র চিত্রন ও পোষাক-পরিচ্ছদের সূক্ষ্ম কারুকাজ এই সময়কার শিল্পীদের প্রতিভার পরিচায়ক।

পাহাড়ী কলম

১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে সম্রাট মহম্মদ শাহ যখন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন পারস্যের নাদির শাহ ভারত আক্রমণ করেন। দিল্লীতে তাঁর বর্বরোচীত অমানুষিক অত্যাচারে বহু লোক দিল্লী ছেড়ে পাঞ্জাবের পাহাড় বেষ্টিত হিন্দুরাজ্যগুলিতে আশ্রয় নেয়। এঁদের মধ্যে বহু গুণী চিত্রশিল্পীও ছিলেন। পাহাড়ী রাজাদের সঙ্গে মোগল সম্রাটদের সম্পর্ক ভাল থাকায় তাঁরা অনেকেই মোগল সম্রাটদের চাল-চলনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন। কিছুসংখ্যক হিন্দুরাজাদের দরবারে বেশ কিছু দরবারী শিল্পীও থাকতেন। তাঁরা সকলেই রাজস্থানী রীতিতে কাজ করতেন। এই সমস্ত হিন্দু রাজাদের অনেকেই তাঁদের সভাশিল্পীদের দিল্লীতে নিয়ে এসে মোগল কলমে শিক্ষিত করে নিয়ে গেছেন। এর একমাত্র পৃষ্ঠপোষক বাশোলার রাজা কৃপাল পাল সিং। তিনিই প্রথম তাঁর সভাশিল্পীদের মোগল কলমে শিক্ষিত করে তোলেন। উদাহরণ স্বরূপ বাশোলী শিল্পীর আঁকা কৃপাল পাল সিং-এর ছবিটি উল্লেখ করা যেতে পারে। রাজা তাকিয়া ঠেস দিয়ে কার্পেটের উপর বসে গুড়গুড়িতে তামাক খাচ্ছেন। পিছনে ময়ুর পালকের পাখা হস্তে একজন পরিচারক। রাজার সামনে উপবিষ্ট একজন রাজকুমার। ছবিটি মোগল প্রভাবে প্রভাবান্বিত হলেও মুখের গড়নে গুজরাটী পটের ছুঁচোলো ভাব, পশ্চাৎপটে গাঢ় লাল রং ও হলুদের ব্যবহার গুজরাটী পটের কথাই মনে করিয়ে দেয়। তা ছাড়াও বাশোলী শিল্পীরা রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক ও রামায়ণের কাহিনী নিয়েও ছবি এঁকেছেন তবে কোনও ক্ষেত্রেই প্রাচীন গুজরাটী পটের আওতা থেকে সম্পূর্ণরূপে সরে আসতে পারেন নি।

ক্রমশ বাশোলী চিত্রের প্রভাব চম্বা, গুলের ও কাংড়া রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে। অনেকে বাশোলীকে কাংড়া পূর্ব্ব কলম বলে মনে করেন। প্রাচীন গুজরাটী পাঠ এবং উন্নত মোগল শিল্পের সংমিশ্রনেই কাংড়া কলমের উৎপত্তি। এখানেও

রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাকেই ছবির উপজীব্য বিষয় হিসেবে গ্রহন করা হয়েছে। কাংড়া কলমের ছবিগুলির মধ্যে 'শ্রীকৃষ্ণের দানলীলা' ছবিটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নদীতীরে একটি গাছের নীচে কৃষ্ণ গোপিনীদের কাছ থেকে দান গ্রহন করছেন। দূরে প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী ও রাজপ্রাসাদের কিয়দংশ দেখানো হয়েছে। পরিপ্রেক্ষিত ও রং ব্যবহারের সূক্ষ্ম কাজ এ যুগের শিল্পীদের মুন্সিয়ানার পরিচায়ক। এই কলমের বিশেষ বৈশিষ্ট হোল সাবলীল রেখাংকন, হলুদ, লাল ও কমলা রং এর সংযত ব্যবহার এবং নারী পুরুষ নির্বিশেষে টানা টানা চোখ।

জম্বুর রাজা বলবন্ত সিং ও তার ভাই রঞ্জিতদেব চিত্রশিল্পের প্রতি বিশেষ উৎসাহী এবং আস্থাশীল ছিলেন। কাংড়ার রাজা 'সংসার চাঁদ' এবং চম্বার রাজা 'রাজসিং' পরম উৎসাহের সঙ্গে চিত্রকলায় শিল্পীদের উৎসাহিত করতেন বলে জানা যায়।

পরবর্তীকালে পাহাড়ী শিল্পীদের আঁকা ছবিগুলি থেকে বোঝা যায় যে তারা মোগল শিল্পীদের সমকক্ষ পর্যায়ে পেঁাচেছেন। চম্বার রাজা রাম সিং এর 'বাগানবাটী বিহার', রাধানৃত্য, কাংড়ারাজ সংসারচাঁদের 'রাজ দরবার', শ্রীকৃষ্ণের দানলীলা, গুলের রাজা, 'প্রকাশ চাঁদের ছবি' প্রভৃতি রং এ রেখার বিন্যাসে, পরিপ্রেক্ষিতের সুষম প্রয়োগে, পোষাক পরিচ্ছদ অংকন পদ্ধতিতে মোগল চিত্রকলার প্রভাব এত বেশী প্রকটিত যা ভারতীয় চিত্রশিল্পের কৌলিন্যকে সমূলে বিনাশ করে।

এর অব্যবহিত পরে দিল্লীবাসী শিল্পীদের প্রভাব বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে ফলে কাজগুলিতে স্থানীয় প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। পরে স্থান অনুযায়ী মোগল চিত্রকলার এক একটি স্বতন্ত্র কলমের উদ্ভব হয়। যেমন দিল্লী কলম, লক্ষ্ণৌ কলম, দক্ষিনী কলম, পাটনা কলম, কাশ্মিরী কলম, রুমীকলম ইত্যাদি।

মুসলিম চিত্রকলা

[১৫৫০-১৮০০ খৃঃ]

মুসলিম চিত্রকলা সম্বন্ধে আলোচনা করতে হলে প্রথমেই পাঠান সুলতানদের কথা মনে আসে। কিন্তু পাঠান সুলতানেরা স্থাপত্য শিল্পের উপর যতখানি গুরুত্ব দিয়েছিলেন চিত্রশিল্পের উপর ততখানি নজর দেননি। সেই জন্য পাঠান যুগে স্থাপত্য শিল্প যতখানি সোচ্চার, চিত্রশিল্প ঠিক তত খানিই অবহেলিত। যে সমস্ত পাঠান সুলতান একটু আধটু চিত্রশিল্পের অনুরাগী ছিলেন তাঁরাও দেশীয় গুজরাটী পট তেমন পছন্দ করতেন না। সুতরাং পাঠান সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় গুজরাটী পট কিছুদিন আপন অস্তিত্ব বজায় রেখে টিকে ছিল বটে, মোগল চিত্রকলার উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গেই তা সম্পূর্ণরূপে অবলুপ্ত হয়। পরে মোগল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বাবরের পৃষ্ঠপোষকতায় চিত্রকলা ক্রমশই উন্নতির চরম শিখরে আরোহন করে। ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে তৈমুর লং ভারত আক্রমণ করেন। তাঁর তাতার বাহিনী ভারতের বুকে যে নৃশংস হত্যাকাণ্ড চালিয়েছিল তা ইতিহাসে অবিস্মরনীয় হয়ে আছে। তিনি যে শুধু ধ্বংসলীলা চালিয়েছিলেন তা নয় ঐতিহাসিকদের মতে সভ্যতা, সংস্কৃতির দিক দিয়ে তিনি যথেষ্ট পরিশুদ্ধ মানুষ ছিলেন। তাঁরই বংশধর বাবর ভারতবর্ষে শিল্প, সভ্যতা ও সংস্কৃতির দূত হিসেবে পৃথিবীতে অমর হয়ে আছেন। বাবরের পুত্র 'হুমায়ুনের রোগশয্যার' যে অপূর্ব চিত্রখানির কথা আমরা জানি তা কোনও পারস্য শিল্পীর আঁকা বলে অনুমিত হয়। বাবরের পর তাঁর পুত্র হুমায়ুন রাজ্যভ্রষ্ট হয়ে পারস্যে আশ্রয় গ্রহন করেন। সেখানে পারস্য শিল্পীদের কাজ দেখে তিনি মুগ্ধ হন। যেহেতু তিনি শিল্পকলার প্রতি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন, সেইহেতু রাজ্য পুনরুদ্ধারের পর ভারতে ফিরে আসার সময় দুজন পারস্যের বিখ্যাত শিল্পীকে সঙ্গে নিয়ে আসেন। সেই দুজন শিল্পী হলেন 'মীর সৈয়দ' এবং 'আব্দুস সামাদ'।

মোগল চিত্রকলার আয়ুষ্কাল স্বল্প। ষোড়শ শতকে অর্থাৎ আকবরের রাজত্ব কালে শুরু। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে উন্নতির চরম শিখরে আরোহন করে, ঔরঙ্গজেবের রাজত্ব কালে মধুরলগ্নের পরিসমাপ্তি লক্ষ্য করা যায়। মোগল চিত্রশিল্পের জন্মস্থান পারস্য। আকবর তার স্মৃতিচারনায় পনের শতকের পারস্যের বিখ্যাত শিল্পী 'বিজাদ'(যাকে বলা হত 'The Rapheal of

the East') সম্পর্কে বলেছেন "The most eminent of all painter"। তাঁর এই উক্তি থেকে জানা যায় যে বিজাদ সেই সময় ভারতে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। সম্রাট আকবর সমরখন্দ ও হীরাট থেকেও কয়েকজন খ্যাত নামা শিল্পীদের নিয়ে এসে নিজের দরবারে স্থান দিয়েছিলেন। তারপর তিনি সারাভারত ঘুরে ঘুরে ওস্তাদ হিন্দু শিল্পীদের সংগ্রহ করেন। পরে ভারতে পারস্য চিত্ররীতি শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। ক্রমশ আকবরের চেষ্টায় আমাদের ভারতীয় শিল্পীরা পারস্য চিত্ররীতির সঙ্গে পরিচিত হন। পারস্য শিল্পরীতি এবং ভারতীয় শিল্পরীতির মিলনে এক নতুন শিল্পরীতি গড়ে ওঠে যাকে মোগল চিত্রকলা নামে অভিহিত করা হয়। আকবর মীরসৈয়দ আলীকে দিয়ে বহু চিত্র রচনা করিয়েছেন। ১২টি খণ্ডে আমীর হামজার জীবন কাহিনীকে চিত্রায়িত করিয়েছিলেন বলে ঐতিহাসিকরা মনে করেন। এই গ্রন্থটিকে 'হামজানামা' নামে অভিহিত করা হয়। এ ছাড়াও চেঙ্গিস-নামা, জাফর-নামা, আকবর-নামা, মহাভারত, নল দময়ন্তীর কাহিনী প্রভৃতির চিত্রগুলি মোগল শিল্পীদের শিল্প নৈপুণ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

আকবর হিন্দু শিল্পীদের খুব ভাল চোখে দেখতেন। দশবন্ত নামে এক পাল্কীবাহকের ছেলের শিল্প প্রতিভার পরিচয় পেয়ে তাকে তিনি সভা-শিল্পীর পদে বহাল করেছিলেন। দশবন্ত ছাড়াও আরও কয়েকজন হিন্দু শিল্পী আকবরের দরবারে স্থান পেয়েছিলেন। তাঁরা হলেন যথাক্রমে বলবন্ত, কেসুদাস প্রভৃতি। তখনকার শিল্পীরা সমবায় পদ্ধতিতে কাজ করতেন। ছবির প্রাথমিক কাজ অর্থাৎ জমি তৈরী, কম্পোজিশান, ড্রয়িং করতেন একজন এবং রং ও ছবির খুঁটিনাটি জিনিষের কাজ করতেন অন্যজন। আকবর জীবনে যতগুলি যুদ্ধ করেছেন প্রতিটি যুদ্ধের ছবি তাঁর 'আকবর নামায়' স্থান পেয়েছে। এই সমস্ত চিত্রে detail এর কাজ লক্ষ্য করার মত। শিল্পীরা তখনকার দিনে যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম এবং যুদ্ধের বিভৎসতাকে অমানুষিক পরিশ্রমে তুলে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করতেন। এই ছবিগুলির পরিপ্রেক্ষিত রচনার কৌশলে শিল্পীদের দুর্বলতার পরিচয় পাওয়া যায়। ছবিতে সামনের ও দূরের বস্তুর দূরত্ব বোঝা যায় না। অনেকের মতে মোগল শিল্পীরা এ বিষয়ে অজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু একথা ঠিক নয়। বাদশাদের ফরমাস অনুযায়ী তাঁরা ছবি আঁকতেন। সেই কারণে বাদশাদের নির্দেশমত তাঁরা পরিপ্রেক্ষিতকে ভাঙচুর করে উপস্থিত করতেন। অর্থাৎ পরিপ্রেক্ষিতের বিকৃতি (distort) ঘটিয়েছেন। কোন কোনও ক্ষেত্রে অবশ্য তাদের পরিপ্রেক্ষিত জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। আকবরনামার চিত্রকর 'মধুর' অঙ্কিত রাজস্থানের কোটা রাজ্যের শাসনকর্তার, আকবরের কাছে দুর্গের চাবি সমর্পণের যে ছবিটি আছে তা ভাবে, লাবণ্যে ও বৈচিত্রে অনন্য সাধারণ। চারিদিকে সৈন্য বেষ্টিত

অশ্বারূঢ় আকবর। এখানে আকবরকে একটু বড় করে দেখানো হয়েছে। ভারতীয় চিত্রকলার ব্যাকরণ মেনে নিয়েই শিল্পীরা কাজ করেছেন। আকবরের প্রধানমন্ত্রী আবুল ফজল তাঁর 'আ-ইনি-আকবরী' গ্রন্থে লিখেছেন "প্রতি সপ্তাহে শিল্পীরা তাদের অঙ্কিত ছবিগুলি নিয়ে সম্রাটের কাছে উপস্থিত হতেন। এবং প্রতিটি ছবি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে দেখার পর, ছবির দোষগুণ আলোচনা করে সম্রাট শিল্পীদের পুরস্কৃত করতেন।" এইভাবে সম্রাটদের উৎসাহে এবং শিল্পীদের পরিশ্রমে মোগল শিল্পকলা দিনে দিনে উন্নতির চরম পর্যায়ে পৌঁছায়।

মোগল চিত্রকলা ক্ষুদ্রাকৃতি। মনোযোগ সহকারে সম্পন্ন করা। একে বলা হয় মিনিয়েচার চিত্ররীতি। দেশীয় তুলট কাগজে টেম্পারা পদ্ধতিতে অতিসূক্ষ্ম তুলির ফোটায় ছবিগুলি অঙ্কিত। ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে দেখলে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তুলির কাজ লক্ষ্য করা যায়। আজকাল ঘরের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য চিত্রশিল্পগুলি যেমন গৃহের দেওয়ালে টাঙ্গানো থাকে এবং তা দেখে বিত্তবান পরিবারের লোকেরা আনন্দ লাভ করে। তখনকার দিনে ছবিগুলি দেওয়াল সজ্জায় ব্যবহৃত না হয়ে এ্যালবামেই থাকত। সুলতান বাদশারা মেজাজ মর্জি অনুযায়ী গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত এ্যালবামের ছবিগুলি দেখে মনোরঞ্জন করতেন।

সম্রাট জাহাঙ্গীর চিত্রশিল্পের একজন উঁচুদরের সমজদার ছিলেন তাঁর সভাশিল্পী ছিলেন পারস্যের বিখ্যাত শিল্পী মনসুর। তাঁর শিল্প প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে সম্রাট জাহাঙ্গীর তাকে ওস্তাদ উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি সম্রাট জাহাঙ্গীরের বৈচিত্রপূর্ণ জীবনের ঘটনা অবলম্বনে বহু উল্লেখযোগ্য চিত্র রচনা করেছেন। সম্রাট প্রতি সপ্তাহে শিল্পীদের Studio তে যেতেন। মনোযোগ সহকারে ছবিগুলি দেখতেন এবং প্রয়োজন বোধে সমালোচনা ও তারিফ করতেন। তাঁর সময়ে মোগল চিত্রকলা উন্নতির চরম শিখরে আরোহন করে। এই সময় মোগল শিল্পীদের আঁকা প্রতিকৃতিগুলি পৃথিবীর যে কোনও শ্রেষ্ঠ প্রতিকৃতি চিত্রের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। এই ধরনের ক্ষুদ্রাকৃতি প্রতিকৃতিগুলি চরিত্র চিত্রনের দিক দিয়ে, ভাবাভিব্যক্তির প্রকাশে অসাধারণ বললেও অত্যুক্তি হয় না। প্রতিকৃতিগুলি টেমপারা পদ্ধতিতে নিখুঁত ভাবে সম্পন্ন করা। মনে হয় যেন শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ করে শিল্পীরা কাজ করেছেন।

প্রতিকৃতি অঙ্কনের সময় এখন যেমন sitting দেওয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল, তখনকার দিনে sitting এর কোনও ব্যবস্থা ছিল না। বাদশারা দরবারে বসতেন শিল্পীকে দরবারের নিয়মনীতি মেনে নিয়ে একটি বিশেষ ব্যবধানে

বসে প্রতিকৃতি রচনা করতে হোত। সুতরাং প্রতিকৃতি অংকনের সময় শিল্পীদের যথেষ্ট অসুবিধার মধ্যে কাজ করতে হোত। বাদশাদের বেলায় তবুও শিল্পীরা বাদশাদের দেখতে পেতেন কিন্তু বেগমদের প্রতিকৃতি অংকনের সময় আরও অসুবিধার মধ্যে কাজ করতে হোত। হয় বেগমরা একবার আয়নার সামনে দেখা দিয়েই চলে যেতেন, নয়তো ছাদের উপর বেগমরা দাঁড়াতেন, নীচে গামলায় জল রাখা হোত। সেই জলের ছায়া দেখে শিল্পীরা প্রতিকৃতি রচনা করতেন। সেই কারনেই শুধু পোষাকপরিচ্ছদ ছাড়া, প্রতিকৃতি-গুলির চরিত্রচিত্রনে আর কোনও পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না। সম্রাজ্ঞী নূরজাহান কখনও কখনও দরবারে বসতেন। সেইজন্য তাঁর প্রতিকৃতি অন্যান্য বেগমদের প্রতিকৃতির তুলনায় কিছুটা স্বতন্ত্র বলে মনে হয়।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় হাতীর দাঁতের উপর ছবি আঁকার প্রথা প্রচলিত হয়। হাতির দাঁতের চৌকো টুকরোর উপর টেমপারা পদ্ধতিতে অংকিত চিত্রগুলি থেকে মোগল শিল্পীদের কারিগরী দক্ষতার পরিচয় মেলে। আতস কাঁচ দিয়ে দেখলে প্রতিটি মূর্ত্তির ভূরু, চোখ, মুখ চুলের প্রতিটি রেখা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। হাতির দাঁতের উপর কৃষ্ণ-রাধা, অন্যান্য দেবদেবী, নানা ধরনের প্রাকৃতিক দৃশ্য প্রভৃতি অতি যত্নের সঙ্গে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। হাতির দাঁতের উপর অংকিত ছবি ছাড়াও এই সময় টেমপারা পদ্ধতিতে নানাধরনের পশুপাখীর চিত্র, প্রতিকৃতি, আলংকারিক নক্সা প্রভৃতি চিত্র অতি যত্নের সঙ্গে মোগল শিল্পীরা বাস্তবসম্মত ভাবে ফুটিয়ে তুলতে সমর্থ হয়েছেন। পশু চিত্রের মধ্যে হাতি, ঘোড়া, উট, নানা জাতীয় হরিণের বাস্তবধর্ম্মী চিত্র বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। পাখীর চিত্রগুলিতে পালকের তুলতুলে ভাবটি খুবই অনুভূতিশীল। ব্যবসা বানিজ্যের আদানপ্রদানের ফলে মোগল চিত্রকলা পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। সম্রাট জাহাঙ্গীরের সমসাময়িক হল্যাণ্ডের বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী 'রেমব্রাণ্ট' মোঘলচিত্রের একজন বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তিনি মোগলরীতিতে বহু স্কেচ, এচিং এবং অনুকৃতিশিল্প করেছেন বলে জানা যায়।

জাহাঙ্গীরের পর সম্রাট শাহজাহান দিল্লীর সিংহাসনে আরোহন করেন। তিনি স্থাপত্য শিল্পের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তাঁর সময়ে স্থাপত্যশিল্প উন্নতির চরম শিখরে আরোহন করে। 'তাজমহল' তার প্রকৃষ্ট নজির। এই সময় থেকেই মোগল চিত্রশিল্পের অধঃপতন শুরু হয়। তিনি ছিলেন জাঁক জমক প্রিয় জমকালো সম্রাট। তাঁর সময়কার চিত্রশিল্পে জমকালো ভাবটাই বিশেষ ভাবে ফুটে উঠেছে। শাহজাহানের সময় থেকেই বাদশাহদের মাথার পিছনে সোনালী রং এর জ্যোতিচক্র এবং ছবির বর্ডারে জমকালো ফুল-ফল, লতা-পাতার আলংকারিক রূপের আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। পরে মাত্রাতিরিক্ত

ভাবে ইউরোপীয় প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে মোগল চিত্রকলার মৌলিকত্ব ক্রমশঃ লোপ পেতে থাকে এবং সমূলে বিনষ্ট হয়।

ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে মোগল চিত্রকলার ইতিহাসে অমানিশার কালো মেঘ ঘনিয়ে আসে। সম্রাট ছিলেন গোঁড়া মুসলমান এবং তীক্ষ্ণ কুটনীতিবীদ। শিল্পকলাকে তিনি হেয় প্রতিপন্ন করতেন। শিল্পীদের প্রতি তিনি সর্বদাই অবজ্ঞার ভাব পোষণ করতেন। তবুও তার সময়ে যে দু একখানি চিত্র রচিত হয়েছে তাতে ইউরোপীয় প্রভাব সুস্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হয়। এই সময়কার উল্লেখযোগ্য চিত্রটি হোল "সম্রাট ঔরঙ্গজীবের শিকার থেকে ফেরা"। তাঁর ভ্রান্তি তিনি শেষ বয়সে কিছুটা উপলব্ধি করেছিলেন। মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে তিনি কনিষ্ঠ পুত্র কামবক্সকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন "জীবনের অপূর্ণতা ও হীনতা নিয়েই অজানা অন্ধকারে আমার জীবনতরী ভাসিয়ে দিলাম।" মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির এক অপরিমেয় সম্ভাবনাকে তিনি চিরতরে অবলুপ্তির পথে ঠেলে দিয়েছেন।

নবীন বাংলার শিল্পীগোষ্ঠী

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আধুনিক ভারতশিল্পের পথিকৃত, নবজাগরণ যুগের পুরোধা শিল্পী, শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের আবির্ভাব এ শতকের প্রথম দিকে। আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই দেশজোড়া খ্যাতির অধিকারী একেছেন যেমন, লিখেছেনও অনেক। ভারতবাসীর কাছে তিনি ছবি লিখিয়ে অবনঠাকুর নামেই পরিচিত। কেন তাঁকে আধুনিক ভারত শিল্পের পথিকৃত বলা হয় সে সম্বন্ধে ধারণা পেতে হলে অবনীন্দ্রপূর্ব যুগে ভারতশিল্পের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে কিছুটা আলোকপাত করা প্রয়োজন।

ভারত শিল্পের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, বৈদিক যুগে কেবলমাত্র দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার্য সামান্য কিছু তৈজসপত্র নির্মাণের কথা ছাড়া আর কোনও মৌলিক শিল্পসৃষ্টির কথা জানা যায়নি। বৈদিক যুগের অবসানের পর ভারতীয় শিল্পীরা স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পে যতখানি গুরুত্ব দিয়েছেন চিত্রশিল্পে ঠিক ততখানি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেছেন। এর কারণ আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকের শেষভাগে গুপ্তযুগের আবির্ভাব। স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলা, শিল্পের এই তিন শাখাতেই গুপ্ত শিল্পীরা তাঁদের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন। যার পরিচয় আমরা পাই অজন্তার শিল্পকলা থেকে। অজন্তার চিত্রশিল্প যদিও ভারতীয় ক্ল্যাসিক্যাল চিত্রকলা হিসেবে পরিগণিত, যদিও তা একান্তভাবে ভারতীয় ভাবরসে পরিপূর্ণ, তবুও তা বৌদ্ধধর্ম প্রচারের হাতিয়ার রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং অজন্তা চিত্রকে কোনও মতেই মৌলিক ভারতীয় চিত্রকলা বলা যায় না। অজন্তার পরবর্তী যুগে ভারতশিল্পের ইতিহাসে নতুন চিন্তা-ধারার প্রভাব আসতে অনেকটা সময় অতিবাহিত হয়েছে। এর কিছু সময় পরেই উত্তর-পশ্চিম ভারতে জৈন পুঁথি চিত্রের আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু পুঁথি চিত্র একটি স্বতন্ত্র, ব্যক্তিগত হওয়ায়, তা মৌলিক ভারতীয় চিত্রকলা হিসেবে পরিগণিত হতে পারেনি। এর অব্যবহিত পরেই রাজপুত ও মোগল চিত্রশিল্পের জয়যাত্রা ঘোষিত হয়। রাজপুত চিত্রকলা একটি স্বতন্ত্র ভারতীয় চিত্রশৈলী হলেও কিছুদিনের মধ্যেই মোগল প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে আপন স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে। অপরপক্ষে মোগল চিত্রকলা ভারতীয় ভাবধারায় পুষ্ট হলেও একটি বিশেষ জীবনের ইঙ্গিতবাহী। শিল্পীরা সুলতান,

বাদশা, আমীর, ওমরাহের মর্জি অনুযায়ী কাজ করতেন এবং জাঁকজমকপূর্ণ একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মনোরঞ্জনের প্রতি বিশেষ আস্থাশীল ছিলেন। অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে ইউরোপীয় শিল্পের আবির্ভাব ঘটে। এবং ভারতীশিল্পকে সমূলে বিনষ্ট করে। এর মূলে একটা বিশেষ কারণ ছিল। ইউরোপীয়রা এদেশে এসেছিলেন ব্যবসা বাণিজ্যের নিমিত্ত। সুতরাং তাঁরা ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণের উপর যতটা আস্থাশীল ছিলেন, চিত্রকলার উৎকর্ষ সাধনের উপর ততটা গুরুত্ব অর্পণ করেন নি। তাঁরা বাস্তবধর্মী প্রতিকৃতি, সাদৃশ্যমূলক দৃশ্যচিত্র ও দৈনন্দিন জীবনে চটকদার ঘটনাকে ছবিতে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। যেহেতু ক্যামেরা তখনও পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। সেইহেতু এই ধরণের ছবিকে ক্যামেরার বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করেন। পরে কলকাতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার বিস্তীর্ণ কালীঘাট অঞ্চলে একশ্রেণীর পটুয়াদের আবির্ভাব ঘটে। তাঁরা নানাধরণের দেবদেবীর ছবি, তৎকালিন বাবুসমাজের কেচ্ছাকাহিনী প্রভৃতিকে ছবির উপজীব্য বিষয় হিসেবে ব্যবহার করে ছবিকে জীবিকার্জনের উপায় হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করেন। পরে এই সমস্ত পটুয়া শিল্পীদের কাজ একটি বিশেষ style-এ রূপ লাভ করে। এই ধরণের ছবিগুলিতে কালো বহিঃরেখা, চটকদার রং এবং মোলভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়, ছবিগুলিতে নান্দনিক বোধের অভাব পূর্ণ মাত্রায় ছিল। ভারতীয় মৌলিক চিত্রকলা হিসেবে এগুলিকে মেনে না নিলেও, বিদেশ থেকে আগত মুদ্রিত ছবি এবং পটুয়াদের চটকদার ছবিগুলি তখনকার ভারতবাসীর কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল।

এরই প্রেক্ষাপটে রাজা রবিবর্মার আবির্ভাব। সেই সময়ে ভারতবাসী ছিল অত্যন্ত ধর্মভীরু। রবিবর্মা ভারতীয় উপাখ্যান নিয়ে ছবি আঁকতে শুরু করলে ভারতবাসী রবিবর্মার ছবির প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হন। যদিও রবিবর্মার ছবির বিষয়বস্তু এসেছিল ধর্মোপাখ্যান থেকে, তথাপি তার ছবির আঙ্গিকপদ্ধতি ছিল সম্পূর্ণরূপে ইউরোপীয়। ছবির পাত্র-পাত্রীর চরিত্রচিত্রণে অভিজাত শ্রেণীর মানুষদের মডেল হিসেবে ব্যবহৃত ছবিগুলি আকর্ষণীয় হয়েছিল সত্য, কিন্তু সঠিক ভারতীয় রসসৃষ্টিতে ছিল অপারগ। তাঁর ছবির রামসীতা, শকুন্তলা, রাবণ প্রভৃতি চরিত্রগুলি সজ্জিত মানুষের নাটকীয় অভিব্যক্তিতে পরিপূর্ণ। তাঁর অংকিত শকুন্তলা নিষ্পাপ ভারতীয় রমণী না হয়ে, যৌবনবতী চটুল রমণীতে রূপায়িত হয়েছে। তাই রবিবর্মার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে খুব সহজেই জনসাধারণের মন জয় করতে পারলেও ভারতীশিল্পের ইতিহাসে নিজস্ব কোনও ব্যক্তিত্বের ছাপ রেখে যেতে পারেননি। এর অল্প সময়ের মধ্যেই অবনীন্দ্রনাথের আবির্ভাব।

অবনীন্দ্রনাথ ও রবিবর্মা দুজনেই উচ্চোকুলোদ্ভব। বিত্তবান পরিবারের সন্তান। দুজনেই শ্বেতাঙ্গ শিক্ষকদের কাছে চিত্রবিদ্যার প্রাথমিক পাঠ গ্রহণ করেন। দুজনের চিত্রই উপাখ্যানধর্মী। তা সত্ত্বেও নান্দনিকতার বিচারে অবনীন্দ্রনাথের ছবি কাব্যকল্পনাশ্রীত। সেক্ষেত্রে রবিবর্মার ছবি বাস্তবধর্মী বা Commercial.

অবনীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে দুজন শ্বেতাঙ্গ শিল্পীর কাছে চিত্রবিদ্যা আয়ত্ব করেন। তিনি ইংরেজ শিল্পী পামারের নিকট ড্রয়িং এবং পরিপ্রেক্ষিত এবং ইটালীর শিল্পী গীলান্দীর কাছে জল রং ও তেল রং-এর বিদ্যা আয়ত্ব করেন। একথায় তিনি জীবনের প্রথমস্তরেই পাশ্চাত্য রীতিতে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন। আঠারো শতকের শেষের দিকে কলকাতার সরকারী চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ে বিদেশ থেকে আগত তৎকালিন অধ্যক্ষ E. B. HAVELL-এর সাথে ঘটনাচক্রে তাঁর আলাপ হয়। E. B. HAVELL কোনও উঁচু দরের শিল্পী ছিলেন না। সামান্য কয়েকটি কার্ড অংকন ছাড়া শিল্পজগতে তাঁর আর কিছু দেওয়ার মত ছিল না। অবনীন্দ্রনাথের শিল্পচর্চার কথা জানতে পেরে HAVELL সাহেব সরকারী চারু এবং কারু মহাবিদ্যালয়ে সহকারী অধ্যক্ষের পদ অলংকৃত করার জন্য আহবান জানান। অবনীন্দ্রনাথ নানাধরণের খেয়ালী অজুহাত দেখিয়েও HAVELL-এর অনুরোধ রক্ষা করেন। ঠিক এই সময় HAVELL GRIFFITHS, SISTER NIVEDITA প্রভৃতি মণিষীগণ বিদেশী হওয়া সত্ত্বেও দেশবাসীর অন্তরে ভারতীয় চিত্রকলার উৎকৃষ্টতার সম্পর্কে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছিলেন যে, "ভারতীয় শিল্পীদের ইউরোপীয় চিত্রঐতিহ্যের পিছনে ঘোরা, মরিচীকার পেছনে ঘোরায় সমগোত্রীয়"। অবনীন্দ্রনাথ দেশীয় চিত্রঐতিহ্যে প্রভাবিত ও উৎসাহিত হন। গুজরাটী, রাজস্থানী, মোগল, রাজপুত প্রভৃতি চিত্র প্রদর্শনীকক্ষে প্রদর্শিত হতে থাকে। এই সময় অবনীন্দ্রনাথের হাতে রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক একটি পুঁথি আসে। তিনি কৃষ্ণলীলা বিষয়ক কিছু ছবি আঁকেন। এই ছবিগুলিই ভারতশিল্পের নবজাগরণের প্রথম বার্তাবাহী। অবনীন্দ্রনাথই প্রথম শিল্পী যিনি পাশ্চাত্যের উৎকট বাস্তব রীতিকে পরিহার করে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের বাহ্যরূপের গহবরে নিহিত অতীন্দ্রিয় সত্ত্বার রূপটিকে প্রথম চাক্ষুস করালেন। এই কল্পনাপ্রধান আন্তর রূপের সৌন্দর্যের কথা ভারতবাসী বহুদিন পর্যন্ত বিস্মৃত ছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ বহু আয়াসে, বহু পরিশ্রম করে প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলা যেমন—বৌদ্ধ, রাজস্থানী, মোগল প্রভৃতি চিত্রের মূল ভাবকে আত্মসাৎ করে, চীনা ও জাপানী শিল্পের রীতি বৈশিষ্টকে আংশিকভাবে কাজেলাগিয়ে এমন এক নবরীতির প্রবর্তন করলেন যা তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব। এর জন্য তাঁর কোনও গুরু বা পথ প্রদর্শকের প্রয়োজন হয়নি।

অবনীন্দ্রনাথ এমন এক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, যা হিন্দু ও ব্রাহ্ম ধর্মে উদারপন্থী। তাই কোনওরূপ সংকীর্ণতা তাঁর মনকে স্পর্শ করতে পারেনি। পরে জাপানের বিখ্যাত শিল্পী তাইকামাহিতিশার সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়, ফলে জাপানী ওয়াস পদ্ধতির সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। এবং জাপানী প্রথায় রং তুলির ব্যবহার করতে করতে তিনি নতুনভাবে ওয়াশ পদ্ধতি আবিষ্কার করেন।

তাঁর ছবির ড্রয়িং ছিল বাস্তবঘেঁষা। কম্পোজিশন ছিল আংশিক মিনিয়েচার ধরণের। রংএর জৌলুস সৃষ্টি করতেন ইটালীর ভেনিসিয় ছবির রীতি অনুসরণে। তিনি ছবিতে নানা দেশের নানা কৌশলের সমন্বয় ঘটাতে সক্ষম হয়ে ছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ অঙ্কিত পূর্ববঙ্গের দৃশ্য চিত্রগুলি থেকে একথার সত্যতা প্রমাণিত হয়। ১৯০৩ সালে মোগল চিত্রের অনুসরণে অঙ্কিত 'সাজাহানের মৃত্যু' চিত্রটি তাঁর শিল্পীজীবনের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ও প্রতিভার স্বীকৃতি। এছাড়া 'কথকঠাকুর' 'জাম্পিং জ্যাক' 'ওমর খৈয়াম' 'এ্যারাবিয়ান নাইটস্', আলমগীর, 'এন্ড্রুজ-গান্ধী-রবীন্দ্রনাথ' প্রভৃতি চিত্রগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ছবি ছাড়াও অবনীন্দ্রনাথের শিল্পীজীবনের অন্যতম দিক হোল 'কাটুমকুটুমের সংগ্রহ'। তাঁর কথায় এগুলি হোল আত্মীয়-পরিজন। বিভিন্ন ধরণের গাছ-পালার ডাল থেকে এগুলি তিনি সংগ্রহ করতেন। কোনওটা মনে হোত নর্তকী, কোনওটা মনে হোত ময়ূর কোনওটা বা উড়ন্ত পাখীর মত। এগুলোকে যত্ন সহকারে সংগ্রহ করে, একটার সঙ্গে আর একটা জোড়াতালি দিয়ে বাড়ীতে সাজিয়ে রাখতেন এবং মজার মজার নামকরণ করতেন। এগুলি থেকে অবনীন্দ্রনাথের ভাস্কর্য সুলভ মনের পরিচয় পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে তাঁর শিল্পীজীবনের শেষ চিত্র আঁকেন "সম্মুখে শান্তির পারাবার"। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ তাঁর নশ্বর দেহত্যাগ করেন। এই যুগপ্রবর্তক শিল্পগুরুর তিরোধানে নবীন বাংলার শিল্পজগত এক দুঃসহ অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। তাই আজকের ভারতের তরুণ শিল্পীবৃন্দ পথভ্রষ্ট, দিশেহারা। অদূর ভবিষ্যতে তারা সঠিক পথের সন্ধান পাবে কিনা, আমাদের জানা নেই।

নন্দলাল বসু

পৃথিবীতে কখনও কখনও এমন সব ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে যাঁরা শুধুমাত্র একটা বিশেষ বিষয় নিয়ে চিন্তাভাবনায় জীবন অতিবাহিত করেন না, বরং সেই বিষয় সংশ্লিষ্ট আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয় নিয়েও চিন্তাভাবনায় জীবন অতিবাহিত করে মৃত্যুর পরও হন মৃত্যুঞ্জয়ী। ভারতশিল্পের ইতিহাসে শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু এমনই একটি বিরল ব্যক্তিত্ব। নন্দলাল অবনীন্দ্রনাথের

শিষ্যকুলের শিরোমণি। তিনি শুধুমাত্র বেঙ্গলস্কুলের একজন দিকপাল শিল্পীই ছিলেন না। সমাজমুখী বহু কাজের পথপ্রদর্শকও ছিলেন। তাঁর সমকালীন চিত্রকরদের মধ্যে তিনিই সর্বাপেক্ষা বেশী সংখ্যক চিত্র রচনা করেছেন, শিল্পের বিভিন্ন দিক নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছেন, দেশে-বিদেশে খ্যাতিও পেয়েছেন, শিক্ষক হিসেবে অজস্র গুণমুগ্ধ ছাত্র-ছাত্রীও তৈরী করেছেন। ভারতীয় চিত্র ভাস্কর্যে তিনি যে নতুন পথের সন্ধান দিয়েছেন তা সম্ভব হয়েছে তাঁর পরিবেশ, অবনীন্দ্রনাথ ও নিবেদিতার স্নেহ এবং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য।

নন্দলাল বিহারের মুঙ্গের জেলায় ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ছিলেন দ্বারভাঙ্গা রাজষ্টেটের স্থপতি। মাতা ছিলেন একজন দক্ষ কারু শিল্পী। সুতরাং তাঁর শিল্পীজীবনের প্রাথমিক ভিতটা তৈরী হয়েছিল তাঁর পারিবারিক পরিবেশের গুণে। শৈশবাবস্থাতেই তাঁর বাটির চারপাশের কর্মরত কুম্ভকার বা মৃৎশিল্পীদের কাছ থেকেই তিনি শিল্পসৃষ্টির প্রেরণা লাভ করেন, তাদের কাজ দেখতেন তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করতেন এবং গৃহ পরিবেশে মার কাছে কারু শিল্প বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা লাভ করেন। পরবর্তী জীবনে এই অভিজ্ঞতা তাঁকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে।

প্রথম জীবনে ঈশ্বরীপ্রসাদের কাছে তাঁর শিল্পীজীবনের হাতেখড়ি। কিন্তু এই শিক্ষাপ্রণালী শিল্পীর সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার উপযুক্ত না হওয়ায় চব্বিশ বছর বয়সে বিবাহের তিন বছর পর কলিকাতার সরকারী চারু এবং কারুকলা মহাবিদ্যালয়ে ভর্তি হন। তখনকার দিনে সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলে মেয়েদের শিল্পবৃত্তিকে কেউই সুনজরে দেখতেন না। সরকারী চারু এবং কারুকলা মহাবিদ্যালয়ে তখন অবনীন্দ্রনাথ সহকারী অধ্যক্ষ। অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর তিনি 'কর্ণের সূর্যস্তব', 'কৈকেয়ী মন্থরা', 'আহত হাঁস কোলে সিদ্ধার্থ" প্রভৃতি ছবিগুলি আঁকতে শুরু করেন। এর থেকেই তাঁর হিন্দুধর্মের প্রতি সহজাত গোঁড়ামির পরিচয় পাওয়া যায় এবং পরবর্তী যুগে হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে ছবি আঁকার প্রেরণা পান।

১৯০৯ সালে কলিকাতার সরকারী চারু এবং কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ E. B. HAVELL-র পত্নী Lady Haringhum, শ্রীমতি ডেভিল নাম্নি একজন শিল্পী সহ অজন্তা চিত্র মেরামতের জন্য ভগিনী নিবেদিতা, নন্দলাল ও অসিত হালদারের নাম প্রস্তাব করেন। এঁদের সঙ্গে যোগ দেন কে. ভেঙ্কটাপ্পা এবং সমরেন্দ্র গুপ্ত। অজন্তা চিত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে নন্দলালের ছবিতে ফর্ম, রং ও রেখা নতুনভাবে উচ্চারিত হয়। এতদিন ধরে তিনি wash পদ্ধতিতে ছবি আঁকতেন, এখন Tempera পদ্ধতিতে ছবি আঁকতে শুরু করেন। ফর্ম-এর মৌলকে অস্বীকার করে সাবলীল রেখার টানে

ছবির সমাপ্তি করণে প্রয়াসী হলেন। পরে অজন্তায় ব্যবহৃত মৃত্তিকাজাত রং ব্যবহারের কৌশল আয়ত্ব করলেন। ফলে ভারতীয় ভাস্কর্যের আকৃতি ও বলিষ্ঠ রেখা তাঁর ছবিতে লক্ষ্য করা গেল।

শান্তিনিকেতনের কলাভবনে অধ্যক্ষ হিসাবে যোগদানের পর তিনি হিন্দু শিল্পশাস্ত্র অনুসারে ছবি এঁকে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথকে দেখান। তখন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বলেন "তুমি যদি একটি ধানের শিষের উপর একটি শিশির বিন্দু ঠিক ঠিক ভাবে আঁকতে পার, তবে তা তোমার শিব বা হরপার্বতীর থেকে কোনও অংশে কম হবে না।" আগের থেকেই নক্সায় আর রেখায় তাঁর অসামান্য দখল ছিল। এখন নতুন বিষয় পেয়ে তাঁর তুলিকা শতমুখী হয়ে উঠল। শান্তিনিকেতন এবং তার আশেপাশের বিষয়বস্তু নিয়ে তিনি নতুন উদ্দীপনায় ছবি আঁকতে শুরু করলেন।

অবনীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত নব্য কলারীতিকে নন্দলাল নতুন ভাব সম্পদে ভরিয়ে তুললেন। অবনীন্দ্রনাথ নন্দলাল সম্পর্কে বলেছিলেন "আর্টিষ্ট মাত্রই দুপক্ষ অবলম্বন করে, এক প্রাচীন শিল্পের প্রতি নিবিষ্ট হওয়া আর দ্বিতীয় হচ্ছে প্রাচীনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নতুন নতুন সৃষ্টির পথে এগিয়ে যাওয়া। নন্দলালের শিল্পীজীবন দ্বিতীয় পথে চলেছে।"

ভগিনী নিবেদিতার অনুরোধে নন্দলাল "The Myths of the Hindus and the Buddhist" গ্রন্থে যে চিত্রমালা রচনা করেন সেগুলি তাঁর স্বকীয়তার সঠিক এবং অনবদ্যরূপ। এ ছাড়াও হিন্দু দেবদেবীর চূড়ান্ত রূপ কল্পনার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর অঙ্কিত শৈব চিত্রাবলীতে। প্রাচীনকাল থেকেই ভারতশিল্পের ইতিহাসে শিবদেবতা রূপায়িত হয়ে আসছে নানাভাবে, নানা রূপে, নানা ভঙ্গিতে। এক্ষেত্রে নন্দলাল ভারতীয় ঐতিহ্যকে অনুসরণ না করে সম্পূর্ণ ভিন্নরীতিতে শিবদেবতাকে রূপবন্ধ করেছেন। নন্দলালের শিব হোল চিরনবীন পুরুষ মূর্তি, শাশ্বত যৌবনের প্রতীক। সতীর দেহত্যাগে শিব, বিষপানরত শিব, অন্নপূর্ণার কাছে ভিক্ষার্থী শিব, বর্ষফল গণনায় শিব প্রভৃতি চিত্রগুলি কল্পনার অভিনবত্বে, ভাবের পরিস্ফুটনে, সংযুক্তির বাঁধনে ও ছন্দোময় রেখাঙ্কনে অসাধারণত্বের দাবি রাখে। যার তুলনা শিল্প ইতিহাসে বিরল।

সাবলীল রেখা রচনার রাজা হলেন নন্দলাল। সারা জীবন ধরে যে অসংখ্য রেখাচিত্র এঁকেছেন তার মধ্যে অভিনবত্বে ও বৈচিত্রে গড়ুর মূর্তিখানি অনবদ্য। দেব-দেবীর চিত্র ছাড়াও সামাজিক বিষয় নিয়েও নন্দলাল কিছু ছবি এঁকেছেন তার মধ্যে পিতা কর্তৃক কন্যাকে শ্বশুরালয়ে নিয়ে যাওয়ার চিত্রটি অসামান্য, প্রাচীন গ্রাম বাংলার রূপটি ছবিতে নন্দলাল অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাছাড়া শান্তিনিকেতনের গুহার দেওয়ালে

যে অজস্র দেওয়ালচিত্র তিনি এঁকেছেন তার মধ্যে 'নটীর পূজা' চিত্রটি শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখে। শিল্পীদের ভবিষ্যতের কথা ভেবেই শান্তিনিকেতন কলাভবনে তিনিই প্রথম চারুশিল্প চর্চার সঙ্গে কারুশিল্প চর্চার ব্যবস্থা করেন।

চিত্রাংকন ও হাতের কাজ ছাড়াও গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যগুলির মঞ্চসজ্জা, পোষাকপরিচ্ছদ, মুক্তমঞ্চে যে রাবীন্দ্রিক ভাবধারার পরিচয় আজকের দিনে কোথাও কোথাও দেখতে পাওয়া যায়, শান্তিনিকেতনে তার প্রথম সূচনা করেন শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু। তিনি কায়িকশ্রমের মাধ্যমে শিল্পচর্চায় আগ্রহী ছিলেন। নগণ্য কারিগর বা কারুশিল্পীদের প্রতি ছিল তার সমান দরদ।

নন্দলাল মূলত মূর্তিকার। কোনও দুর্বোধ্যভাব বা জটিলতা তাঁর ছবিতে নেই। তিনি ছিলেন স্বল্পভাষী, পূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন আত্মস্থ প্রকৃতির মানুষ। মনের ভাষা তুলির ডগা ছাড়া বড় একটা প্রকাশ করেননি। তিনি ছিলেন খাটি হিন্দু। ভারতীয় ভাব ও আধ্যাত্মিক চেতনাকে নন্দলাল যেমনভাবে শিল্পমাধ্যমে প্রকাশ করেছেন, তাঁর সমকালিন অন্য কোনও ভারতীয় শিল্পী তাঁর সমকক্ষ পর্যায়ে পেঁছাতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ। উচ্চ আধ্যাত্মিকভাব এবং ভারতআত্মার নিগূঢ় সত্যরূপ প্রকাশে তিনি কখনও কখনও শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথকেও হার মানিয়ে দিয়েছেন।

শান্তিনিকেতনে থাকাকালিন তিনি ছাত্র শিক্ষকের যে মধুর সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন তা তখনকার দিনে অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রেরণা স্বরূপ ছিল। আশ্রমবাসীর সুখ-দুঃখের তিনি ছিলেন একজন অংশীদার, বিপদে আপদে তিনি ছিলেন তাঁদের প্রিয় মাষ্টারমশাই। তাঁর অংকিত অজস্র চিত্রাবলীর মধ্যে 'দময়ন্তীর স্বয়ম্বর', জগাই-মাধাই, জতুগৃহ দাহ, রামায়ণ সিরিজ, উমার তপস্যা, নিমাই, কুরুক্ষেত্র, নটীর পূজা, প্রভৃতি চিত্রগুলি ভারতীয় শিল্পইতিহাসে উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।

১৯৫৬ সালে ভারতশিল্পের প্রবাদপুরুষ এবং আধ্যাত্মিকবাদের প্রবর্তক শান্তিনিকেতনের সবার প্রিয় মাষ্টারমশাই অনন্ত শান্তির পথে যাত্রা করেন। তাঁরই লালন পুষ্ট শান্তিনিকেতনের কলাভবন আজ গুরুর অভাবে আপন অস্তিত্বটুকু বজায় রেখে কোনও রকমে টিকে আছে।

যামিনী রায়

আধুনিক ভারতীয় চিত্রশিল্পের ইতিহাসে শিল্পী যামিনী রায়ের শিল্পের মৌলিকত্ব একটি বিশেষ দিকের ইঙ্গিতবাহী। রবীন্দ্রনাথের মতই তিনি তাঁর সৃষ্টির মাধ্যমে সমস্ত বাঙ্গালীজাতি তথা ভারতবাসীর সভ্যতা

সংস্কৃতির ডালাটিকে বিশ্বের দরবারে শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছেন। তাঁর বৈচিত্র্যপূর্ণ সৃষ্টির মাধ্যমে বাংলার মা-মাটি-মানুষকে মহান ও মহৎ করে তুলে ধরেছেন।

যামিনী রায় ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে বাঁকুড়ার বেলেতোড় গ্রামের এক সম্পন্ন চাষী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা রামতারন রায় সম্পন্ন চাষী হলেও শিল্প মানসিকতার অধিকারী ছিলেন। কথিত আছে, তিনি কখনও কখনও কাগজের উপর নখের আঁচড়ে ছবি আঁকতেন, কখনও বা নরুনের সাহায্যে শ্লেটের উপর আঁচড় কেটে দৃশ্যাচিত্র ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করতেন। তিনি সগর্বে বলতেন "আমরা তখনই শিক্ষিত বলে পরিগণিত হব যখন আমাদের এক হাতে বই অন্য হাতে লাঙ্গল ধরতে শিখব।" শিল্পী যামিনী রায় আজীবন তাঁর শিল্প সাধনায় পিতার এই উক্তিকে যথাযথভাবে মেনে চলার চেষ্টা করেছিলেন।

শিল্পী যামিনী রায় জন্ম থেকেই ছিলেন সৌন্দর্যের পূজারী শস্য-শ্যামল সবুজ পল্লীগ্রামের পরিবেশ তাঁর শিল্পী মনকে প্রথম থেকেই প্রভাবিত করেছিল। মাত্র বারো বছর বয়সে গ্রাম-বাংলার নিভৃত পল্লীতে বসে কিশোর যামিনী রায় শিল্পচর্চায় মনোনিবেশ করেন, এবং একের পর এক ছবি আঁকতে শুরু করেন। অবশেষে ১৯০৪ সালে তিনি কলকাতার সরকারী চারু এবং কারু কলা মহাবিদ্যালয়ে ভর্তি হন। কিন্তু তাঁর রসপিপাসু মন বিদ্যালয়ের চৌহদ্দির মধ্যে আবদ্ধ অবস্থায় সঠিক রসের সন্ধান না পেয়ে চারু এবং কারু কলা মহাবিদ্যালয়ে বার বার নাম লেখালেন আবার নাম কাটালেন। শেষ বারের মত চারু এবং কারু কলা মহাবিদ্যালয়ে যখন যোগ দিলেন, তখন কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন পার্সি ব্রাউন। ব্রাউন সাহেব একদিন লক্ষ্য করলেন কিশোর শিল্পী যামিনী রায় একটি কাগজে চৌকো গর্ত করে সেই গর্তের মধ্যে দিয়ে বৈচিত্রে ভরা রূপলাবণ্যময়ী প্রকৃতিকে ধরবার জন্য তন্ময়। কিশোর শিল্পীর এই তন্ময়তা দেখে তিনি একটু আশ্চর্য হলেন। যামিনী রায় তখন প্রাকৃতির মধ্যে বিচিত্র আকার আকৃতির সমন্বয়ে কম্পোজিশন ধরার চেষ্টায় ব্যস্ত ছিলেন। যামিনী রায় আর্ট কলেজের পাশ্চাত্য একাডেমিক বিভাগে ভর্তি হয়েছিলেন। পার্সি ব্রাউন খুসী হয়ে তাকে আর্ট কলেজের যে কোনও বিভাগে কাজ শেখার অনুমতি দিলেন।

আর্ট কলেজের চার দেওয়াল থেকে বেরিয়ে এসে বাতাসে হিল্লোলিত শ্যাম-দূর্বাদল এবং গ্রাম বাংলার মাটির গন্ধে ভরে উঠল তাঁর শিল্পীমন। অক্লান্ত পরিশ্রমে 'ছায়াসুনিবীড় শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলির" ছবি আঁকতে শুরু করলেন। এর অব্যবহিত পরেই শিল্পী যামিনী রায় পাশ্চাত্য প্রথায় প্রতিকৃতি অংকনে মনোনিবেশ করলেন। Studio-তে বসে ছবি সামনে রেখে

ঘণ্টার পর ঘণ্টা ছবির সঙ্গে আলাপচারিতা চলতে লাগলো। কিন্তু এতো শিল্পীর অন্তরের কথা নয়? এতে চোখ তৃপ্ত হয়, কিন্তু মনের নিভৃতে প্রচ্ছন্ন সৃষ্টির ঠিকানায় তিনি ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। জন্মক্ষণ থেকে যে গ্রামবাংলার সঙ্গে তার পরিচয় তাকে শিল্পের ভাষায় কিভাবে ধরা যায়, এই চিন্তায়ই তিনি বিভোর হলেন।

ইতিমধ্যে শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের ছবি আঁকার কথা জানতে পেরে অবনীন্দ্রনাথের কাছে গেলেন। যদি তার আকুতির কিছু সুরাহা হয়। কিন্তু শিল্পগুরু ভুল করলেন, তিনি যামিনী রায়কে চিনতে পারেননি। অবনীন্দ্রনাথ যামিনী রায়ের প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন "নন্দর কাছে যাও"। কিন্তু যামিনী রায় নিছক আঙ্গিক শিল্পী ছিলেন না, তিনি তখন শুদ্ধ রূপের সন্ধানে দিশেহারা। যিনি মনে প্রাণে শিল্পী তাঁর কাছে রীতি আঙ্গিক তো তুচ্ছ। তিনি নিজেই তো নিত্যনূতন আঙ্গিকের সন্ধান দিতে পারেন। তিনি মনোক্ষুণ্ণ হয়ে শিল্প গুরুর কাছ থেকে বিদায় নিলেন। সাধনা চলতে লাগলো নীরবে নিভৃতে। রূপসী গ্রামবাংলার রূপ একের পর এক ফুটে উঠতে লাগলো পটের উপর। শিল্প রসিকদের স্বীকৃতি পেতে দেরী হোল না। কলারসিকেরা ভাইসরয়ের স্বর্ণপদক শিল্পীর গলায় ঝুলিয়ে দিলেন। ১৯৩৮ সালে কলকাতার বৃটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীটে তাঁর ছবির একক প্রদর্শনী হোল। দেশী বিদেশী সমালোচকদের নজরে পড়লেন। সমালোচকেরা মন্তব্য প্রকাশ করলেন "আমাদের দেশের প্রাচীন পটশিল্পকে যামিনী রায় পুনরুজ্জীবিত করেছেন।" আর ঠিক সেই সময় থেকেই যামিনী রায় হলেন আধুনিক ভারতীয় চিত্র শিল্পীদের অন্যতম।

যামিনী রায়ের ছবির বৈশিষ্ট হোল রং, রেখা ও তার ঘনীভূত আবেগ ও বলিষ্ঠ প্রকাশভঙ্গি। যেগুলো তার সমকালিন শিল্পীদের কাজের মধ্যে সচরাচর চোখে পড়ে না। উপস্থাপনার স্বতন্ত্র রীতির জন্যই তাঁর ছবি প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্যের শিল্প রসিকদের কাছে সমানভাবে সমাদর লাভ করেছে। সম্পূর্ণ দেশজ উপাদানের সাহায্যে তিনি নক্সার এমন এক বলিষ্ঠ রীতির প্রবর্তন করেছেন যার জন্য সমস্ত দেশবাসীর কাছে একজন শ্রেষ্ঠ নক্সাবিদ বা draughts man হিসেবে পরিচিত হয়েছেন। তার ছবিতে ইউরোপীয় আলেখ্য আঁকার পদ্ধতি নেই। অবনীন্দ্রনাথের মিনিয়েচার চিত্ররীতির সঙ্গে কোনও মিল নেই, প্রাচীন ভারতীয় পটচিত্র, উড়িষ্যার পাটাচিত্র, গুজরাটী পট, কালীঘাটের পট, বাঁকুড়ার পাটাচিত্র এবং শিশুশিল্পের সঙ্গে কোথায় যেন একটা সূক্ষ্ম যোগাযোগ রয়েছে। অথচ সব কিছুই তাঁর একান্ত নিজস্ব।

প্রথম দিকে পাশ্চাত্য রীতিতে আঁকা দৃশ্য চিত্রগুলিতে ইউরোপের উত্তর ইমপ্রেসনিষ্ট শিল্পী ভ্যানগঘের অনুসৃত রঞ্জনশৈলী ও করণ কৌশলের প্রভাব

কিছুটা থেকে গেছে বলে মনে হয় তবে কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর ছবির রীতি পদ্ধতির পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। প্রথমে Contour রেখার সাহায্যে জমি ভাগ করে পরে অমিশ্র সমতলীয় রং-এ ভরে দেওয়া, তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তুলির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কাজ উত্তর ইমপ্রেসনিষ্ট যুগের তৃতীয় দিকপাল গোঁগ্যার ছবিতে লক্ষ্য করা যায়। যামিনী রায়ের সঙ্গে গোঁগ্যার কাজের এই সাদৃশ্য বেশ অর্থপূর্ণ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এই দুই মহান শিল্পীর মানসলোকে বহিঃপ্রকৃতি ও পারিপার্শ্বিকের প্রতিফলন ও প্রতিক্রিয়ার এই সংগতি মনে রাখার মত। দুই শিল্পীর ছবিতেই এক ঐশ্বরিক সারল্য ও চিরন্তন স্তব্ধতার আভাস অনুভূত হয়।

অনেকে যামিনী রায়ের ছবির সঙ্গে কালীঘাট পটের সাদৃশ্য দেখতে পান। কিন্তু তুলনামূলক আলোচনায় দেখা যাবে যে যামিনী রায়ের ছবিতে কালীঘাটের পটের সাদৃশ্য কিছুটা এসে থাকলেও তা অনুকৃতি পদ্ধতিতে আসেনি। হয়তো তাঁর অবচেতনে কালীঘাট পটের সামান্য প্রভাব এলেও এসে থাকতে পারে। পুরোনো শব্দ যেমন আধুনিক সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়ে আধুনিক সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তোলে। কালীঘাটের পটশিল্প সেইভাবেই যামিনী রায়ের ছবিকে কিছুটা সমৃদ্ধ করেছে বটে, তবে যামিনী রায়ের ছবির আঙ্গিক উপাদান সম্পূর্ণরূপে তাঁর নিজস্ব।

ইউরোপীয় শিল্পের গুণান্বিত হয়ে কালীঘাট পটের উদ্ভব হয়েছিল। কালীঘাটের পটুয়ারা মূলত প্রতিমা শিল্পী তাই তাদের ড্রয়িং প্রতিমা ঘেষা। কিন্তু যামিনী রায়ের ড্রয়িং অধিক মন্ডনধর্ম্মী,। কাঁথা, পট, লোকশিল্প, পুতুল থেকে এলেও তা সম্পূর্ণরূপে তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিত্বের ধারক ও বাহক। কালীঘাটের পটে লৌকিক বিষয়বস্তু থাকলেও তৎকালিন কলকাতার বাবু সমাজের কেচ্ছা কাহিনী, বিবি বাচ্চাদের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত বিড়াল, চিংড়ি মাছ, চিংড়ি মাছ মুখে বেড়াল ইত্যাদি বিষয়গুলি ব্যবহৃত হয়েছে। যামিনী রার কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই ধরণের বিষয়বস্তু নিয়ে ছবি আঁকলেও তাঁর অধিকাংশ ছবিই লৌকিক এবং গ্রাম বাংলার মানুষ নিয়ে রচিত। যামিনী রায় সম্পূর্ণ দেশজ রংকে টেম্পারা পদ্ধতিতে ব্যবহার করে পত্রজ রেখা বা ক্যালিগ্রাফি রেখার মাধ্যমে সমাপ্ত করেছেন। ফলে তাঁর ছবি দ্বিমাত্রিক রূপ লাভ করেছে। তাঁর মন্ডন ধর্মী আলংকারিক নক্সাগুলিতে প্রাথমিক রং হলুদ, লাল ও নীল রং-এর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় কিন্তু সবুজ বা বেগুনী রং-এর ব্যবহার প্রায় নেই বললেই হয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে পত্রজ রেখার পাশে সরু সাদা বা গোলাপী রেখার বাহারী ব্যবহার ছবির নক্সাকে অনেক বেশী আঁটসাট ডিজাইনে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। কালীঘাটের পটে পটুয়ারা সমস্ত পট জুড়ে ইচ্ছেমত রং ব্যবহার করেছে এবং

ছবির কণ্টুরের প্রথমে গাঢ় পরে আস্তে আস্তে হাল্কা হয়ে মিশে যাওয়া মোলায়েম ডৌলে ছবি ত্রিমাত্রা লাভ করেছে। অনেকটা প্রতিমা শিল্পের আদল এসে পড়েছে। সমস্ত ছবি জুড়ে সমান দৈর্ঘ, প্রস্থ, বিশিষ্ট রেখার ব্যবহার কালীঘাট পটের বিশেষ বৈশিষ্ট।

শিল্পী যামিনী রায়ের আজীবন চিত্র সাধনায় যে অসংখ্য ছবি লেখা হয়েছে, সেগুলি নিম্নলিখিত ভাবে সাজিয়ে নিলে চিত্রকর্মের পরিণতিটুকু বোঝা সহজ হয়ে উঠবে।

(১) (১৯১০—১৯১৮)—শিল্পী যামিনী রায় প্রথমজীবনে পাশ্চাত্য রীতিতে প্রতিকৃতি এঁকেছেন। এঁকেছেন নিসর্গ চিত্র, মা ও ছেলের ছবি। একই সঙ্গে করেছেন ইউরোপীয় শিল্পের অনুকৃতি। এই পর্যায়ের ছবিতে রং তুলি ব্যবহারের দক্ষতা ও ড্রয়িং জ্ঞান ছাড়া আর কোনও বিশেষত্ব নেই।

(২) (১৯২১—১৯৩২)—বরাতি প্রতিকৃতি এঁকেছেন। রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর ছবি ফটো থেকে রং দিয়ে বড় করে এঁকেছেন। আরও এঁকেছেন অজানের ছবি। পরে রীতি পদ্ধতির কিছু পরিবর্তন ঘটে। এই পর্যায়ের ছবিতে দেখা যায় শিব-দুর্গা, গণেশ, মনসা, রাবণ, সাঁওতাল মেয়ের দল, ঢাক বাজিয়ে, পাখি, সিংহ, গরু, বাঘের পিঠে রাজা, বিয়ের শোভাযাত্রা, কীর্তন গায়ক ইত্যাদি।

(৩) (১৯৩২—১৯৪২)—এই পর্যায়ের ছবিগুলি কৃষ্ণরীতি নির্ভর। অধিকাংশ ছবিই মন্ডন ধর্মী। রং হিসেবে ব্যবহার করেছেন গেরিলাল, হরিতাল, পিউড়ি, কাপড় কাচা নীল, কাঁচ কলাপাতার রং, রূপানুযায়ী সমতলীয় প্রথায় রং-এর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। কালির মোটা পত্রজ রেখা দিয়ে পট থেকে রূপকে বিভাজন করার চেষ্টা দেখা যায়। পশ্চাৎপটের জমিতে এবং গয়নায় সাদা কালো ও সিঁদুরের লাল ফুটকি বা অলংকরণ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অবয়বগুলি কোনও কোনও ক্ষেত্রে ছবির ফ্রেমে কেটে বেরিয়ে গেছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ফ্রেম ছবির বিশেষ অঙ্গ হয়ে উঠেছে। কোনও কোনও ছবিতে সিমেট্রির প্রবণতা লক্ষ্যনীয়। ছবিতে পরিপ্রেক্ষিত দেখানোর চেষ্টা একেবারেই নেই। কোথাও গভীরতাও লক্ষ্য করা যায় না। অবয়বগুলির মুখে চোখে কোনও অভিব্যক্তি নেই। শুধু নয়ন শোভন একটি মনোরম নক্সা চোখকে তৃপ্ত দেয়।

(৪) (১৯৩৫—১৯৪০)—পাশ্চাত্য রীতির অনুসরণে ফটো থেকে বড় ছবি করার প্রবণতা। পূর্বতন রীতি অব্যাহত রাখার চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়।

(৫) (১৯৪০—১৯৭০)—এই সময় তিনি আঁকেন অ্যানানসিয়েমন। যীশুর জন্ম, যীশুকোলে মাতা মেরী, খ্রীষ্ট, খ্রীষ্ট ও ফুল, খ্রীষ্ট ও যীশুখ্রীষ্ট,

খ্রীষ্ট ও শিষ্যবৃন্দ, শেষ ভোজন, ক্রুশবাহক যীশু, সন্তজন। ইউরোপের বাইজানটাইন যুগ থেকে শুরু করে গত তেইশ বছর ধরে যে সব ধর্মার্থ ছবি আঁকা হয়েছে, যামিনী রায় তার পুনরাবৃত্তি ঘটিয়েছেন।

(৬) (১৯৫০—১৯৫৬)—এই পর্যায়ে যামিনী রায় এঁকেছেন রমনীর ছবি, পশুর ছবি, মা ও ছেলের ছবি, বৈষ্ণব বিষয়ক ছবি, কীর্তন গায়কের ছবি, পরে বাইজেনটাইন মোজাইক চিত্রের অনুসরণে বাইজেনটাইন আইকনের অনুকৃতি করেছেন। পরে বাঁশের চেপ্টা পাতির উপর কিছু কাজ করেছিলেন। সর্বশেষে তিনি মন্ডন শিল্পের প্রতি আকৃষ্ট হন, ছবি আল্পনাধর্মী হয়ে ওঠে। বিষয়বস্তুর প্রাধান্য কমে আসে ফর্ম কিছুটা অস্পষ্ট হয়। এই পর্যায়ের ছবিগুলি "অরূপবীণা রূপের আড়ালে লুকিয়ে বাজে" গানটির ইঙ্গিতবাহী।

অনেকে পিকাসোর সঙ্গে যামিনী রায়ের তুলনা করে থাকেন। কিন্তু পিকাসো জীবনের বিভিন্ন অবস্থাতেও বার বার তাঁর কাজের মধ্যে নূতন মত ও পথের সন্ধান দিয়েছেন। কিন্তু যামিনী রায় তা পারেন নি। তাঁরই সমসাময়িক শিল্পী জয়নাল আবেদিন ও রামকিঙ্করের ছবিতে নিপীড়িত মানুষ ও বাংলার দুর্ভিক্ষের ছবি দেখেছি। কিন্তু যামিনী রায় তাঁর আনন্দ চাটুজ্জ্যের গলির চৌহদ্দির মধ্যেই আবদ্ধ থেকেছেন। আমরা শুধু তাঁর কাছ থেকে দ্বিমাত্রিক পরিতল সর্বস্য মন্ডনধর্মী অজস্র মনোরম নক্সা পেয়েছি। কিন্তু দেশ, কাল, জাতির পরিপ্রেক্ষিতে কোনও বাস্তব অভিজ্ঞতা বা উপলব্ধির কোনও প্রতিফলন তার ছবিতে একেবারেই অনুপস্থিত। শিল্পী হিসেবে মান সম্মান, অর্থ, প্রতিপত্তি সবকিছু পাওয়া সত্বেও শিল্পজগতে নতুন কোনও দিগ্‌দর্শন তিনি ঘটাতে পারেননি। এইখানেই তাঁর শিল্পীজীবনের ব্যর্থতা।

১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে শিল্পী যামিনী রায় রূপের জগত থেকে অরূপের জগতে লীন হয়ে যান।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মানুষের মন দ্বিমুখী। মনের একটি দিক বাইরের জগতের সঙ্গে যোগসূত্র রচনা করে। অন্য দিকটি থাকে নীরবে, নিভৃতে, কেউ যার পরিচয় পায় না। আপনার মনে সে কাজ করে যায়। বুদ্ধি ও চেতনার আড়ালে থেকে প্রয়াসহীন অভিব্যক্তিতে অন্তরের অন্তস্থল থেকে কখনও কখনও বেরিয়ে আসে এমন সব চিন্তা, ভাবনা, সুর-ছন্দ, যা পরিচিত জগতের ধরা ছোঁয়া গন্ডির বাইরে। রবীন্দ্র চিত্রকলা মনের অজ্ঞাত গহনতল থেকে বেরিয়ে আসা প্রয়াসহীন অভিব্যক্তি। আজীবন সৌন্দর্যের পূজারী রবীন্দ্রনাথ শেষ বয়সে

আঁকলেন এমন সব ছবি, যা প্রচলিত অর্থে সুন্দর নয়। লালায়িত বিন্যাসও নয়, লাবন্যযুক্তও নয়। সারাজীবন ধরে কবিতা, গদ্যে, গানে তাঁর অসাধারণ মরমীয়া প্রকাশ তৃপ্তি না পেয়ে জীবনের শেষ দিকে অতৃপ্ত প্রতিভার ক্ষীণ রশ্মিটুকু ছড়িয়ে পড়লো চিত্রশিল্পে যা আমাদের কাছে অনন্য সাধারণ। তাঁকে চেষ্টা করে এগুলিকে রূপ দিতে হয় নি। আপনা হতেই সেগুলি রূপায়িত। তাঁর সৃষ্টিরাজী সম্পর্কে শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন "It is unique, his art was very own, nor can one explain it to ones satisfaction, neither can the critic fit it into a set theory, of his own or bring it under a distinct catagory."

রবীন্দ্র চিত্রকলা হোল তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্বের ধারক এবং বাহক। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের কোন শিল্পরীতির সঙ্গে তার কোনও মিল নেই। এমনকি অনুকরণ যোগ্যও নয়। সেই জন্য প্রথমে আমাদের দেশে তাঁর ছবি কোনও মূল্য পায়নি। কিন্তু বিদেশে তাঁর ছবির প্রদর্শনার পর সমালোচকরা বললেন "সবে আমরা যা ভাবতে শিখেছি, শিল্প আন্দোলনের তলায় তলায় নতুনকে পাবার যে আপ্রান চেষ্টা চলছে tagore কত সহজে কত সুন্দর ভাবে আমাদের কাছে উপস্থিত করলেন। এখন তা সাধারণের কাছে বোধগম্য হবে না। সভ্যতা ও সংস্কৃতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যে দিন আমাদের চিন্তা শক্তি উন্নত হবে, সেই দিন আমরা এই সমস্ত ছবির রসগ্রহণে সমর্থ হব।"

শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু বললেন—"রবীন্দ্রনাথ যা কিছু এঁকেছেন তার মধ্যে ছন্দের স্পন্দন আর প্রাণশক্তি এমনই প্রবল যে, এ যুগের খ্যাতিমান শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের রূপাকৃতিও তার পাশে কতকটা নিষ্প্রভ মনে হয়। রবীন্দ্র চিত্রকলায় আর কোনও গুণ যদি নাও থাকে। শুধু প্রানশক্তির জোছনায় তার থেকে চোখ ফেরানো অসম্ভব।"

নিজের সাহিত্য রচনার কাটাকুটি থেকেই রবীন্দ্রনাথের ছবি আঁকা শুরু। কবিতা বা গান রচনার সময় প্রায়ই তাকে কাটাকুটি করতে হোত। কিন্তু লেখার মাঝে কাটাকুটি তিনি পছন্দ করতেন না। তাই যতক্ষণ পর্যন্ত না সেগুলি একটি ছন্দোময় আলংকারিক রূপ লাভ করে ততক্ষন পর্যন্ত তিনি সেগুলোর উপর কলম চালাতেন, জীবন সায়াহ্নে সেগুলোর উপর বিলিয়ে দিলেন মায়া, মমতা ও ভালবাসা। জিজ্ঞেস করলে বলতেন "ছবি হোল আমার শেষ বয়সের প্রিয়া, তাই নেশার মত আমাকে পেয়ে বসেছে।" নিজের সৃষ্টি রাজীর উপর তাঁর বিশ্বাস ছিল না। বলতেন "লিখতে পারি তা আমি জানি তার উপর আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে, কিন্তু আঁকা সম্বন্ধে আজও আমার সংশয় যায় না। আমি তো নন্দলাল বা অবনের মত আঁকতে শিখিনি। তাই অনেক সময় মনে হয় ওটা আমার পথ নয়।"

রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি abstract বা বিমূর্ত নয়। Primitive বা আদিম শিল্পের সমগোত্রীয় বললেও ভুল বলা হবে। কারণ বিমূর্ত শিল্পের মধ্যে থাকে শিল্পীর মনের অস্থিরতা। এই অস্থিরতা আসে শিল্পীর অভিজ্ঞতা ও পরিবেশ থেকে। রবীন্দ্র চিত্রকলার মধ্যে এই ধরনের অস্থিরতার স্পর্শ একেবারেই নেই। Form কে ভেঙ্গে form এর সত্তাকে অস্বীকার করে এক নৈরাজ্যে পদার্পণ করাই হোল বিমূর্ত উপলব্ধি। রবীন্দ্রচিত্রকলা এই উপলব্ধি বহির্ভূত। বুদ্ধির দ্বারা এগুলির রসআহরণ সম্ভব নয়। এগুলির রসানুভূতির সম্পূর্ণটাই নির্ভর করছে ভাললাগার উপর। অপরপক্ষে আদিম মানুষের চেতনা ও অবচেতনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বুদ্ধি চেতনা ও অবচেতনার যথেষ্ট পার্থক্য আছে। গুহাবাসী মানুষের চিত্রকলা তাদের জীবিকার সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত। সুতরাং তা পারিপার্শ্বিকতা ও অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি মাত্র। কিন্তু রবীন্দ্রচিত্রকলা আবর্তিত হয়েছে অবচেতনের গহন থেকে। গুহাবাসী মানুষ চেষ্টা করেছে দৃশ্যবস্তুর বাস্তবানুগ চিত্ররচনায় আর রবীন্দ্রনাথ সর্বকালের সর্ব যুগের চিত্ররীতিকে উপেক্ষা করে সৃষ্টি করেছেন চিত্রশিল্পের এক নতুন জগত। অনেকে রবীন্দ্র চিত্রকলাকে শিশুশিল্প বা Child Art এর সমগোত্রীয় মনে করেন। Child Art শিল্প ব্যাকরণের বাঁধাধরা গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নয়। যুক্তিহীন সহজ সরল অকাট্য। রবীন্দ্রনাথও শিল্প ব্যাকরণের ধারে কাছে যাননি। রবীন্দ্র চিত্রকলা যতই সহজ সরল হোক না কেন তা এমন এক শক্তিশালী ডিজাইনে (Design) এ আবদ্ধ যা Child Art-এ সচরাচর দেখা যায় না। আজীবন শিল্প সাধনায় তাঁর এই Sence of Design-এর ভিতটি পাকাপোক্ত ছিল।

শিশুবয়স থেকেই রবীন্দ্রনাথ বাঁধাধরা রুটিন মাফিক কাজ পছন্দ করতেন না। বিশ্বপ্রকৃতির লীলাময় রূপ ও সুরের ছন্দে তিনি জীবনের প্রথম থেকেই শিক্ষালাভ করেছিলেন। তিনি মনে করতেন যা কিছু এলোমেলো অতিসাধারণ তুচ্ছ জিনিষগুলোকে যদি একটি বিশেষ ছন্দে ছন্দিত করা যায়, তাহলে তার মধ্যে একটা মূল্যবোধ অবশ্যই জেগে উঠবে। তাঁর নিজের অঙ্কিত ছবি সম্বন্ধে তিনি নিজেই বলেছেন "এগুলি এক একটি কবিতা বা শ্লোক রেখার বন্ধনে বাঁধা, নেই কোনও ঘটনা বা বর্ণনা, আছে শুধু লীলায় রচিত ছন্দিত রূপ।"

রবীন্দ্রনাথ নিজের অঙ্কিত ছবির কোনও দিন কোনও নামকরণ করতেন না। এ প্রসঙ্গে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে এক চিঠিতে লিখেছিলেন : "ছবির নাম দেওয়া একেবারেই অসম্ভব, জানি রূপের সঙ্গে নাম না জুড়ে দিলে পরিচয় সম্বন্ধে আরাম বোধ হয় না। তাই আমার প্রস্তাব এই, যাঁরা ছবি দেখবেন বা নেবেন তাঁরা অনাম্নীকে নিজেই নাম দান করুন, দেখবেন যেখানে

এক নামের বেশী আশা করেননি সেখানে বহু নামে সেগুলি নামজাদা হয়ে উঠেছে। রূপসৃষ্টি পর্যন্ত আমার কাজ, তারপর নামসৃষ্টি অপরের।"

রবীন্দ্রনাথের ড্রয়িং দেখে অনেকে মনে করে থাকেন তাঁর ড্রয়িং দুর্বল। তাই তাঁরা মত প্রকাশ করেন যে কোনও রূপ চেষ্টা চরিত্র ব্যাতিরেকে রাতারাতি চিত্রকর হওয়া যায় নাকি? রবীন্দ্রনাথও রাতারাতি শিল্পী হননি। বস্তুতঃ চিত্রে ড্রয়িংএর প্রয়োজন ততখানিই, সাহিত্যে ব্যাকরণের জ্ঞান যতখানি। বৈয়াকরনিক মাত্রই যেমন সাহিত্যিক নন তেমনি শুদ্ধ ড্রয়িং জানা মানেই শিল্পী হওয়া নয়। চিত্রশিল্প কেবল ড্রয়িং সর্বস্ব নয়। রূপজ্ঞান, বস্তুজ্ঞান, কল্পনা ও রচনার সমন্বয়ে চিত্রকলার সৃষ্টি। সৃষ্টিশীল লেখকের রচনায় ব্যাকরণ নতুনভাবে সৃষ্টি হয়। তেমনি সৃষ্টিশীল শিল্পীও ড্রয়িংকে নতুন রূপ দেন। ভাষা নতুনভাবে প্রাণ পায়। রবীন্দ্রনাথের চিত্রেও ড্রয়িং জ্ঞানের অভাব বোধ হয় না যাঁরা ড্রয়িং নিয়ে বেশী ভাবিত হন, তাঁরা স্মৃতি থেকে বা কল্পনা থেকে কিছু আঁকতে পারেন না। তাঁরা আঁকার বস্তুকে সামনে রেখে ছবি আঁকেন। কিন্তু কল্পনা ছাড়া সৃষ্টির কাজ অসম্ভব। রবীন্দ্র চিত্রকলায় কল্পনাটাই মুখ্য বাকি সব গৌণ। রবীন্দ্র চিত্রকলা মনোযোগ সহকারে দেখলে দেখা যাবে বাস্তবের মডেলিং, পরিপ্রেক্ষিতকে তিনি একেবারেই আনেননি। কিন্তু ছবিতে প্রচণ্ড গতি ও শক্তিকে তিনি দেখাতে সমর্থ হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর নিজস্ব বক্তব্য হোল "People often ask me about the meaning of my picture. I remain silent, even as my pictures are. It is for them to express and not to explain."

আলোচনার সুবিধার জন্য রবীন্দ্র চিত্রকলাকে ভিন্ন ভিন্ন তিনটি স্বতন্ত্র স্তরে ভাগ করে নেওয়া যেতে পারে। প্রথমতঃ প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং লতা পাতার ছবি। দ্বিতীয়তঃ কাল্পনিক মানুষের প্রতিকৃতি। এবং তৃতীয়তঃ অদ্ভুত সমস্ত জন্তু জানোয়ার।

তাঁর অঙ্কিত লতাপাতার ছবিগুলি স্বভাবতই আলংকারিক ও ছন্দোময়। এগুলি বাস্তবে দেখা কোনও গাছপালা, প্রাকৃতিক দৃশ্য বা ফুলের ছবি নয়। শুধুমাত্র রং রেখার ছন্দোময় লীলায়িত রূপ। কখনও কখনও রং-এর উপর কলম চালিয়েছেন। যার ফলে একটা অসম্ভাব্য Texture বা বুননের সৃষ্টি হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের অজস্র ছবির তিন ভাগের দুইভাগ হোল কাল্পনিক প্রতিকৃতি। বাস্তবে দেখা কোনও মানব মানবীর প্রতিকৃতি এগুলি নয়। এগুলো সম্পূর্ণরূপে কাল্পনিক। প্রতিকৃতি সুলভ সমস্ত গুণই আছে কিন্তু অনুকরণ নয়, বরং আদর্শোচিত। তারা যেন বিশেষ মুহূর্তে কিছু বলতে চায়, গুমরে ওঠা বেদনায় অথবা চাপা কান্নায়। কোনওটাতে আছে

ক্রুরতা, কোনওটাতে আছে কৌতুক মিশ্রিত হাসি। কোথাও হয়তো মুখাকৃতিকে করেছেন বিভৎস্য, কুৎসিত। কোথাও আবার অভিব্যক্ত করেছেন ব্যঙ্গোক্তি, কোথাও ফুটে উঠেছে অন্তর্দ্বন্দ্বের বিশেষ চাহনি। কখনও তারা হয়ে উঠেছে রহস্যময়ী, কখনও বা হয়ে উঠেছে আদিম কোমলতা ও পেলবতায় পরিপূর্ণ। প্রতিটি প্রতিকৃতির চোখের অভিব্যক্তি প্রায় একই। এ প্রসঙ্গে শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু জিজ্ঞেস করেছিলেন "গুরুদেব আপনার কতকগুলো ছবিতে দেখা যায় চোখ মুখের একই আদল, এর কারণ কি?" উত্তরে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "নতুন বৌঠানের (কাদম্বরী দেবী) চোখ দুটো এমনভাবে আমার মনে গেঁথে আছে যে, মানুষের ছবি আঁকতে গেলেই আমার সামনে জ্বলজ্বল করে, কিছুতেই ভুলতে পারি না। তাই সব ছবিতেই বোধ হয় তাঁরই চোখের আদল চলে আসে।"

জন্তুজানোয়ারের যে সব ছবি তিনি এঁকেছেন সেগুলোর সাথে বাস্তবের জন্তুজানোয়ারের কোনও মিল নেই। এগুলো তাঁর কল্পলোকে বিচরণরত জন্তুজানোয়ার। অথচ কোনওটিই নিষ্প্রাণ নয়, সৃষ্টিমূলক প্রাণ স্পন্দনে মুখর। এই জন্তুজানোয়ারগুলি তাঁর খামখেয়ালি মনের সৃষ্টি। এগুলিতে আকৃতির প্রাধান্য ততটা নেই যতটা ভাবের প্রাধান্য রয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের ছবি হোল জাত-কুলশীল থেকে মুক্ত। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ভারতে বসবাসকারী রুশ শিল্পী নিকোলাস রোয়েরিখকে তিনি লিখেছিলেন "শব্দ কেবল সত্যের একটা বিশেষ দিককে প্রকাশ করে, যেখানে শব্দ বাহিত ভাষা প্রবেশের অধিকার পায় না, চিত্রের ভাষা সেই সত্যে সহজেই পৌঁছাতে পারে।"—এই উপলব্ধিই তাঁর চিত্ররচনার অন্যতম প্রেরণা।

সারনাথের বুদ্ধ

গুপ্তযুগের শিল্পকলা সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে যমুনা তীরবর্তী মথুরা এবং গঙ্গাতীরবর্তী সারনাথের কথা স্বভাবতই আলোচনায় এসে পড়ে। কিন্তু এই যুগে মথুরা এবং সারনাথ দুটি বিশেষ শিল্পকেন্দ্র হলেও বিশিষ্টতার দিক দিয়ে দুই শিল্পকলার মধ্যে বেশ কিছুটা পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। মথুরার ভাস্কর্য শিল্প ভাবলাবণ্যে ও বৈচিত্র্যে কিছুটা স্থূল, আদিমভাবাপন্ন, দেবভাবের অভাব পরিলক্ষিত হয়। অপর পক্ষে সারনাথের ভাস্কর্য অতি মানবীয় শ্রীতে পরিপূর্ণ। শিল্পীরা তাঁদের বহুদিনের অভিজ্ঞতা, ধ্যান-ধারণা এবং ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গের যথাযথ প্রয়োগে, এই অসাধ্য সাধন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এখন প্রশ্ন হোল ষড়ঙ্গ কি? কামশাস্ত্র টীকাকার যশোধর পণ্ডিতকৃত শ্লোকটি হোল ঃ—

রূপভেদাঃ প্রমানাণি ভাবলাবণ্য যোজনম্
সাদৃশ্যং বর্ণিকাভঙ্গ ইতি চিত্র ষড়ঙ্গকম্ ॥

রূপভেদ ঃ—দৃশ্যমান জগত সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান।
প্রমাণ ঃ—দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যথাযথ মাপ বা গড়ন কৌশল।
ভাব ঃ—মূর্তির মধ্যে অনুভূতির সঞ্চার বা ভাবের প্রকাশ।
লাবণ্য ঃ—মূর্তিতে জীবনী শক্তির আভাস।
সাদৃশ্য ঃ—দুই ভিন্নধর্মী বস্তুর আকারগত মিল।
বর্ণিকাভঙ্গ ঃ—উপকরণের যথাযথ ব্যবহার।

গুপ্তযুগের শিল্পভাস্কর্যে ষড়ঙ্গের যথাযথ ব্যবহার হয়েছে যার পরিচয় পাওয়া যায় অজন্তার চিত্রাবলীতে এবং সারনাথের ধর্মচক্র প্রবর্তন মুদ্রায়। যোগাসনে বসা বুদ্ধমূর্তিটিতে। এখানে বুদ্ধের মুখমণ্ডল ডিম্বাকৃতি, শামুকের খোলের মত চুল, কান দুটি প্রায় কাঁধ অবধি লম্বা, ঠোঁটে স্তিমিত হাসি, চোখ দুটি স্তিমিত, আঁখিপাত পূর্ণাঙ্গ ও পেলব। চোখ দুটি হতে যেন করুণার বারি ঝরে পড়ছে। বৃষস্কন্ধ, গোমুখাকার দেহকাণ্ড, সিংহকটি, গজশুণ্ডাকার হস্ত। অর্থাৎ মূর্তিটিতে শিল্পীরা অসাধারণ দক্ষতা ও নৈপুণ্যের সঙ্গে অতিমানবীয় শ্রী অর্পণ করায় পাথরে অতিন্দ্রীয় সত্তার রূপারোপ সম্ভব হয়েছে। মূর্তিটি এতই অসাধারণত্ব লাভ করেছে যার দিকে তাকালে ক্ষণিকের জন্য বাহ্যিক জগত ভুল হয়ে যায়, শ্রদ্ধায় মাথা নত

হয়ে আসে। রচনাশৈলী কত উন্নত পর্যায়ে পেঁছিালে, এরূপ সৃষ্টি সম্ভব তা ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়। মূর্তিটি চাক্ষুস করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :—

বসেছেন পদ্মাসনে, প্রসন্ন প্রশান্ত মনে
নিরঞ্জন আনন্দ মূরতি ;
দৃষ্টি হতে শান্তি ঝরে স্ফুরিছে অধর পরে
করুণার সুধাহাস্যজ্যোতি।

বুদ্ধের মাথার পিছনে বিরাট অলংকৃত জ্যোতিচক্রের ব্যবহার যুক্তিযুক্ত। জ্যোতিচক্রের মধ্যস্থলে অর্থাৎ বুদ্ধের মাথার পেছনের অংশটি সমতল হওয়ায় তাঁর শান্তসমাহিত মুখমণ্ডলের শোভা যেন অনেকখানি বৃদ্ধি পেয়েছে। ডান হাতে বরাভয় মুদ্রা, মনে হয় যেন কঠিন তপস্যার পর তিনি ভক্তদের উপদেশ দিচ্ছেন। বেদীর নীচে অনেকগুলি মানুষের মূর্তি খোদিত আছে। এই মূর্তিগুলির আকৃতি তুলনামূলকভাবে কিছুটা ছোট। বুদ্ধের মহিমা ও বিরাটত্বকে প্রকাশ করার জন্যই এই মূর্তিগুলিকে ছোট করে দেখানো হয়েছে।

মহাবল্লীপুরমের 'বানর পরিবার'

গুপ্ত শিল্পের দেশব্যাপী অনন্যতা শুধু বহির্ভারতেই ছড়িয়ে পড়েনি, পরবর্তী ভারত শিল্পকেও এমন এক সীমানায় পেঁছে দিয়েছে যার তুলনা শিল্প ইতিহাসে আছে কিনা সন্দেহ। এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ আমরা পাই অষ্টম শতকে দক্ষিণ ভারতের পল্লব শিল্পে, একাদশ শতকে খাজুরাহোর মন্দির ভাস্কর্যে এবং ত্রয়োদশ শতকের কলিঙ্গ শিল্পে।

গুপ্তযুগের অবসানের অব্যবহিত পরেই দক্ষিণ ভারতে পল্লব রাজাদের আনুকুল্যে এক মহৎ শিল্পরীতির আবির্ভাব ঘটে যা শিল্পইতিহাসে পল্লব শিল্পকলা নামে প্রসিদ্ধ। পল্লব স্থাপত্যশিল্পকে দুভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্যায়ে পাহাড়ের গা কেটে মণ্ডপ তৈরী ও মন্দির স্থাপত্যের প্রবর্তন, এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ মন্দির স্থাপত্যের সূচনা। পল্লব বংশের রাজা মহেন্দ্র বর্মন ও নরসিংহ বর্মন মহামল্ল প্রভৃতি রাজাদের আনুকুল্যে এই মন্দির স্থাপত্য সমূহের পত্তন ঘটে।

পল্লব রাজাদের স্থাপত্য শিল্পগুলি বর্তমান মাদ্রাজ শহর থেকে ৩০ মাইল দক্ষিণে সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত। স্থানটির নাম মমল্লপুরম বা মহাবল্লীপুরম্। এখানকার ভাস্কর্যশিল্পের রীতি বৈশিষ্টকে তিন ভাগে ভাগ করে নেওয়া যেতে পারে। প্রথমতঃ রথ বা রথম নাম্নি মন্দির গায়ে খোদিত ভাস্কর্য, দ্বিতীয়তঃ একটি খোলা পাহাড়ের গা কেটে রীলিফ ধর্মী

ভাস্কর্য এবং তৃতীয়তঃ মুক্ত পরিবেশে একটি আস্ত পাথর খোদাই করে স্বয়ং সম্পূর্ণ ভাস্কর্য অর্থাৎ Free standing sculpture.

রাজা নরসিংহ মহামল্লের তৈরী মহাবল্লীপুরমের মণ্ডপগুলির মধ্যে বরাহ ও মহিষাসুর মণ্ডপটি বিশেষ প্রসিদ্ধ। মণ্ডপগুলির অপূর্ব অলংকরণ এবং খোদিত ভাস্কর্যের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ। রথ বা রথমের মধ্যে পঞ্চপাণ্ডব নামাঙ্কিত পাঁচটি রথ সহ সাত আটটি রথমন্দির মহাবল্লীপুরমের ঐতিহাসিক মূল্যকে অনেকখানি বর্দ্ধিত করেছে। যদিও ভাস্কর্য শিল্পগুলিতে গুপ্তযুগের প্রভাব সুস্পষ্ট, তবুও এখানকার মন্দির ভাস্কর্যে একটি লাবণ্যযুক্ত দীর্ঘায়িত ভাব, এখানকার ভাস্কর্যের বিশিষ্টতা প্রমাণ করে। ভাস্কর্যগুলির সাবলীল গতিভঙ্গিমা লক্ষ্য করার মত। শিল্পীরা দৈনন্দিন সমাজ জীবনকেও শৈল্পিক আওতা থেকে বাদ দেননি। উদাহরণ স্বরূপ মন্দির গাত্রে খোদিত মহিষাসুরমর্দিনী দেবীদুর্গার মূর্তিটি উল্লেখযোগ্য। মূর্তিটি গতানুগতিকতার দোষে দুষ্ট নয়। দেবী রণোন্মত্ত অবস্থায় মহিষাসুরের দিকে ভীষণভাবে তাকিয়ে আছেন। সিংহের তেজোদীপ্তভাব এবং গতিবেগ প্রকাশের জন্য দেবীর বক্ষের কাঁচুলীর প্রান্তভাগ বাতাসে দোদুল্যমান। গদা হস্তে অসুর ভীষণভাবে দেবীদুর্গা এবং দেবসেনাপতিদের দিকে এগিয়ে আসছেন। প্রতিটি মূর্তিই জীবন্ত। সমস্ত মন্দিরগাত্রটি জুড়ে একটি যুদ্ধংদেহী ভাব ফুটে উঠেছে। আবার কোনও মন্দিরের দেওয়ালে দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণ গোদহনের দৃশ্য। এখানে শিল্পী গোদহনের রিলিফধর্মী ভাস্কর্যটিতে বাৎসল্য রসসৃষ্টিতে সফল হয়েছেন। আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় গার্হস্থ জীবনের প্রতিচ্ছবিটি সুস্পষ্ট।

মহাবল্লীপুরমের উন্নত শিল্পের নিদর্শন পাওয়া যায় একটি বিশাল শিলাখণ্ডে উৎকীর্ণ গঙ্গাবতরণের মহান দৃশ্যটি থেকে। এ ভাস্কর্যটি রীলিফ ধর্মী। এখানে শিল্পী তার অসাধারণ পর্যবেক্ষণ শক্তি ও আত্মদৃষ্টিকে কাজে লাগিয়েছেন। পশু মানুষে সার্বজনীন প্রেমভাবের বিকাশ এইভাবে আর কোথাও শিল্পে স্থান পেয়েছে কিনা সন্দেহ। নাগনাগিনীরা জোড় হাতে গঙ্গা স্রোতে ভেসে যাচ্ছে। আকাশে ভাসমান দেবদেবীর মূর্তি। অরণ্যের মৃগ, হাতির দল তাদের শাবকসহ উপস্থিত। ঋষি গঙ্গাপুজায় রত। কপট বিড়াল চন্দ্রায়ন ব্রতের অনুষ্ঠান শেষ করে ইঁদুর ধরবার চেষ্টায় ব্যস্ত। পল্লব শিল্পীরা অসাধারণ নৈপুণ্যের সঙ্গে প্রতিটি খুঁটিনাটি জিনিষ এই মহান দৃশ্যপটে তুলে ধরতে সমর্থ হয়েছেন।

আস্ত একটি শিলাখণ্ড কেটে যে পূর্ণাঙ্গ ভাস্কর্যের কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি তা হোল 'বানর পরিবার' ভাস্কর্যটি। একটি পশু পরিবারের অতিতুচ্ছ একটি সাধারণ ঘটনাকে শিল্পী তার অসাধারণ প্রতিভার স্পর্শে

এত জীবন্ত করে তুলেছেন যে পৃথিবীর যে কোনও শ্রেষ্ঠ আধুনিক ভাস্কর্য শিল্পের সঙ্গে এর তুলনা করা যেতে পারে। বানরী পা ছড়িয়ে বসে আছে, কোলে বাচ্চা বানরটি আপন মনে খেলা করছে। বানর বানরীর পিছন থেকে আধবসা অবস্থায় বানরীর মাথা থেকে উকুন বেছে দিচ্ছে। পরিকল্পনার অভিনবত্বে ভাবের পরিস্ফুটনে এবং ভাস্কর্যসুলভ গুণাগুণ বিচারে এই শিল্পটি শ্রেষ্ঠত্বের দাবি রাখে। তখনকার শিল্পীরা পশুর দেহ সংস্থান সম্বন্ধে যে গভীর জ্ঞান অর্জন করেছিলেন তা আজকের দিনে আমাদের কাছে বিস্ময়ের উদ্রেক করে। দুর্ভাগ্য এই যে এই অসাধারণ প্রতিভাধর ভাস্করদের নাম আজও আমাদের কাছে অজ্ঞাতই থেকে গেছে।

ইলোরার অষ্টভুজ নটরাজ

অষ্টম শতাব্দীর দিকে পুরাতন চালুক্য অঞ্চলটি রাষ্ট্রকূট রাজাদের অধীনে ছিল। ঐ সময়ে রাষ্ট্রকূট রাজা প্রথম কৃষ্ণ ইলোরার কৈলাসনাথ মন্দিরটি নির্মাণ করেন। স্থাপত্য পরিকল্পনা এবং অতি উন্নতমানের ভাস্কর্যের দিক দিয়ে কৈলাসনাথ মন্দিরটি জগৎ বিখ্যাত। একদিকে ২৮০ ফুট ও অপরদিকে ১৩০ ফুট একটি আস্ত পাহাড় কেটে মন্দিরটি নির্মিত। একটি বিশাল বেদীর উপর মূল মন্দিরটি দাঁড়িয়ে আছে। বেদীর নীচে সারি সারি হাতির দল অপূর্ব দক্ষতা ও নৈপুণ্যের সঙ্গে খোদাই করা হয়েছে। মনে হয় যেন পুরো মন্দিরটি হাতির পিঠের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মন্দিরের স্তম্ভ ও কক্ষগুলি অপূর্ব অলংকরণ ও ভাস্কর্যে শোভিত। এখানে রামায়ণের কাহিনী অবলম্বন করে শিল্পীরা যে ভাস্কর্যগুলি পাথরের গায়ে খোদাই করেছেন সেগুলিতে গতি ও শক্তি এতই প্রবল যা যেকোনও উন্নত ভারতীয় ভাস্কর্যের সঙ্গে তুলনীয়। কৈলাসনাথ মন্দিরের সব থেকে উল্লেখযোগ্য মূর্তিটি হোল নৃত্যের ভঙ্গিমায় দাঁড়ানো অষ্টভুজ নটরাজের মূর্তিটি। পরিকল্পনার অভিনবত্বে এবং গঠন নৈপুণ্যে এ মূর্তিটি ভারতীয় ভাস্কর্যশিল্পের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলা যেতে পারে। নটরাজ এখানে বাম পায়ের উপর ভর দিয়ে ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে আছেন। আটটি গজশুণ্ডাকার হস্ত, ডানদিকের একটি হাতে একটি ত্রিশূল আলতোভাবে ধরা আছে। দুটি হাত ভগ্ন অবস্থায় অন্যান্য হাতগুলিতে নানাধরণের মুদ্রা। মূর্তিটিতে ভারতীয় মূর্তিশিল্পের লক্ষণগুলি সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান। দেহে অলংকারের বাহুল্য নেই। শিল্পীরা মুখমণ্ডলে একটি স্নিগ্ধ হাসির ভাব ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। নটরাজের নৃত্যের গতিছন্দটিকে বাস্তবসম্মত করে তোলার জন্য গতিশীল কয়েকটি সাপের আকৃতি বিক্ষিপ্তভাবে খোদাই করেছেন। নটরাজের মহিমাকে গুরুত্ব দিয়ে নীচে ও উপরে কয়েকটি ক্ষুদ্রাকৃতি মূর্তি খোদাই করা হয়েছে।

সম্পূর্ণ মূর্তিটি একটি ছোট্ট বেদীর উপরে দণ্ডায়মান। ভাবে লাবণ্যে ও ছন্দোময় বৈচিত্রে মূর্তিটি এত বেশী জীবন্ত যে একবার দেখলে আশা মেটে না। বার বার দেখতে ইচ্ছে করে। মনে হয় চোখ বন্ধ করে মূর্তিটি স্পর্শ করলে নৃত্যের ছন্দটি অনুভব করা যাবে। "কালের কপোলতলে শুভ্র একবিন্দু জল"এর মত এই অপূর্ব ভাস্কর্যটি যুগ যুগ ধরে মানুষের সৌন্দর্য পিপাসাকে চরিতার্থ করে চলেছে।

খাজুরাহোর সুরসুন্দরীর মূর্তি

দশম ও একাদশ শতাব্দীতে মধ্যভারতে চান্দেল্লবংশীয় রাজাদের আনুকূল্যে যে মন্দিরশৈলী নির্মিত হয়েছিল তা ভারতশিল্পে একটি বৃহৎ স্থান অধিকার করে আছে। বর্তমান ছত্রপুর জেলার খাজুরাহো গ্রামে এই রাজাদের আনুকূল্যে প্রায় ৮০টি মন্দির নির্মিত হয়েছিল। বর্তমানে তার মধ্যে ২৫।৩০টি মন্দির অক্ষত অবস্থায় আছে। বাকি মন্দিরগুলি কালের কপোলতলে, রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে নষ্ট হয়ে গেছে। চান্দেল রাজারা হিন্দু এবং জৈন এই দুই ধর্মমতে বিশ্বাসী ছিলেন। তাই এখানকার মন্দিরগুলিতে দুই ধর্মের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

মন্দিরগুলি একটি বেদী বা অধিষ্ঠানের উপর নির্মিত। মন্দিরগুলিতে গর্ভগৃহ, অন্তরাল, মণ্ডপ, অর্ধমণ্ডপ এবং আচ্ছাদিত প্রবেশপথ পরপর সাজানো। মূল মন্দিরের চারটি কোনে চারটি ছোট ছোট মন্দির আছে। স্তম্ভগুলি এবং প্রবেশপথ সুন্দর কারুকার্যে শোভিত। মন্দিরের সম্মুখ ভাগ থেকে সিঁড়ি মূলমণ্ডপ পর্যন্ত উঠে গেছে। সেই জন্য মন্দিরটি অনেক বেশী উচ্চতাবিশিষ্ট বলে মনে হয়। মন্দিরের শিখর দেশের মনোরম ভাস্কর্য শিল্পগুলি মন্দিরের শোভা অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছে।

মধ্যভারতের স্থাপত্য ভাস্কর্যের যে স্বকীয়তা, খাজুরাহো মন্দিরের স্থাপত্য ভাস্কর্যে সেই স্বকীয়তা পূর্ণমাত্রায় বজায় আছে। তবে উড়িষ্যার মন্দির ভাস্কর্যের সমকক্ষ পর্যায়ে পৌঁছাতে পারেনি। হিন্দু মন্দিরগাত্রে নানা ধরনের হিন্দু দেবদেবী এবং দেবলীলাকে অবলম্বন করে ভাস্কর্যগুলি খোদিত হয়েছে এবং জৈন মন্দিরগুলিতে জৈন সাধু তীর্থংকর ও নানা কৃচ্ছ সাধনের কাহিনী অবলম্বনে ভাস্কর্যগুলি খোদিত হয়েছে।

এখানকার খোদিত ভাস্কর্যগুলির মধ্যে 'সুরসুন্দরী' মূর্তিগুলি, যদিও সমসাময়িক ভারতীয় ভাস্কর্যের তুলনায় ত্রুটিপূর্ণ, তবুও শিল্প সৌন্দর্যের দিক থেকে এগুলির প্রশংসা না করে থাকা যায় না। মূর্তিগুলিতে দেখা যায় কোথাও কোনও নায়িকা পত্র রচনায় ব্যস্ত। কেউ বা বেণী বাঁধছে, কেউ দর্পণের সামনে সাজসজ্জায় রত, কেউ কপালে কুমকুমের টিপ পরছে,

কেউবা পায়ের কাঁটা তুলছে। এদের সাজসজ্জা, পোষাক-পরিচ্ছদ, অঙ্গভঙ্গিমা নাগরিকাসুলভ, লাস্যময়ী। প্রত্যেকেই নিজেদের উদ্ভিন্ন যৌবন সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন। বহুদিনের অভ্যাসে অভ্যস্ত তাদের ভ্রূভঙ্গি ও বিলোল কটাক্ষপাত। তাদের চোখে ঘন কাজলের রেখা, সকলেই অলংকার বিভূষিতা। ক্ষণিক নজরেই তাদের পায়ের অলক্তক দাগ যেন চোখে পড়ে। এরা সকলেই মৃগগতি সম্পন্না, চকিত নয়না হরিণীর মত, মনে হয় যেন পৃথিবীর মাটির সঙ্গে এদের কোনও সম্পর্ক নেই। মূর্তি রচনার সময় শিল্পীরা বাস্তব জগত অতিক্রম করে অপার্থিব সৌন্দর্য সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন। নায়িকা মূর্তিগুলি অতিভঙ্গ ভঙ্গিমার আতিশয্যে এবং অতি লীলায়িত ছন্দের ভারে অনেক বেশী যান্ত্রিক বলে মনে হয়, ফলে শিল্পীরা সঠিক শিল্পরস সৃষ্টিতে অপারগ হয়েছেন বলে মনে করা যেতে পারে।

কোণারকের বাদ্যরতা নারীমূর্তি

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পুরী জেলার সমুদ্রতীরে নির্মিত কোণারকের সূর্যমন্দিরে উড়িষ্যা শিল্পকলার চরম নিদর্শন লক্ষ্য করা যায়। একটি সূর্য রথের পরিকল্পনায় মন্দিরটি নির্মিত। মন্দিরটির গর্ভগৃহ এবং জগমোহন একই সঙ্গে অবস্থিত। গর্ভগৃহ ও জগমোহনের দুদিকে ২৪টি সূর্যরথের চাকার সারি। সম্মুখভাগে সাতটি অলংকারযুক্ত বেগবান অশ্ব সূর্য রথটিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। সূর্যরথের চাকার উপর যে অলংকৃত খোদাইয়ের কাজ আছে তার নজীর পৃথিবীর শিল্প ইতিহাসে বিরল। ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয় যে, শিল্পীরা পাথর ক্ষুদে কি অসাধ্য সাধন করেছেন। মনে হয় যেন খুব সূক্ষ্ম তুলিকার স্পর্শে শিল্পীরা নিশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ করে এই ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করেছেন। জগমোহনের উপরে তিনটি প্রধান প্রধান স্তরে মানুষ-প্রমাণ ইষৎ লীলায়িত ভঙ্গিমায় খোদিত নৃত্য-গীত সমন্বয়ে বাদ্যরতা নারী মূর্তিগুলি এ যুগের ভাস্কর্য শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। পাথরের উপর এরূপ জীবন্ত খোদাই কাজ আর কোথাও সম্ভব হয়েছে কিনা সন্দেহ।

বহুপূর্বে উড়িষ্যা এবং দক্ষিণ ভারতে দেবদাসী প্রথার প্রচলন ছিল, যারা তাদের জীবন যৌবন সমস্ত কিছুই দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করত। নৃত্য গীতাদির মাধ্যমে দেবতাকে সন্তুষ্ট করাই ছিল তাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। কোণারকের উক্ত মূর্তিগুলির পরিকল্পনা সেই দেবদাসী প্রথা থেকেই নেওয়া হয়েছে। মূর্তিগুলি যেন দেবদাসীদেরই পাথুরে রূপ। প্রতিটি মূর্তিই ছন্দোময়। এদের সাজসজ্জার থেকে অলংকার বিভূষিতা বলে মনে হয়। কেউ মৃদঙ্গ বাজাচ্ছে, নৃত্যরত ভঙ্গিমায় কারও হাতে করতাল, উদ্দাম উচ্ছল যৌবন যেন শরীরের স্তবকে স্তবকে ফুটে উঠেছে। চোখে মুখে স্বর্গীয় ভাব ব্যক্ত হয়েছে। চুলের পরিপাটি বিন্যাস, দেহের ভঙ্গিমা ও সাজসজ্জা থেকে

মনে হয় দেবতার সামনে এদের নূপুর নিক্কন যেন যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। মূর্তিগুলির সামনে দাঁড়ালে মন চলে যায় সেই অতীত যুগে, সেই মুক্ত-নূপুরের সুমধুর শব্দ আমাদের দেহমনকে স্পর্শ করে যায়, ক্ষণিকের জন্য শিহরণ জাগায়।

———

ইউরোপের নবজাগরণ ও তিন দিকপাল

ইউরোপে রেঁনেসা শুরু হয়েছিল ১৫ শতকে। রেঁনেসা কথার অর্থ হোল নবজাগরণ। ঠিক যে মুহূর্তে ইউরোপের মানুষ ভাবতে শিখলো যে, তারা আর মধ্য যুগে বাস করছে না, অর্থাৎ মধ্য যুগের অন্ধ ধর্মীয় কুসংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে মানুষ যখন একটি স্বতন্ত্র পথে পা বাড়ালো যে পথটি জ্ঞানের আলোকে সমুদ্ভাসিত, তখনই রেঁনেসার শুরু। তাই এ যুগের মানুষ হোল আত্মসচেতন ও অন্যহিতৈষী বা Humanist, ইটালীর বিখ্যাত কবি পেত্রার্ক তাঁর অমর লেখনীর মাধ্যমে রেঁনেসার আগমনী গাইলেন। তিনিই প্রথম দেব-দেবী, ঈশ্বর ও শাস্ত্রঅধ্যয়ণ, ভাষা সাহিত্য, ইতিহাস, ধর্মনিরপেক্ষ, দর্শনতত্ত্ব, ইত্যাদি আধিভৌতিক (meterialistic) বিষয়াদির অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। এইভাবে যে নতুন বুদ্ধিজীবীর দল তৈরী হ'ল, তারাই পরবর্তী রেঁনেসার ভিত্তিকে দৃঢ়তর করলেন। যত সহজে এই কথা উচ্চারণ করা গেল তত সহজে এই বনেদটি তৈরী হয়নি, অনেক বাধা বিপত্তি এসেছে। নানা উত্তেজনার মুহূর্তে এই সময়কার মানুষ দিনযাপন করেছে। বিস্ময়ের কথা এই যে, মধ্যযুগকে অস্বীকার করে সে যুগের মানুষ যে classical যুগকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হয়েছে তা কিন্তু ঠিক ঠিক ভাবে কার্যকরী হয়নি। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে, রেঁনেসা আধুনিক জন্মদাতা হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। তবে সৃজনশীলতার ক্ষেত্রে এ যুগটি ঘিরে যে বৈভবের পরিচয় দিয়েছে তার সমকক্ষ দৃষ্টান্ত আগের যুগে পাইনি। চিত্র, ভাস্কর্য এবং স্থাপত্য এ যুগের সৃষ্টকর্মের একটা বৃহৎ অংশ জুড়ে রয়েছে। শুধু তাই নয় এ যুগের সৃষ্টিধররা সকলেই ছিলেন দিকপাল শিল্পী এবং সকলেই ছিলেন উত্তুঙ্গ প্রতিভার অধিকারী। তাঁদের বিশেষত্ব এই যে তাঁরা নানা বিষয় নিয়ে অনুশীলন, অনুধাবন ও পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন, চিত্রিরা সকলেই ভাস্কর্য, স্থাপত্য, চিকিৎসা, দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁরা তাঁদের প্রতিভার স্বাক্ষর অম্লান রেখেছেন। একাধিক বিষয়ে সমধিক জ্ঞান থাকায় চিত্র-ভাস্কর্যে পূর্ণ মাত্রায় তা প্রতিফলিত হয়েছে। যেমন—চিকিৎসা বিজ্ঞানের দেহ-সংস্থান জ্ঞান চিত্র-ভাস্কর্যের নায়ক-নায়িকাদের দেহ বিভঙ্গের অন্যতম মহিমা এনেছে তার সঙ্গে শিল্পীদের ব্যক্তিগত মৌলিকতা যুক্ত হয়ে চিত্র-ভাস্কর্য শুধু মাত্র অভিনব হয়ে ওঠেনি, সুবিধার এমন জায়গায় পেঁাচেছে যে পরবর্তী দুশ বছরের শিল্প-

ইতিহাসকে নির্ধারিত করে দিয়েছে। দুশ বছরের মধ্যে সমগ্র ইউরোপে আর কোনও শিল্পীই জন্মগ্রহণ করেননি, যাঁরা নাকি এই সৃষ্টকর্মকে অতিক্রম করে যেতে পেরেছেন।

এই যুগের তিনজন দিকপাল হলেন—

(ক) লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি, (খ) মাইকেলেঞ্জেলো বুয়োনারতি,

(গ) সামাৎ সিও র‍্যাফেল।

(ক) লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি

ইউরোপের চিত্র শিল্পের নবজাগরণ যুগে যে সমস্ত দিকপাল শিল্পীর আবির্ভাব ঘটেছিল, তাদের মধ্যে তিনজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথম যিনি ইউরোপের শিল্পাকাশে উদিত হয়ে যুগ যুগ ধরে আলো বিকিরণ করেছেন তিনি হলেন লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি। আসল নাম লিওনার্দো। ১৪৫২ খৃষ্টাব্দে ফ্লোরেন্সের ভিঞ্চি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ভিঞ্চি গ্রামে জন্মগ্রহণ করার জন্যই তাঁকে বলা হয় লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি। তাঁকে আমরা উন্নত নবজাগরণ যুগের একজন প্রতিভাধর শিল্পী বলে মনে করি। তিনি শুধুমাত্র একজন প্রোথিতযশা চিত্রশিল্পীই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন সুদক্ষ স্থপতি, ভাস্কর, ইঞ্জিনিয়ার, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, ডাক্তার, নক্সাবীদ। প্রতিভার এমন কোনও দিক ছিল না যা তাঁর সাধ্যাতীত ছিল। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের গোপন ও গভীর রহস্য সন্ধান ছিল তাঁর জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। পিতামাতা এবং বৈমাত্রেয় ভাই বোনদের স্নেহ ভালবাসা হতে তিনি জন্ম থেকে ছিলেন বঞ্চিত। কিন্তু এসব তাঁকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারেনি। তাঁর কৌতুহলী মন পাহাড়ের গঠন প্রণালী, নদীর উৎস, ফুলের বর্ণবৈচিত্র, উড়ন্ত পাখীর পক্ষ সঞ্চালন, মানুষের মুখের ছাঁচ, কীট-পতঙ্গের জীবন রহস্য এ সমস্ত নিয়ে তিনি সর্বদাই ব্যস্ত থাকতেন। দুটি বিষয়ের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় ভালবাসা ছিল। একটি গণিত, অপরটি সংগীত। পিতা চেয়েছিলেন তিনি পড়াশুনা করে কোনও সম্মানিত পেশা গ্রহণ করবেন। কিন্তু তাঁর কিশোর বয়সের প্রবণতা লক্ষ্য করে শেষ পর্যন্ত ফ্লোরেন্সের তদানিন্তন খ্যাতিমান শিল্পী এনড্রিয়া ডেল ফেরোসিওর কাছে শিল্প শিক্ষানবীশ হিসেবে পাঠালেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ১৬ বছর। এইভাবেই তাঁর শিল্প সাধনার শুরু।

লিওনার্দোর অধিকাংশ চিত্রে দেখতে পাওয়া যায় পিরামিডের মত কম্পোজিশন। চিত্ররচনার সময় তিনি দুহাতে কাজ করতেন, ড্রয়িং করতেন বাম হাত দিয়ে। আর রং ব্যবহারের সময় জন ভ্যাস আইখকে অনুসরণ করতেন। অর্থাৎ রং এর স্তরের উপর স্তর চাপিয়ে চাপিয়ে ছবির জৌলুস সৃষ্টি

করতেন যার ফলে মনে হোত ক্যানভাসের মধ্যে কোথাও হীরা বসানো আছে, যার রশ্মি ক্যানভাসের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

তিনি প্রচুর পরিমাণে মডেল study করতেন। নিজের হাতে শব ব্যবচ্ছেদ করে মানব মানবীর শরীর সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান লাভ করেছিলেন, কিন্তু চিত্র রচনার সময় মডেল সম্পর্কে ব্যক্তিনিরপেক্ষতা বজায় রাখতেন, তাঁর ড্রয়িং দেখলেই বোঝা যায় যে জীবন্ত বস্তু সম্পর্কে তাঁর কি অসাধারণ জ্ঞান ছিল। প্রাকৃতিক বস্তুকে চিত্রে উপস্থিত করার সময় বস্তুগুলিকে নিজের মত করে উপস্থিত করা ছিল তাঁর চরিত্রগত বৈশিষ্ট।

ছবিতে তিনি আনতে চেয়েছিলেন জ্ঞান ও অনুভূতি, তা তাঁর সৃষ্টিরাজী থেকেই জানা যায়। পূর্বেই বলা হয়েছে যে মানব শরীরের অস্থি-সংস্থান সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ছিল অপরিসীম কিন্তু চিত্রে অস্থিসংস্থানকে তিনি নতুন রূপ দান করেন। এ যেন লিওনার্দোর নিজস্ব সৃষ্ট Anatomy, অথচ কোথাও এতটুকু কমবেশী না। আর বাস্তবেও তা সম্ভব না। তিনি বলতেন "Learn Anatomy, and forget it"

তাঁর ছবির আর এক বৈশিষ্ট হোল chairescuro অর্থাৎ আলোছায়ার বিন্যাস, আলোছায়ার বৈপরিত্য ও ছবিতে রহস্যময় ভাব ফুটিয়ে তুলতে পৃথিবীতে তাঁর সমকক্ষ শিল্পী কেউ ছিলেন বলে জানা যায় নি। তাঁর অঙ্কিত অধিকাংশ ছবিতেই নৈসর্গিক দৃশ্য দেখানোর চেষ্টা করেছেন। সে দৃশ্যচিত্রে শুধুমাত্র বাহ্যিক রূপকে তুলে ধরা হয় নি। প্রাকৃতিক রহস্যের অনাদি অনন্তকালকে তিনি তাঁর অমর তুলির টানে মূর্ত করে তুলেছেন। বিজ্ঞান সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি না থাকলে এরূপ সৃষ্টি কোন প্রকারেই সম্ভব নয়।

প্রথম দিকের উল্লেখযোগ্য চিত্রগুলির মধ্যে "Adoration Mage" (১৪৮১-৮২) চিত্রটি অসম্পূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। ফ্লোরেন্সে থাকাকালিন তিনি এই চিত্রটি শুরু করেন পরে অসম্পূর্ণ অবস্থায় তিনি মিলানে যাত্রা করেন। যে দেওয়াল চিত্রটির জন্য তিনি আজও পৃথিবীতে অমর হয়ে আছেন তা হোল "Last Supper", বিষয়বস্তুটি বাইবেলের একটি মহান ঘটনা থেকে নেওয়া হয়েছে। চিত্রটি মিলানের শান্তা মেরিয়া ডেনাগ্রেসির দেওয়ালে আজও অক্ষত অবস্থায় আছে। এখানে মানবত্রাতা যীশু তাঁর দ্বাদশ শিষ্যদের নিয়ে শেষ বারের মত সান্ধ্য ভোজনে বসেছেন। বাইরে বিজন প্রান্তরে ক্লান্ত সন্ধ্যার করুণ আভাস ফুটে রয়েছে। হঠাৎ যীশু বলে উঠলেন, "Verily I say to you, That one of you shall betray me।" শান্ত, সমাহিত, ক্ষমাসুন্দর যীশুর ঐ কথাটি অকস্মাৎ যেন বজ্রপাতের মত ধ্বনিত হোল। কালের গতি রুদ্ধ হোল, স্তব্ধ ক্ষুব্ধ আতঙ্কিত শিষ্যবর্গের মধ্যে শুধু একটি

কথাই গুঞ্জরিত হতে লাগলো "প্রভু সে কি আমি ? মানব ইতিহাসের এই দারুণতম নাটকীয় মুহূর্তটি লিওনার্দো তাঁর অসাধারণ প্রতিভার স্পর্শে জীবন্ত করে তুলেছেন।

সংবর্ত এবং সুষমার এমন মহান প্রকাশ পৃথিবীর আর কোনও শিল্পীর তুলিকাস্পর্শে জীবন্ত হয়ে ওঠেনি। বারজন শিষ্যের চারটি দল, প্রতিটি দলই স্বয়ং সম্পূর্ণ, কিন্তু অভিব্যক্তি প্রকাশের দিক থেকে প্রত্যেকে পরস্পরের সঙ্গে সংহতিবন্ধ। কেন্দ্রে ভগবান যীশুর অবিচল মূর্তি। লিওনার্দো প্রতিটি মূর্তির হাতের ভঙ্গিমা এবং মুখের অভিব্যক্তির সাহায্যে মানুষের হৃদয়াবেগকে নিপুণভাবে প্রকাশ করেছেন।

মানুষের মূর্তি ছাড়াও তুচ্ছাতিতুচ্ছ বস্তুগুলি এই মহানাটকের বিশেষ অঙ্গ। অমঙ্গলের প্রতীক হিসেবে টেবিলের উপর উল্টানো নুনের পাত্র, রুটির টুকরো, মাছের কাঁটা, ফল ও মদের পাত্রের উপর প্রতিফলিত হচ্ছে আলো সব কিছুই যেন নিজ নিজ ভূমিকায় অবতীর্ণ। এগুলির নিখুঁত নিটোল উপস্থাপনা থেকে বোঝা যায় যে লিওনার্দো একজন অসাধারণ নিঃসঙ্গ জীবনের Still life) ছবি আঁকিয়ে ছিলেন। ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে ছবিটি সমাপ্ত হওয়ার পর তিনি "চিত্রশিল্পের অনুশীলন" নামে একটি বৃহৎ গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করেন।

প্রতিকৃতি অংকনের দিক দিয়েও লিওনার্দো একজন অসাধারণ শিল্পী ছিলেন। একসময় ফ্লোরেন্সে ডেল গিওকনডো নামে একজন বিত্তবান ফ্লোরেন্স বাসীর স্ত্রী ম্যাডোনা লিসার একটি প্রতিকৃতি আঁকবার বায়না নিয়েছিলেন। ম্যাডোনা লিসা বা মোনালিসার এই বিশ্ববিখ্যাত প্রতিকৃতিটি বর্তমানে প্যারিসের লুভ চিত্রশালায় সংরক্ষিত আছে। এটি একটি স্বাস্থ্যবতী মহিলার প্রতিকৃতি। এই ধরণের প্রতিকৃতি আগে অংকিত হয়নি। এখনও নেই বলা যেতে পারে। ম্যাডোনা লিসার হাত দুটি কোলের উপর আড়াআড়ি ভাবে ন্যস্ত। ঠোঁটে রহস্যময় মিষ্টি হাসি। অনেকটা গ্রীক শিল্পের "Archaic Smile-এর মত। এটাকে বলা যেতে পারে "Momentary Smile ; প্রশস্ত ললাটে চূর্ণ অলক গুচ্ছ উড়ন্ত ওড়নার অংশবিশেষ দেখা যাচ্ছে। পিছনে নৈসর্গিক দৃশ্যাবলী সুবিধার আদিকে প্রতীকায়িত করে।

মোনালিসা অনুভূতি সম্পন্না একটি জীবন্ত নারী। ছবিটি সামনে থেকে মনে হয় যেন দর্শকদের দিকে তাকিয়ে আছে, হাসছে। এই হাসির উৎস জানা নেই। হাসিতে বিদ্রুপ, কৌতুক ও বিষাদের সমন্বয় ঘটেছে। লিওনার্দো প্রতিকৃতির পুঙ্খানুপুঙ্খ না এঁকে অনেকখানিই দর্শকদের উপর ছেড়ে দিয়েছেন। ঠোঁটের কোণ চোখের কোণ দুটি অস্পষ্ট। কি যেন এক কুহকে আচ্ছন্ন। মোনালিসার হাসির উৎস জানা নেই বলেই ছবিটি যতবার দেখি ততবার নতুন লাগে।

ছবিটির কম্পোজিশন পিরামিডাকার, মনে হয় মোনালিসা যেন ছাদের উপর দুহাতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ছবিতে বামের দিগন্তরেখা দক্ষিণের দিগন্তরেখা থেকে নীচু তাই মোনালিসাকে দীর্ঘাঙ্গীনী ও ঋজু দেহা বলে মনে হয়।

লিওনার্দোর অন্যান্য চিত্রগুলির মধ্যে 'Madona of the Rocks' এবং 'Virgin of the Rocks' চিত্র দুটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর অঙ্কিত 'Embryo in the womles' কালিকলমের ড্রয়িং থেকে তাঁর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-ভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। Madona of the Rocks চিত্রটি সম্বন্ধে তিনি বলেছেন যে "Four shortening Constitutes the greatest achievement of painting and children should be expressed by shoftness and plump roundness and dimpling।" লিওনার্দো এই ছবিটিতে খুব জোরালো রং ব্যবহার করেছেন।

অবশেষে ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দে এই আজন্ম অকৃতদার ঋষি তুল্য শিল্পীর জীবন দীপ নির্বাপিত হয়। তাঁর কাছে বিজ্ঞান সম্পূর্ণ নতুন উদ্দীপনায় নতুনভাবে উচ্চারিত হয়। তিনি মনে করতেন "প্রতিভা কোনও দেবদত্ত শক্তি নয়, এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।" তাঁর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং অসাধারণ পর্যবেক্ষণ শক্তির যে পরিচয় আমরা পাই তা সমস্ত শিক্ষা জগতের প্রতি একটা খুব বড় আস্ফালন।

(খ) মাইকেলেঞ্জেলো বুয়োনারতি

ইউরোপীয় রেঁনেসার শিল্পাকাশে যে তিনজন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব ঘটেছিল মাইকেলেঞ্জেলো তাঁদের মধ্যে দ্বিতীয়। শিল্প জগতের দুই অবিনশ্বর পুরুষ লিওনার্দো এবং মাইকেলেঞ্জেলোর দাম পৃথিবীর শিল্পজগত কোনও দিন কোনভাবেই অস্বীকার করতে পারবে না। সম সাধনায় দুটি মানুষের মধ্যে যতখানি বৈপরীত্য থাকা সম্ভব উভয়ের মধ্যে তা ছিল। বয়সে মাইকেলেঞ্জেলো লিওনার্দোর চেয়ে তেইশ বছরের ছোট ছিলেন। লিওনার্দোর মৃত্যুর পর তিনি আরও পঁয়তাল্লিশ বছর বেঁচে ছিলেন। তিনি লিওনার্দোর মতই মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা চেয়েছিলেন পুত্র বিভিন্ন ভাষায় পান্ডিত্য লাভ করে কোন উচ্চতর পেশায় নিযুক্ত হবেন। কিন্তু পুত্রের শিশু বয়সের শিল্প প্রবণতা লক্ষ্য করে তাকে ফ্লোরেন্সের তৎ-কালিন শিল্পী ডমেনিকো গিয়ালানডুলার কাছে শিল্প শিক্ষার নিমিত্ত প্রেরণ করেন।

লিওনার্দো ছিলেন ভবঘুরে বাউন্ডুলে প্রকৃতির। তিনি বিলাসবাসন পছন্দ করতেন না। এক দেশ থেকে আর এক দেশ ঘুরে বেড়িয়েছেন। কিন্তু কোনও

দেশই তাঁর আপন হয়নি। জীবনে পাঁচ বছর মাত্র শিল্প সাধনা করেছেন।
বাকি জীবন বিজ্ঞান ও সংগীতচর্চায় কাটিয়ে দিয়েছেন। অনেক সময় তাঁর শিক্ষা সাধনা, বিজ্ঞান সাধনার কাছে গৌণ হয়ে গেছে।

কিন্তু শিল্প ছিল মাইকেলেঞ্জেলোর কাছে ধ্যান, জ্ঞান, স্বপ্ন। তিনি ছিলেন ভাগ্যের হাতের নিষ্ঠুর ক্রীড়নক। কঠোর কষ্টসাধন করতে পারতেন। জীবনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মানুষের কাছে প্রতারিত হয়েছেন, উৎপীড়ন অবহেলা সহ্য করেছেন কিন্তু তা তার শিল্প সাধনার প্রতিবন্ধক হয়নি। তিনিও ছিলেন লিওনার্দোর মত আজীবন অকৃতদার। বিবাহের কথা বললে বলতেন "আমার পরিণয় হয়েছে শিল্পের সঙ্গে, তার জ্বালাতেই অস্থির, এরপর আবার বন্ধন"? ধর্মবিশ্বাস ছিল তাঁর কাছে সব কিছুর উর্ধ্বে।

অনেকেই লিওনার্দোর সঙ্গে তার তুলনা করে থাকেন। সমসাধনায় দুজনই ঋষিতুল্য ছিলেন। কিন্তু মাইকেলেঞ্জেলোর সর্বপ্রথম এবং সর্বশেষ পরিচয় হল, তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাস্কর। কখনও কচিৎ রং তুলির দ্বারস্থ হয়েছেন তবে তা সম্পূর্ণ তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে। এ বিষয়ে তাঁর মত হোল "চিত্রশিল্প মেয়েদের কাজ, যতক্ষণ না হাতে ছেনী হাতুড়ী থাকে ততক্ষণ কিছুই ভাল লাগে না।"

চিত্র শিল্পের ক্ষেত্রে দুজনের দৃষ্টিভঙ্গির কিছুটা পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। লিওনার্দোর কল্পনার নায়ক নায়িকারা সুষমা, পেলবতা ও লালিত্যে পরিপূর্ণ। অপর পক্ষে মাইকেলেঞ্জেলোর ছবির নায়ক নায়িকারা সবল, সুঠাম, পেশী হিল্লোলীত। তারা সবাই যেন আদিম মানুষের দৈহিক গড়নে তৈরী হয়েছে। চিত্রশিল্প সম্বন্ধে তিনি বলেছেন "চিত্রশিল্পের মধ্যে যদি ভাস্কর্যের গড়ন কৌশল ও নিটোলতা আসে তবে তা হয় অপরূপ, আর ভাস্কর্য যদি চিত্রাঙ্কনের কৌশল অনুসরণ করে তবে তা হয় কদর্য।"

লিওনার্দোর কাছে মানুষ মহাবিশ্বের প্রসঙ্গ ক্ষেত্র, আর মাইকেলেঞ্জেলোর কাছে মানুষ বিশ্ব সৃষ্টির কেন্দ্র বিন্দু। এই দুই মহান শিল্পীর একদিক দিয়ে মিল ছিল। সারা জীবন ধরে দুজনেই লিখেছেন অজস্র। লিওনার্দো লিখেছেন বৈজ্ঞানীক পরীক্ষা নিরীক্ষার ফল ও সমাধান। আর মাইকেলেঞ্জেলো লিখেছেন অজস্র কবিতা যা আবেগে মর্মস্পর্শী। এই দুই মহান শিল্পীর যখনই কোথাও দেখা হয়েছে, সে দেখা খুব সুখের হয় নি। কেউ কাউকে সহ্য করতে পারতেন না। দুজনেই শব ব্যবচ্ছেদ করেছেন। মানব দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নিখুঁত গড়ন কৌশল আয়ত্ব করে তা চিত্রে, ভাস্কর্যে প্রতিফলিত করেছেন। লিওনার্দো ভাস্কর্যের তুলনায় চিত্রচর্চায় বেশী সময় কাটিয়েছেন, কিন্তু মাইকেলঞ্জেলো জীবনে দু-একবারই রং তুলি হাতে নিয়েছিলেন বাকি জীবন ভাস্কর্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অতিবাহিত করেছেন। যে চিত্রটি তাকে পৃথিবীর

অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাস্করের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রকর হিসেবে স্বীকৃতি এনে দিয়েছে সেটি হল বাইবেলের মহান ঘটনাকে কেন্দ্র করে ওল্ড টেস্টামেন্টের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। এখানে মাইকেলেঞ্জেলো ওল্ড টেস্টামেন্টের কাহিনীটিকে নয় ভাগে ভাগ করেছেন। (১) ঈশ্বর আলো ও আঁধারকে বিভক্ত করছেন, (২) ঈশ্বর জ্যোতিমণ্ডল সৃষ্টি করছেন, (৩) ঈশ্বর ধরিত্রীকে আশীর্বাদ করছেন, (৪) আদমের সৃষ্টি, (৫) ইভের সৃষ্টি (৬) ইভ কর্তৃক আদমকে প্রলুব্ধ ও আদমের পতন, (৭) নোয়ার ত্যাগ, (৮) মহাপ্লাবন, (৯) নোয়ার প্রমত্ততা, এ ছাড়া আছে অজস্র অপ্সরা, অপ্সরী কিন্নর কিন্নরীর দল। চিত্রটি সমাপ্ত করতে তাঁর সময় লেগেছিল মোট চার বছর। চিত্রটির Surface division এবং imotional quality মনোমুগ্ধকর। এখানে মাইকেলেঞ্জেলো এঁকেছেন মানুষ। আর যে কি মানুষই নয় তিনি এঁকেছেন। ৩৪৩টি মানুষের মূর্তি সহ এই চিত্রটিতে কেউ সুপ্তোত্থিত কেউ বিস্মৃত, কেউ চিন্তিত, কেউ বা পাঠরত। সব নায়ক নায়িকারাই নগ্ন, নিটোল, পেশী হিন্দোলীত। এ যেন এক নন্দনকানন, মাইকেলেঞ্জেলোর অমর তুলির সাথে মূর্ত। জীবনের শেষের দিকে Sistine chapel এর গীর্জার দেওয়ালে তিনি আর একটি চিত্র অংকন করেছিলেন। ছবিটির নাম হোল The Last Judgement বা শেষ বিচার। সারা জীবন ধরে মানুষের কাছে যে তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। ছবিটির স্তবকে স্তবকে সেই তিক্তঅভিজ্ঞতার আভাস নিখুঁতভাবে ফুটে উঠেছে। আকাশে দেবদূতেরা ভেরী বাজাছে, উর্ধে শশ্রু বিশিষ্ট ভগবান যীশু, সেন্টজন প্রভৃতি। বাম দিকে পুণ্যাত্মারা স্বর্গে যাচ্ছেন এবং ডানদিকে পাপীরা নরকে যাচ্ছেন। ছবিটি সম্পূর্ণ করতে প্রায় আট বছর সময় লেগেছিল। ভাস্কর্যের নিখুঁত গড়ন কৌশলে মূর্তিগুলি আঁকা হয়েছে। দ্বিমাত্রিক পদ্ধতিতে রং ব্যবহার করা হয়েছে। ছবিতে বেশীর ভাগ জায়গায় খুব নরম মোলায়েম রং ব্যবহৃত হয়েছে কোনও কোনও ক্ষেত্রে উগ্র রং এর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ছবিটির কাব্যিক ব্যঞ্জনা দর্শককে আকর্ষণ করে।

মাইকেলেঞ্জলোর আর একটি বিখ্যাত ছবি হোল "The Holy family" ছবিটিতে দেখতে পাই খুব Complecated Motion. ছবিটির নমনীয়তা ও পেলবতা লিওনার্দোর অংকিত St. Anne চিত্রটিকেও ছাড়িয়ে গেছে। এই ছবিটিতে কোনও গল্প নেই। শুধুমাত্র ভাসমান কতকগুলো উলঙ্গ মূর্তি দেখা যাচ্ছে।

তাঁর ছবির বিশেষ বৈশিষ্টগুলি হোল :—

(১) Dramatic Stage Element :—অর্থাৎ একটি মঞ্চের উপর মূর্তিগুলিকে অভিব্যক্তি প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে উপস্থিত করা হয়েছে।

(২) Static quality and dynamism :—প্রতিটি মূর্তিই গতি

সম্পন্ন। মনের অব্যক্ত যন্ত্রনা যেন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ভঙ্গিমার ভেতর দিয়ে ফুটে বেরোচ্ছে। সেই জন্য তিনি মূর্ত্তিগুলির শরীরের কোনও কোনও অংশ কোথাও বেশী কোথাও কম করে দেখিয়েছেন। প্রতিটি মূর্তির অঙ্গসংস্থান নিখুঁত ও নিটোল। মূর্তিগুলি দেখলে মনে হয় আদিম শক্তি বিশিষ্ট মানুষের দৈহিক গড়ন।

(৩) মাইকেলেঞ্জেলোর সমস্ত ছবিতে Complex Composition লক্ষ্য করা যায়। কোথাও ঐতিহ্যগত রীতিসিদ্ধ Composition অনুসরণ করেননি।

(৪) অধিকাংশ চিত্রই ধর্ম্ম সম্বন্ধীয়।

(৫) প্রতিটি মূর্ত্তি যেন ছেনী হাতুড়ী দিয়ে শক্ত কোনও পাথর বা ধাতু থেকে কেটে বের করা হয়েছে।

১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে ৮৯ বছর বয়সে সেই সিদ্ধার্থ মহাপুরুষ, মহান শিল্পীর জীবন দীপ নির্বাপিত হয়।

(গ) সানাৎসিও র‍্যাফেল

রেঁনেসার শিল্পাকাশে ক্ষণিকের জন্য উদিত হয়ে যে তৃতীয় উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক নিজ দিপ্তীতে আলো বিকিরণ করে পৃথিবীতে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন, তিনি হলেন শান্ত, স্নিগ্ধ, নম্র স্বভাবের তরুণ শিল্পী সানাৎসিও র‍্যাফেল। লিওনার্দো থেকে ৩১ বছর এবং মাইকেলেঞ্জেলোর থেকে ৮ বছরের ছোট র‍্যাফেলের না ছিল মাইকেলেঞ্জেলোর মত দৈহিক সৌন্দর্যের জন্য অপার আকুলতা, না ছিল লিওনার্দোর মত প্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য ব্যাকুলতা। প্রথমোক্ত দুজন ছিলেন অস্থিরচিত্ত এবং সাধারণ মানুষ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। কিন্তু র‍্যাফেল তাঁর মিষ্টি স্বভাবের জন্য সবার কাছেই প্রিয়। তাঁর শিল্প সাধনায় ছিল পেরুজিনো, মাসাচ্চো লিওনার্দো এবং মাইকেলেঞ্জেলোর প্রভাব। যেহেতু তিনি ছিলেন মহান প্রতিভাধর, সেই হেতু মহান শিল্পীদের অভিজ্ঞতা অনুশীলনে তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নি।

র‍্যাফেল জন্ম গ্রহণ করেছিলেন উমব্রিয়ান প্রদেশের পর্বত বেষ্টিত এক শান্ত শীতল ক্ষুদ্রগ্রামে ১৪৮৩ খৃষ্টাব্দে তাঁর পিতা ছিলেন একজন চিত্র শিল্পী। তাই জন্মগতভাবেই শিল্পকলার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। শৈশব কাল থেকেই তাঁর জন্মস্থানের নৈসর্গিক দৃশ্যাবলী এবং চারপাশে ছড়িয়ে থাকা মানুষ জন তাঁর শিল্পী মনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। পরে পেরুজিনোর কাছে তিনি শিল্প সাধনায় প্রয়াসী হন। আলোচনার সুবিধার জন্য তাঁর ক্ষণস্থায়ী উজ্জ্বল শিল্পী জীবনকে তিনটি ভাগে ভাগ করে নেওয়া

যেতে পারে। (১) উমব্রিয়াণ পেরুজিনো যুগ (Umbrian Perugeino period). (২) ট্রানজিশনাল ফ্লোরেন্টাইন যুগ (Transitional Florentine Period). (৩) পরিণত যুগ (Matured period).

(১) প্রথম জীবনে তাঁর শিল্প শিক্ষা শুরু হয় পেরুজিনোর কাছে। তাই র‍্যাফেলের সেই সময়কার অঙ্কিত চিত্রাবলীতে পেরুজিনোর প্রভাব সুস্পষ্ট। এই সময়কার চিত্রগুলি ভালভাবে লক্ষ্য করলে পেরোজিনোর বা র‍্যাফেলের বোঝা মুস্কিল হয়ে যায়।

(২) দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি মাসাচ্চো, লিওনার্দো, মাইকেলেঞ্জেলো প্রমুখ মহান শিল্পীদের চিত্রাবলী অনুকরণ করেন। ফলে তাঁর একটা নিজস্ব রাজ্য গড়ে ওঠে। এই সময় অঙ্কিত যে দুখানি চিত্র তাঁকে বিশ্বের প্রথম সারির শিল্পী হিসেবে স্বীকৃতি দেয় সে দুটি চিত্র হোল, (ক) ম্যাডোমা-অফ-দি-চেয়ার (খ) ম্যাডোমা ডেল-গ্রেন-ডুকা।

(৩) মাত্র ২৫ বছর বয়সেই র‍্যাফেলের নাম ফ্লোরেন্সের সীমা ছাড়িয়ে যায়। দ্বিতীয় জুলিয়াস তাঁকে রোমে আমন্ত্রণ জানান। রোমে থাকাকালিন যে দুটি বিখ্যাত চিত্র তিনি রচনা করেন তার মধ্যে প্রথমটি হোল হোলিও ডোরাসের বিতাড়ণ ; এটি একটি বিখ্যাত দেওয়ালচিত্র। অপরটি একটি প্রতিকৃতি। প্রথমটির কম্পোজিশন এবং নাটকীয় অভিব্যক্তি অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর। তাঁর ক্ষণস্থায়ী শিল্পী জীবন সম্বন্ধে বলা যায় "He was practically defined during 18th century, admired during the 19th century and criticised during the 20th century."

র‍্যাফেলের অধিকাংশ ছবির কম্পোজিসন হোল গোলাকৃতি। অনেক সময় মানুষের মুখটি তিনি নিজে আঁকতেন এবং বাকি কাজ সম্পন্ন করত তাঁর শিষ্যবর্গ, তাঁর অঙ্কিত মাতৃমুখ অমর্তশ্রী সম্পন্ন। তিনি যীশুর মুখ অপেক্ষা মাতা মেরীর মুখের উপর গুরুত্ব দিতেন সব থেকে বেশী। র‍্যাফেল চিত্র রচনার সময় মডেলের সাহায্য নিতেন। কিন্তু সাধু-সন্ত ও ম্যাডোনার মুখ আঁকার সময় কল্পনার আশ্রয় নিতেন। আদর্শ নারীত্ব ও মাতৃত্বের রূপপ্রকাশে তিনি পৃথিবীর অদ্বিতীয় শিল্পী। এর জন্য তাঁকে গ্রীক শিল্পের ক্ল্যাসিক্যাল যুগের গ্রীক দেবী ভেনাসের মুখ দীর্ঘদিন ধরে পর্যবেক্ষণ করতে হয়েছিল।

তাঁর অঙ্কিত বিখ্যাত চিত্রগুলির মধ্যে মেরীর বিবাহ চিত্রটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঐশ্বর্যশালী রেখা ও বর্ণের বিন্যাসে ছবিখানি শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখে। মাইকেলেঞ্জেলো এবং লিওনার্দোর ছবিতে মানুষের মূর্তিগুলিতে যে vigour এবং intensity লক্ষ্য করা যায় তা র‍্যাফেলের ছবিতে অনুপস্থিত তথাপি একথা স্বীকার্য যে ইউরোপের নবজাগরণ যুগের যে তিনজন দিক

পালের নাম শিল্প ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে, র‍্যাফেল তাদের মধ্যে অন্যতম।

লিওনার্দোর ছবির পশ্চাৎপটে যে প্রাকৃতিক দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে তার থেকে লিওনার্দোর প্রকৃতি সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। র‍্যাফেলের ছবিতেও নিসর্গ দৃশ্যের অবতারনা লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান লিওনার্দোর তুলনায় কিছুটা অসাধারণ।

মাইকেলেঞ্জেলোর ছবিতে আছে মানুষের অন্তর্দ্বন্দ্বের চরম প্রকাশ। পুরুষ নারী নির্বিশেষে সকলেই পেশী হিন্দোলীত অপর পক্ষে র‍্যাফেলের ছবির নায়ক নায়িকারা সুষমা, পেলবতা ও অমর্তশ্রীতে পরিপূর্ণ, তাতে তেজ নেই, আলো আছে।

লিওনার্দোর ও মাইকেলেঞ্জেলোর ছবিতে আছে নাটকীয়তা, কিন্তু র‍্যাফেলের ছবির নাটকীয় অভিব্যক্তি ততখানি বলিষ্ঠ নয়। তথাপি সেই দেব শিল্পীর প্রতিভাকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। তাঁর অঙ্কিত ম্যাডোনার মুখ আদর্শ নারীর চিরন্তন মুখ, যার দিকে তাকালে বাহ্যিক জগত ক্ষণিকের জন্য ভুলে যেতে হয়।

১৫২০ খৃষ্টাব্দে, ৬ই এপ্রিল তাঁরই জন্ম দিনে মাত্র ৩৭ বৎসর বয়সে সর্বজন শ্রদ্ধেয় সেই দেব শিল্পীর জীবনদীপ নির্বাপিত হয়। মানব সংস্কৃতির একটা দিকের চিরতরে অবলুপ্তি ঘটে। সব যাত্রার সময় তাঁর মাথার কাছে তাঁরই অঙ্কিত অসমাপ্ত transfiguration ছবিটি ঝুলিয়ে রাখা হয়।

Realism (বাস্তববাদ)

রেনেসার আদর্শবাদ (Idealism) এবং আধুনিক যুগের বুদ্ধিবাদের (Intellectualism) মধ্যে ইউরোপের শিল্প ইতিহাসে বিশেষ ধরনের কতকগুলো 'ism'এর পরিচয় পাওয়া যায়। এই 'ism' গুলির মধ্যে Realism বা বাস্তববাদ সমালোচনার ক্ষেত্রে বহুল প্রচলিত একটি মতাদর্শ। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইউরোপের চিত্রশিল্পের ইতিহাসে এই মতাদর্শের গুরুত্ব অকিঞ্চিৎকর। Realism শব্দটি এসেছে দর্শন থেকে। একজন বাস্তববাদী লেখক হলেন তিনিই। যিনি আমাদের চার পাশে ছড়িয়ে থাকা সমাজের চরিত্রগুলোকে তাঁর লেখনীর মাধ্যমে রক্ত মাংসে জীবন্ত করে তুলতে পারেন। সাহিত্য বাদ দিলে শিল্প সমালোচনা সব সময় দর্শন থেকে একটি দূরত্ব বজায় রেখে চলে।

রেনেসার শেষের দিকের যে দুজন শিল্পীকে Realism এর প্রবক্তা বলে অভিহিত করা হয় তাঁরা হলেন Paul Rubens এবং Pieter Brughel। ১৯৩০ সালে ব্রাসেলসএ History of Art এর উপর যে আন্তর্জাতিক কংগ্রেস অধিবেশন হয়েছিল সেখানে Realism সম্পর্কে একটি বিশেষধরনের আলোচনায় Monsieur georges Marlier নামে একজন শিল্প সমালোচক Realism সম্বন্ধে দুটি মত প্রকাশ করেন। এক হোল বাস্তবের অনুকরণ। আর দ্বিতীয়টি হোল নীচু তলার মানুষের জীবনযাত্রা প্রণালী। ফ্লেমিশ চিত্রকলায় Realism বলতে দ্বিতীয় মতটিকেই বোঝায়। পনেরো শতকের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যাবে যে, Realism এর মধ্যে মধ্যযুগীয় কুসংস্কার ও কল্পনার প্রভাব কিছুটা থেকে গেছে যা ষোড়শ শতকের চিত্রকলাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। Rubens, gordon এবং তাদের অনুগামীদের চিত্রকলা এই মতবাদ ভুক্ত। এই পর্যায়ের শিল্পীরা বাইবেলের মহান কোন ঘটনাকে চিত্র শিল্পের উপজীব্য বিষয় হিসেবে না নিয়ে সমাজের নীচু তলার মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্খাকে চিত্র শিল্পে রূপদান করতে সক্ষম হয়েছেন। আমরা যদি Pieter Brughel এর ছবির দিকে তাকাই তাহলে দেখব যে তাঁর ছবিতে অভিজাত শ্রেণীর মানুষকে তিনি মডেল হিসেবে ব্যবহার করেননি, তাঁরা সবাই নীচু তলার খেটে খাওয়া মানুষজন। Brughel নিজেই ছিলেন কৃষক পরিবারের সন্তান তাই তাঁর অঙ্কিত চিত্রে যোশেফ ও মেরীকে তিনি সেই ভাবেই দেখাতে চেয়েছেন।

যদিও পঞ্চদশ শতাব্দীতে Rubens এবং Pieter Brughel, Realism এর আগমনবার্ত্তা ঘোষণা করেন। তা সত্ত্বেও তাঁরা Realismকে শিল্প ইতিহাসে আক্ষরিক অর্থে প্রয়োগ করতে পারেন নি। আঠারো শতকের প্রথম দিকে ফ্রান্সে এক দুঃসাহসিক দামাল শিল্পীর আবির্ভাব ঘটে তিনিই সঠিক অর্থে Realism-এর প্রবক্তা, নাম গুসতাৰ্ভ কোর্বে। বারবিজঁ শিল্পীদের মত

প্রথম জীবনে প্রকৃতির প্রতি তাঁরও অনুরাগ ছিল। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির রূপ লাবন্যকে পরিহার করে মানুষের জীবনের কঠোর বাস্তবকে চিত্র শিল্পে তুলে ধরতে চেষ্টা করলেন, তাঁর ছবির নায়ক নায়িকারা বাইবেলের পাতা থেকে উঠে আসা অপ্সরা অপ্সরী, কিন্নর কিন্নরী নয়। তারা সবাই মাটির খেটে খাওয়া মানুষ। যারা জন্মায় মাটিতে, বড় হয় মাটিতে এবং মৃত্যু বরণ করে মাটিতে। তিনি চিত্রে রোমান্টিক কল্পনাকে পরিহার করে মানুষকে মহৎ ও মহীয়ান করে সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হলেন। তাঁর অঙ্কিত পাহাড়, পাথর, গাছ-পালা, ধূসর, বাদামী, নীল। তারা সবাই জড়, ঘন বাস্তব।

কোর্বে'র জন্ম হলো জ্যাকবিন ঐতিহ্যে গণতন্ত্রপন্থী এক সচ্ছল কৃষক পরিবারে। জন্ম সূত্রেই তিনি রাজনীতির সঙ্গে পরিচিত। তিনি সগর্বে বলতেন "জন্ম থেকেই আমি রিপাবলিকান"। স্কুল কলেজে তিনি ভাল ছাত্র কোনও দিনই ছিলেন না। বরং উশৃংখল ও বিদ্রোহী ছাত্র হিসেবে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। যার জন্য অল্পদিনের মধ্যেই পড়াশুনা অসমাপ্ত রেখে তাঁকে কলেজ ছাড়তে হয়। পরে তিনি ফ্রজুলো নামক একজন শিল্পীর কাছে শিল্পের প্রাথমিক ধারণা লাভে প্রয়াসী হন। কিন্তু এই ধরনের শিল্প শিক্ষা তাঁর মনোমত না হওয়ায়, তাঁর জন্মস্থান আলেয়'তে ফিরে গিয়ে নিঃস্বর্গ দৃশ্য চিত্রঅংকনে মনোনিবেশ করেন। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে তাঁর অঙ্কিত "একটি কালো কুকুরের সঙ্গে আত্মপ্রতিকৃতি" চিত্রটি প্রদর্শিত হয় এবং বিশেষভাবে প্রশংসালাভ করে।

ঠিক এই সময় ফ্রান্সে একদল শক্তিশালী লেখকের আবির্ভাব ঘটে। তাঁদের লেখনীর প্রভাবে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। স্টেনডহাল, ব্যালজাক, ফ্লবার্ট ও জর্জম্যান প্রমুখ ঔপন্যাসিকরা চাষীর জীবন ও গ্রামের কথা তাদের অমর লেখনীর মাধ্যমে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরতে সচেষ্ট হন। প্যারিসের শ্যেইন নদীর অববাহিকা অঞ্চলে কবি বোদলেয়ার, প্রুঁধো, সঁফ্লুরি প্রভৃতি বাস্তববাদী কবি, শিল্পী বুদ্ধিজীবির দল তাঁদের তীব্র বক্তব্যে বাস্তববাদের জোয়ার এনে দেয়। যা কিছু সুন্দর, ললিত, কৃত্রিম আবেদনে জ্বলজ্বলে, তাকে তারা সম্পূর্ণরূপে নাকচ করে দিয়ে শুরু করেন। ১৮৪৫ সালে বোদলেয়ার লিখলেন "আধুনিক জীবনের বীর্য আমাদের ঘিরে ধরেছে। তিনিই প্রকৃত শিল্পী যিনি আধুনিক জীবনের মহাকাব্যচিত চরিত্রকে স্বতন্ত্র করে নিতে জানেন। যিনি রং ও রেখার মাধ্যমে দেখাতে পারবেন, আমরা আমাদের কালোটাই ওবার্নিশকরা চামড়ার বুটে কত মহৎ কত কাব্যিক"। সমকালীন সমাজ ও ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয়কে শিল্পের উপাদান হিসেবে গ্রহণ করার যে আন্দোলন উনবিংশ শতাব্দীতে ফ্রান্সে শুরু হয়েছিল শিল্পইতিহাসে তাকেই বাস্তববাদ বা Realism নামে অভিহীত করা হয়। বাস্তববাদীদের মতে শিল্প

হবে একঘেয়েমি মুক্ত, আবেদনে জ্বলজ্বলে, যা জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করবে, চেতনা যোগাবে, কর্মে অনুপ্রাণিত করবে। কোর্বে বাস্তববাদীদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হলেন।

১৮৪৮ সালে প্যারিসে গণঅভ্যুত্থান শুরু হোল। লেখক, শিল্পী, রাজনৈতিক নেতারা একটি প্রতিঘাতী মোর্চা গড়ে তুললেন। কোর্বে বুদ্ধিজীবিদের সঙ্গে যোগ দিলেন ফলে তাঁর ছবি পালাবদল শুরু হল। তাঁর ছবির ভাষা, আরও ঋজু, তীক্ষ্ণ ও বলিষ্ঠভাবে উচ্চারিত হতে লাগলো। তিনি সগর্বে স্বীকার করলেন যে "১৮৪৮ ব্যতিত আমার শিল্প পরিণতি সম্ভব হোত না"। সমালোচকেরা কোর্বের ছবির সমালোচনায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন। তাঁরা তাঁকে বর্বর শিল্পীগোষ্ঠির প্রধান বলে অভিহিত করলেন। কেউ কেউ বললেন "তাঁর অঙ্কিত ছবির মূর্তিগুলি এতই কুৎসিত, এতই বীভৎস, যে কুমীরের মুখের সামনে দিলেও খেতে চাইবে না।" এ্যাঙগার বললেন—"প্রতিভার এত অপব্যয় না আছে তার রচনার মধ্যে অভিনবত্ব, না আছে তাঁর ড্রয়িং জ্ঞান," সমস্ত ছবিগুলি ব্যঙ্গোক্তিতে পরিপূর্ণ। মটলে মত প্রকাশ করলেন "ক্ষুদ্রতাকে মহিম সুবিধার কাজে লাগানো উচিত।" অর্থাৎ শিল্পীর প্রতিভার স্পর্শে মাঠের খেটে খাওয়া চাষী বাইবেলের কোনও চরিত্রের সমকক্ষ হয়ে ওঠা উচিত"। বস্তুত কোর্বে মাঠে খেটে খাওয়া চাষীর জীবন ও জীবিকায় কোনও ক্ষুদ্রতা দেখতে পাননি। তিনি তাদেরকে প্রাণ প্রাচুর্যের উৎস স্বরূপ দেখতে ও দেখাতে চেয়েছিলেন। প্রুধো বললেন "তিনি যেমন মহৎ শিল্পী, তেমনি নীতিবাদী।"

কোর্বের শিল্পীজীবন বাস্তবজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। তিনি রাজনীতির সঙ্গে কিছুদিনের মধ্যেই জড়িয়ে পড়েন। ১৮৭০ সালে যখন সরকার তাকে লিজন-অফ-অনার সম্মানে ভূষিত করেন, তখন তিনি ঘৃণাভরে সে সম্মান পরিত্যাগ করেন। প্যারীর গণঅভ্যুত্থান এবং প্রতিক্রিয়াশীলদের চক্রান্তে তাকে কিছুদিনের জন্য কারাবাস করতে হয়। কারাগার থেকে মুক্ত হওয়ার পর তিনি স্বেচ্ছায় সুইজারল্যাণ্ডে নির্বাসনে যান। সুইজারল্যাণ্ডে থাকাকালীন তাঁর স্নেহময়ী ভগিনী এবং একমাত্র সন্তান মারা যায়, এবং কিছুদিনের মধ্যেই শিল্পীর দেহমন ভেঙ্গে পড়ে। মাত্র ৫৮ বছর বয়সে এই সৌমকান্তি যোদ্ধা শিল্পী যকৃতের ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুর সায়াহ্নে এক বন্ধুকে চিঠিতে লিখেছিলেন "আমার জীবনে আমি একটি অলৌকিক সিদ্ধিলাভ করতে চাই। আমি আমার আদর্শবাদকে বিসর্জন না দিয়ে আমার শিল্পকে বাঁচাতে চাই। আমার বিবেককে একবারও প্রতারনা না করে কাউকে খুসী করার জন্য কিংবা বিক্রির সুবিধার জন্য এক ইঞ্চিও না এঁকে আমার শিল্প সত্বাকে অব্যাহত রাখতে চাই।" তাঁর আদর্শ তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। এইখানেই তাঁর শিল্পী জীবনের সার্থকতা।

প্রতিচ্ছায়া বাদ (Impressionism)

প্রকৃতিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ধরে রাখার বাস্তবধর্মী যে শিল্পরীতি ফ্রান্সে 'দু'শ বছর ধরে চলেছিল উনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ শতকে ফ্রান্সে তাদেরই একজন উত্তরসূরী সেই ধারার আমূল পরিবর্ত্তনে বদ্ধপরিকর হলেন। তাঁরা মত প্রকাশ করলেন যে, সূর্যালোকের পরিপ্রেক্ষিতে প্রকৃতির বিশেষ কোনও অংশের সামগ্রিক রূপটি একমুহূর্তে শিল্পীর মনে যে আবেদন সৃষ্টি করে, সেই মুহূর্ত্তটিকে রং ও রেখার মাধ্যমে ক্যানভাস ধরে রাখা, অর্থাৎ এরা চাইলেন মুহূর্ত্তকে অমরত্ব দান করতে। তাদের কাছে দুটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে উঠল, আলোর স্পন্দন এবং বাতাসের ঘনত্ব। তাই তাঁরা ছায়ার রংকে পরিহার করলেন। তাঁবা মনে করতেন না যে বাতাসের ঘনত্ব পরিবর্তনশীল এবং একটি দৃশ্যকে মেঘকুয়াশার ওপার থেকেও আঁকা যায়।

যেহেতু তাঁরা আলোর শিল্পী, সেইহেতু রংকে তাঁরা গতানুগতিক পদ্ধতিতে ব্যবহার করলেন না। তাঁরা রং এর তাত্বিক দিক নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করলেন,এবং রং কে তিনটি স্বতন্ত্র স্তরে ভাগ করে নিলেন। প্রথম হোল Local Colour অর্থাৎ গাছের রং সবুজ বা আকাশের রং নীল। কিন্তু আলোর প্রাতফলনে তা ঝিলমিল করে। জল তরল আগুনের মত জ্বলজ্বল করে। দ্বিতীয়টি হোল Atmospheric Colour অর্থাৎ সকালে বা বিকেলে প্রকৃতির দিকে তাকালে মনে হয় একটা স্বচ্ছ নীল চাদর যেন প্রকৃতির উপর বিছানো আছে। ফলে দৃশ্যমান সব কটি রং এর সঙ্গে যেন কিছুটা নীল রং এর আভাস অনুভূত হয়। তৃতীয়টি হোল Optical Mixture অর্থাৎ পাশাপাশি যদি ক্যানভাসে দুটি রংএর আঁচড় দেওয়া হয় তাহলে যে জায়গায় রং দুটি একে অপরের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে সেখানে দূর থেকে একটি স্বতন্ত্র মিশ্র রং এর আভাস অনুভূত হবে। রং এর এই তত্বগত দিকগুলি মেনে নিয়ে নবীন পন্থীরা 'কালো' রং কে বাদ দিলেন। কেননা তারা আলোর শিল্পী সুতরাং আলোর রাজ্যে 'কালো'র কোনও অস্তিত্ব না থাকাই স্বাভাবিক। তাদের কাছে সব থেকে কৃষ্ণ বর্ণ হোল বেগুনী নীল, গাঢ় সবুজ, গাঢ় বেগুনী, গাঢ় লাল ও কমলা তার সঙ্গে রইল রামধনুর বর্ণচ্ছটায় ব্যবহৃত রং সমূহ।

আঙ্গিক ছাড়াও বিষয়বস্তু নির্বাচনে ও তারা নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। অতীতের শিল্পীরা যা মহৎ, বৃহৎ এবং গর্বে'র ও গৌরবের বিষয় তাকেই চিত্র শিল্পের উপজীব্য বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু নবীন পন্থীদের কাছে

হঠাৎ করে সমস্ত বিশ্বচরাচর চিত্রযোগ্য হয়ে উঠল। পথ চলতে চলতে হঠাৎ কিছু দেখে বিস্মৃত হওয়ার পুলককে তারা নির্দ্বিধায় চিত্রশিল্পের উপজীব্য বিষয় হিসেবে গ্রহণ করলেন। তার মধ্যে না আছে কোনও ভাবনার বিষয় না আছে কোনও যুক্তিবাদী তথ্য। শুধুমাত্র দৃশ্যবস্তুই তাঁদের কাছে সত্য হয়ে উঠল।

বাস্তববাদের পর কিছু সংখ্যক শিল্পী শিল্পকেই জীবিকার্জনের উপায় হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা অভিজাতশ্রেণীর মানুষের প্রতিকৃতি রচনা করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। এরা অবশ্য নবীনপন্থীদের আন্দোলনে যোগ দিতে পারেন নি। ঠিক এই সময়ে সাবেকী ক্যামেরার পরিবর্তে সহজ বহনীয় ক্যামেরার আবিষ্কার শিল্পআন্দোলনকে ত্বরান্বিত করল। সাবেকী ক্যামেরা ছিল ভারী। শুধুমাত্র প্রতিকৃতি গ্রহণের উপযোগী, ছবি তুলতে সময় লাগতো অনেক বেশি, ছবিও খুব নিখুঁত আসতো না। নতুন স্ন্যাপসট ক্যামেরায় তড়িতালোক-সম্পাতে স্বল্পসময়ে স্বল্পখরচে নিখুঁত প্রতিকৃতি এবং দৃশ্য চিত্র পাওয়া সম্ভব হল। ফলে যে সমস্ত শিল্পী অভিজাত শ্রেণীর মানুষের প্রতিকৃতি অঙ্কন করে জীবিকা নির্বাহ করত, নতুন স্ন্যাপসট ক্যামেরা আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা বেকার হয়ে গেলেন। তাঁরা শিল্প চর্চা পরিত্যাগ করে, রুজী-রোজগারের জন্য কারখানায় চাকুরী নিলেন। আর যাঁরা নবীন পন্থী তাঁদের এমন কিছু ভাবতে হোল যা ক্যামেরার আয়ত্তাতীত।

ইউরোপীয় চিত্রশিল্পের আলোচ্য বিবর্তনের আর এক সহায়ক হোল অকস্মাৎ জাপান থেকে আসা বিচিত্র ছাপাই ছবি। এই ছবিগুলি দৈনিক প্রভা-বান্বিত প্রাচীন জাপানের ঐতিহ্যগত ছবি নয়। অষ্টাদশ শতকে পাশ্চাত্য প্রভাবে জাপানী শিল্পীরা সমাজের নীচুতলার মানুষদের জীবন নিয়ে যে ছবি আঁকতে শুরু করেন তারই রঙিন ছাপা ছবি। জাপানে এই সমস্ত ছবির একেবারেই মূল্য ছিল না। উনবিংশ শতাব্দীতে সুয়েজখাল খননের ফলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বাণিজ্যিক আদান প্রদানের পথ সুগম হওয়ায় জাপান থেকে আগত ছাপাই ছবিগুলি চায়ের মোড়ক হিসেবে প্যারিসে পাঠানো হতে লাগলো। নবীন পন্থীরা এই ছবিগুলির মনোরম ধর্ম বৈচিত্রকে নিজেদের ছবিতে ব্যবহার করতে সচেষ্ট হলেন। ঐতিহ্যগত ধারনার বাইরে থেকে দৃশ্যমান জগতকে কিভাবে অপ্রত্যাশিত দৃষ্টিকোণ থেকে আঁকতে হয় জাপানী ছবিগুলি তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। নবীন পন্থীদের উপর জাপানী শিল্পের প্রভাব শিল্প আন্দোলনের আর এক সহায়ক হোল। যেহেতু নবীন পন্থীরা ছিলেন আলোর শিল্পী সেইজন্য তারা Luminist নামে অভিহীত হলেন এবং শিল্পের জগতে প্রথম বিপ্লব এনেছিলেন বলেই তাদেরকে Releep নামে অভিহিত করা হল। কিন্তু তাঁদের নূতন ধ্যান ধারণা সম্বলিত ছবি শিল্প জগতে স্থায়ী আসন লাভ করতে

হলে যে স্বীকৃতি দরকার তা তাঁরা প্রদর্শনীর মাধ্যমে জনসাধারণের মতামত লাভের জন্য তৎকালিন প্যারিসের ArtGallerya কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগে ব্যর্থ হলেন। প্রথম দিকে কেউই তাদের এ প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানাতে এগিয়ে এলেন না। অবশেষে ১৮৭৪ সালে প্যারিসের একটি চায়ের কাফেতে তাঁরা প্রদর্শনীর আয়োজন করলেন। এই প্রদর্শনীতে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে মোনে, মানে, দেগা, পিসারো ও সেজানের নাম উল্লেখযোগ্য। প্রদর্শনী কক্ষের একটি দেওয়ালে মোনের আঁকা একটি ছবি ছিল। ছবিটির নাম দেওয়া ছিল "The Sun rise an impression"। সাংবাদিকরা এই ছবিটি দেখে বিদ্রূপ করেছিলেন, impressionist মোনে কোনও প্রতিবাদ না করে সেই বিদ্রূপকে মেনে নিয়ে ছিলেন। এই ঠাট্টা পরিহাসের মাধ্যমে যে শিল্প আন্দোলন গড়ে উঠেছিল ইউরোপের শিল্প জগতে তাকেই Impressionism আখ্যায় ভূষিত করা হয়। এই শিল্প আন্দোলনই যে পরবর্তী ইউরোপীয় শিল্পকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করবে তখন কিন্তু তা কেউ কল্পনাও করতে পারেন নি।

উত্তর প্রতিচ্ছায়াবাদ ও তিন দিকপাল
(Post Impressionist)

Impressionist রা ছিলেন আলোর শিল্পী। রং ও আকারকে এক করে দেখাতে চেয়েছিলেন। এই নবতম আন্দোলনে যাঁরা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে ছিলেন তাঁদের মধ্যে Paul Cezanne অন্যতম। ১৮৭৪ সালে Impressionist দের যে প্রদর্শনী হয় তিনিও তাতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। কিছু দিনের মধ্যে তিনি Impressionist দের চিন্তা ধারা থেকে সরে দাঁড়ালেন। তিনি মত প্রকাশ করলেন যে সূর্যের আলো তো পরিবর্ত্তনশীল, সুতরাং আলোর পলাতক মুহূর্ত্তকে ধরে রেখে কোনও লাভ নেই। সেক্ষেত্রে আকারের কোনও পরিবর্তন নেই। আকার চিরস্থায়ী, সুতরাং আকারই ছবির একমাত্র সত্যবস্তু। এই চিন্তাধারা নিয়ে যে নবতম আন্দোলন গড়ে উঠলো, ইংরেজ কলা-সমালোচক রজারফ্রাই সেই আন্দোলনকে Post imprssionism আখ্যায় ভূষিত করেছেন।

Post impressionism এর তিন দিকপাল হলেন Paul Cezanne, Vincent Vangogh এবং Paul Goguine। এই তিন দিকপাল ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন নিদারুণ নিঃসঙ্গ। জীবিতাবস্থায় কেউই স্বীকৃতি পাননি। মৃত্যুর পর শুধু দেশজোড়া খ্যাতিই নয়, পৃথিবীর শিল্প ইতিহাসে তিনটি স্বতন্ত্র শিল্পধারার প্রবর্ত্তক হিসেবে অমর হয়ে আছেন।

উত্তর Impressionist যুগের তিন দিকপালের মধ্যে সর্বপ্রথম যাঁর নাম উল্লেখযোগ্য তিনি হলেন Paul Cezanne। ১৮৩৯ খৃঃ উত্তর ফ্রান্সের রোম নদীর তীরে এক মনোরম প্রকৃতিক পরিবেশে তাঁর জন্ম। তাঁর পারিবারিক জীবন ছিল সচ্ছল। সুতরাং চিত্রচর্চার দ্বারা যে তাঁকে জীবিকা নির্ব্বাহ করতে হবে এরূপ বাধ্যবাধকতা ছিল না। তিনি খুব শান্ত নির্ব্বেবাদী মানুষ ছিলেন, মন্থর গতিতে ছবি আঁকতেন। রংএর উপর রং চাপিয়ে প্রতিটি বস্তুর নিরেটত্ব ও অবয়বত্বকে মূর্ত্ত করে তুলতে সচেষ্ট ছিলেন। ক্রমশঃ তাঁর ছবিতে রং এর গুরুত্ব হ্রাস পেল, বস্তুই হয়ে উঠল প্রধান। এইভাবে কিছুদিন কাজ করার পর তিনি সরবে ঘোষণা করলেন "Nature can be devided into cylinder, sphere and cone" এই তিনটি জ্যামিতিক আকৃতি দিয়েই তিনি সমস্ত প্রকৃতিকে পটে ধরে রাখতে চেষ্টা করলেন এবং চিন্তা ও পরিকল্পনার উপর জোর দিয়ে সচেতন ভাবে আকারের বিকার ঘটাতে শুরু করলেন। তাঁর

ছবিতে তুলির আঁচড়ের একটা স্বতন্ত্র মূল্য রয়ে গেল। তাঁর অংকিত ভূচিত্রের গাছ-পালা, পাহাড়-পর্বত, দৈর্ঘে, প্রস্থে বিশালতায় এত বেশী বাস্তব মনে হয় যেন কোনও শক্ত ধাতু থেকে ছেনী হাতুড়ী দিয়ে কেটে বের করা হয়েছে।

তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে অংকিত অজস্র ছবির মধ্যে অধিকাংশই নিঃস্পন্দ জীবনের ছবি (still life)। সেই সমস্ত still-life এর ফল, ফলাধারগুলি পর্যবেক্ষণ করলে মনে হয় প্রতিটি বস্তু নিটোল সাঁশালো ও ওজন বিশিষ্ট। 'still-life এর আপেল অংকনের সময় তিনি স্বীকার করলেন "I want to realise the other sides of the Apple." টেবিলে কাপড়ের ঢাকনাটি যেন কাপড়ের নয়। মনে হয় যেন টিনের পাত 'বা শক্ত ধাতু দিয়ে তৈরী।

Cezanne অংকিত দৃশ্য চিত্রগুলিতে হলুদ, সবুজ এবং বাদামী রং এর প্রাধান্য বেশী। তাঁর অংকিত 'Woman with the books' চিত্রটিতে দেখতে পাওয়া যায় কাপড়ের ভাঁজগুলিতে একাধিক রং ব্যবহৃত হয়েছে। মানুষের আকৃতির সঙ্গে পিছনের জমির সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবহার খুবই সংযত ও পরিকল্পনা সাপেক্ষ। রং এর বিভিন্ন পর্দা সৃষ্টি করে মূর্ত্তির modelling এর আভাস ফুটিয়ে তোলা হয়েছে ফলে মূর্ত্তিটি একটি শক্ত নীরেট পাথরের মূর্ত্তি বলে ভ্রম হয়।

Cezanne এর ছবিতে একধরনের বুদ্ধিমত্তাহীন ভাবপ্রবনতা লক্ষ্য করা যায়। তাঁর শিল্প কাজে দুটি জিনিস বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য (১) Realisation of the object (২) Modulation of the object। প্রথমটি হোল বস্তুর বস্তুত্বে পৌঁছানো আর দ্বিতীয়টি হোল বস্তুত্ব থেকে ইপ্সিত জগতে পৌঁছানো। তাঁর আবাস্থিত জগতের জন্য যেখানেই প্রয়োজন বোধ করেছেন সেখানেই সনাতনী রীতির বিকৃতি ঘটিয়েছেন। তখন তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি যে তাঁর সেই দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা চিত্র শিল্পের জগতে এক মহা সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। পরবর্তী যুগে শিল্প ইতিহাসের যুগান্তকারী Cubism বা আকৃতির বিন্যাসবাদ তাঁরই প্রদর্শিত পথের ফলশ্রুতি।

সেজানের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ১৯০৭-১৯১৪ সালে স্পেনের শিল্পী পাবলো পিকাসো এবং জার্মানের শিল্পী জর্জ ব্রাক যুগান্তকারী Cubism বা আকৃতির বিন্যাসবাদকে আক্ষরিক অর্থে শিল্প ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। সেজানের আদর্শ তো ছিলই তার সঙ্গে নিগ্রো পলিনেসিয়ান ভাস্কর্যের আদিম, সরল, সাদাসিদে ভাবের প্রভাব ছিল অত্যন্ত বেশী। Cubism-কে পূর্ণাঙ্গ রূপ দানের জন্য তাঁরা দুটি যুক্তি খাড়া করলেন। (১) Strength is Beauity (শক্তিই সুন্দর), (২) Straight Line is stronger Than Curve Line (সরল রেখা বাঁকা রেখার থেকে বেশী শক্তিশালী)। এ প্রসঙ্গে পিকাসো মত প্রকাশ করলেন যে "আমরা চেষ্টা করছি কত সহজে স্থাপত্য

রীতিতে পৌঁছানো যায়।'' উপরিউক্ত দুই যুক্তির উপর নির্ভর করে তাঁরা বঙ্কিম রেখাকে পরিহার করে সরল ও ঋজু রেখায় ছবির কম্পোজিশন শুরু করলেন। ফলে চিত্রে স্থাপত্যগুণ বৃদ্ধি পেল এবং রং এর গুরুত্ব কমিয়ে শুধুমাত্র ধূসর ও বাদামী রং ব্যবহার হতে লাগলো।

ক্রমশ পিকাসো, ব্রাক এবং তাদের অনুগামীদের চিত্রকলা জটিল দুর্বোধ্য হতে লাগলো। তার পক্ষে তাঁরা মত প্রকাশ করলেন যে, যে চর্মচক্ষে যা দেখা যায় ছবিতে তার প্রতিফলন যুক্তিহীন। পূর্বেই বহুবার সে চেষ্টা করা হয়েছে বরং যা আছে বা থাকবে তাকেই দৃঢ়, ঘন ও স্থায়ীভাবে দেখানোর চেষ্টা করা উচিত। কোনও বস্তু প্রত্যক্ষণে বস্তুর যে রূপ মানসচক্ষে ভেসে ওঠে তা প্রত্যক্ষ বস্তুর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। মানসচক্ষে সেই বস্তুটির আকৃতি ও ভূমিকা এবং বস্তুটির কিছু কিছু অংশ এত বেশী বাস্তব বলে ভ্রম হয় যে হাত দিয়ে সেই অংশগুলি স্পর্শ করা যাবে। আর বস্তুটির বাকি অংশগুলি আস্তে আস্তে ঝাপসা হয়ে যায়। এই আলো অন্ধকারের ওলট পালট মিশ্র প্রতিচ্ছবি একটি নিখুঁত আলোকচিত্র থেকে অনেক বেশী বাস্তব। এই যুক্তি তর্কের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয় বস্তুর মূল উপাদানগুলিকে জ্যামিতিক রেখায় ফালি ফালি করে কেটে শিল্পীর মর্জি অনুযায়ী Cubist-রা প্রথম পর্যায়ে সংগঠিত করতে শুরু করলেন। কখনও তাঁরা বস্তুটিকে বিভিন্ন দৃষ্টি-কোণ থেকে উপস্থিত করতে সচেষ্ট হলেন কখনও বা বস্তুটির উপর, নীচ, তলা, পাশাপাশিকে টুকরো টুকরো ভাবে বিশ্লেষণ করে ওলট পালট করে দেখাতে সচেষ্ট হলেন। ফলে দর্শকদের কাছে তা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করলো। কোনও বস্তুর এইভাবে জ্যামিতিক বিশ্লেষণকে বিশ্লেষণাত্মক Cubism নামে অভিহিত করা হল।

এর পরবর্তী স্তরে Cubist দের ছবিতে বাইরের বিভিন্ন প্রভাব লক্ষ্য করা গেল। বিষয় বস্তু হিসেবে কোনও প্রতিকৃতি অথবা Still-life নেওয়া হোল। কিন্তু Cubistদের রীতি পদ্ধতি অনুযায়ী বস্তুর বিভিন্ন স্তরগুলিকে সরল রেখা ও কৌণিক নক্সায় ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে বিষয়বস্তু অপহৃত হয়ে ক্যানভাসের ফ্রেমের মধ্যে কতকগুলি জ্যামিতিক আকার আটকা পড়ে গেল। এই পর্যায়ের Cubismকে অবরুদ্ধ Cubism নামে অভিহিত করা হল।

এর পরের পর্যায়ে Cubist-রা বিপরীত পদ্ধতিতে ছবি, সংগঠনে প্রয়াসী হলেন। তাঁরা বিমূর্তকে প্রমূর্ত করার উদ্দেশ্যে অর্থাৎ বস্তুর বস্তুময়তাকে ফুটিয়ে তোলার জন্য রং তুলির পরিবর্তে ক্যানভাসে স্টেনসিল করা গাণিতিক অক্ষর, তাস, ফেলে দেওয়া কাগজের টুকরো, কাপড়ের টুকরো, প্রভৃতি সাঁটতে শুরু করলেন। কোনও কোনও ক্ষেত্রে মিশ্রিত রং কালি ব্যবহার করে মার্বেলের সাদৃশ্য ফুটিয়ে তুলতে চাইলেন। এই পর্যায়কে বলা হোল সাংশ্লেষিক Cubism, শিল্প ইতিহাসে যাকে আমরা কোলাজ (Collage) নামে অভিহিত করি।

পরবর্তী পর্যায়ে Cubist-দের চিন্তাধারা নতুন পথে মোড় নিল। Cubist আন্দোলনের প্রথম দিকে Cubist-রা ছবিতে রং-এর প্রাধান্য কমিয়ে দিয়েছিলেন। সাংশ্লেষিক পর্যায়ের পরবর্তী স্তরে রং-এর উত্তাল ব্যবহার শুরু করলেন। ফলে ছবি ঝলমলে হয়ে উঠলো। এই পর্যায়ের Cubist-দের ছবিকে বলা হল ঐন্দ্রজালিক বা ম্যাজিক্যাল Cubism।

এইভাবে বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করতে করতে ক্রমশ Cubism জটীল, কুটিল, তাত্বিকে পরিণত হোল। দর্শকরা বিভ্রান্তি বোধ করলেন, তা স্বত্বেও পরবর্তীকালে বেশ কিছু শিল্পী Cubist-দের পথ অনুসরণ করে নিজস্ব পথে মত প্রকাশে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তাদের প্রভাব আজও অসংখ্য আধুনিক শিল্পীদের কাজের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।

উত্তর impressionist যুগের দ্বিতীয় দিকপাল হলেন Vincent Vangogh। শিল্প ইতিহাসে ভ্যানগঘ এমন একটি নাম যা ধনী-নির্ধন, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সবার কাছেই পরিচিত। এমন হর্ষ-বিষাদে ভরা জীবন কাহিনী আর কোনও শিল্পীর আছে কিনা সন্দেহ। হর্ষ তাঁর সৃষ্টির মহত্বে। বিষাদ শিল্পীর সারাজীবন ব্যাপী অকথ্য মানসিক যন্ত্রণায়, হতাশায় এবং তৎকালিন সমাজের অবহেলায়।

নেদারল্যাণ্ডের ছোট্ট শহরে ভ্যানগঘের জন্ম হয় ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে। আঠারো থেকে সাতাশ পর্যন্ত অবিরাম মানসিক যন্ত্রণায় ছট্‌পট্‌ করতে করতে শেষের দশবছর যন্ত্রণার ভার মুক্ত হয়েছে ক্যানভাসে প্রতিটি তুলির আঁচড়ের মধ্যে দিয়ে, যা আমাদের কাছে মহান ও মহৎ সৃষ্টি বলে অভিহিত।

অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝা বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে যখন তাঁর বয়স ২৬ বছর তখন তিনি মনে করলেন শিল্পের সাধনাতেই তার মুক্তি। কিন্তু তখনকার দিনে শিল্পচর্চার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ কোনক্রমেই সম্ভব ছিল না। ১৮৮৬ সালে ভ্যানগঘ চলে এলেন প্যারিসে ছোট ভাই তেওর কাছে। তেওর কোনও সঙ্গতি না থাকা স্বত্বেও তিনি তাঁর সেই অসামাজিক, উন্মাদ, অভিমানী, আবেগ প্রবণ দাদাকে সাদরে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। শুধু তাই নয়, নিজের অজস্র অসুবিধা থাকা স্বত্বেও সারা জীবন সেই সাহায্য চালিয়ে গেছলেন। এই ধরণের ভ্রাতৃপ্রেম পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

প্রথমে এ্যান্টিয়োর্প শহরে ভ্যানগঘ জাপানী চিত্র দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হলেন তখন তাঁর বিশ্বাস জন্মালো যে, পৃথিবীটা শুধু দুঃখ দারিদ্র আর হতাশার নয়, এখানে আনন্দের স্থানও আছে। পরে ইমপ্রেশনিষ্টদের রং এর চমক্‌ তাঁকে আকৃষ্ট করল এবং পিসারো, দেগা, রেনোয়াঁ প্রমুখ শিল্পীদের দ্বারা প্রভাবিত হলেন। দীর্ঘদিনের দারিদ্র হতাশা ও মানসিক যন্ত্রণা ভুলে গিয়ে নতুন মানুষদের সখ্যতা পেয়ে নতুন করে পুরোনো পৃথিবীকে

ভালবাসলেন। সেই সময়কার ছবিগুলিতে প্রজ্বলিত রং-এর উত্তাল ব্যবহার লক্ষ্য করা গেল। ক্যানভাসগুলি রং-বেরং-এর ফলে, ফুলে ভরে উঠল। মৌলিক রংগুলিকে স্বতন্ত্রভাবে বিন্দুতে বা আঁচড়ে না লাগিয়ে সর্পিল রেখার প্রয়োগে ব্যবহার করতে শুরু করলেন।

যার মধ্যে দিয়ে তাঁর মনের উদ্দাম আবেগ অভিব্যক্ত করার স্বাধীনতা বৃদ্ধি পেল। একটি চিঠিতে ভাইকে লিখলেন **'I want to paint humanity, humanity and only humanity'**। মূলত তাঁর আবেগের উৎস ছিল মানবতা। এই সময়কার ছবিগুলিতে ফুটে উঠেছে তার নিজস্ব জীবন দর্শন।

এরপর তিনি রওনা হলেন আর্লে শহরে। আর্লে চিরবসন্ত বিরাজমান দেশ। সারা বছর ফুল ফোটে, পাখীরা গান গায়। আর্লেতে থাকাকালীন তাঁর জীবনের আমূল পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। তিনি মন প্রাণ দিয়ে ছবি আঁকতে শুরু করলেন। তাঁর এই সময়কার ছবিগুলি একটু ভিন্ন স্বাদের। প্রতিটি তুলির আঁচড়ই যেন গল্প বলে, কথা কয়। রং এর ব্যবহার শুধু চোখকে তৃপ্তি দিয়েই থেমে যায়নি। সেগুলি মানবিকতায় পরিপূর্ণ। সেই জন্যই ভ্যানগঘকে বলা হয় **Expressionist**।

বাস্তববাদী **impressionist**-রা সূর্যালোকের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাকৃতিক কোনও অংশের তাৎক্ষণিক মুহূর্তকে ধরে রাখতে চেয়েছিলেন। সেক্ষেত্রে সেজান এবং ভ্যানগঘ চিত্র শিল্পের নতুন জগত সৃষ্টি করলেন। ভ্যানগঘ নতুন উদ্দিপনায় বিরাটকায় পরিসরের উপর কাজ শুরু করলেন। ক্রমশ পার্থিব জগত ও নানা সমস্যা তাঁকে উত্যক্ত করে তুললো। এই সময় উরসুলা নাম্নী এক সুন্দরী মহিলাকে নিজের ডানদিকের কানটি কেটে উপহার দিলেন। ফলে তাঁকে মানসিক হাসপাতালে যেতে হল। হাসপাতালে থাকাকালীন তিনি বেশ কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য ছবি এঁকেছেন, প্রতিটি ছবিই অব্যক্ত যন্ত্রণায় গুমরে ওঠা অভিব্যক্তিতে আচ্ছন্ন। এই সময়কার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছবি হোল **"The Starry Night"**। ছবিটির বর্ণপ্রয়োগ চোখকে তৃপ্তি দেয়, ছবিটির দিকে ভালভাবে তাকালে মনে হয় তারা ভরা নীল আকাশে যেন ঝড় উঠেছে।

আর্লেতে থাকাকালিন যে ছবিগুলি এঁকেছিলেন তার মধ্যে **Ploughing** (বীজবপন) ছবিটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ছবিটিতে সূর্যকে হলুদ বলের মত করে দেখানো হয়েছে। হলুদ রং-কে আরও হলুদ করে তোলার জন্য সূর্যকে গাছের ডাল দিয়ে ঢেকে **Contrast** সৃষ্টি করা হয়েছে। এছাড়া তিনি অজস্র আত্ম প্রতিকৃতি, নিঃসঙ্গ জীবনের ছবি, দৃশ্যচিত্র এঁকেছেন। প্রতিটি ছবিতেই একটি উন্মাদনার ভাব লক্ষ্য করা যায়।

মানসিক হাসপাতালে কিছুদিন কাটানোর পর প্যারিসের উত্তর-পশ্চিম

সীমান্তে ওভেয়ার সুরওয়াস গ্রামে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে রিভলবারের গুলিতে আত্মহত্যা করে মানসিক যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই পান। এর কিছুদিন পরে তার ভাইও উন্মাদ অবস্থায় মারা যান। ভ্যানগঘ শেষ জীবনে যে সরাইখানায় থাকতেন তারই দশ-বারো ফুট দূরে দুইভাইকে পাশাপাশি কবর দেওয়া হয়। একটিতে লেখা আছে "Here Lies Vincent"। অপরটিতে লেখা আছে "Here Lies Teo"। একটি আইভিলতা দুটি কবরকে সান্ত্বনার সঙ্গে জড়িয়ে আছে।

ভ্যানগঘ ছবি এঁকেছেন হৃদয় দিয়ে, প্রতিটি তুলির আঁচড়ের সাহায্যে তিনি যে অমর যন্ত্রণার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন তা শিল্পসংস্কৃতির ইতিহাসে যুগ যুগ ধরে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে।

ভ্যানগঘ মনের প্রজ্বলিত আবেগকে পটে বিধৃত করার জন্য সারা জীবন ধরে যে চেষ্টা চালিয়ে গেছলেন তাকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়ার জন্য ১৮৯৫ সালে জার্মান শিল্পী Edward Munck এগিয়ে এলেন। তিনি যে মতবাদ প্রচার করলেন শিল্প ইতিহাসে তা Expressionism বা প্রকাশবাদ নামে অভিহিত। জার্মানী যুদ্ধে বিধ্বস্ত, মুদ্রাস্ফীতিতে বিপন্ন বলেই জার্মানে প্রকাশবাদের চরম প্রকাশ ঘটে।

এডওয়ার্ড মুঙ্খ একটি লিথোগ্রাফে 'চিৎকার' নামে একটি ছবির মাধ্যমে মানুষের অনেক মূলগত প্রশ্নের জবাব দিলেন। আকস্মিক উত্তেজনা কিভাবে মানুষের অনুভূতিকে প্রত্যক্ষভাবে নাড়া দেয় ছবিটির স্তবকে স্তবকে তা ফুটে উঠেছে। ছবিতে দেখা যায় উচু চোয়াল বিশিষ্ট, গালবসা একটি নরকংকাল দুই কানে হাত দিয়ে একটি রেললাইনের পাশে দাঁড়িয়ে মর্মভেদী চিৎকার করছে। সেই মর্মভেদী চিৎকারে ছবির সম্পূর্ণ পরিবেশটি ঝালাপালা হয়ে উঠেছে। এই ধরণের ছবির মূল বক্তব্য হোল শুধুমাত্র ললিত বা সুন্দরের উপাসনা সত্যের অপলাপ। পৃথিবীতে এত দুঃখ, এত যন্ত্রণা, এত হতাশা সেক্ষেত্রে সৌন্দর্যের চর্চা মিথ্যার বেসাতি ছাড়া আর কিছুই নয়। রেনেসা যুগে রাফাইয়ের প্রমুখ শিল্পীরা যা করে গেছেন তা নিছক শিল্পের প্রতারণামূলক ভণ্ডামী। এই চিন্তাধারা ধনতান্ত্রিক সমাজের নীতিবোধকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিল। সমালোচকেরা মত প্রকাশ করলেন "এই ধরণের ছবি কুৎসিত বিভৎস। ছবির নামে কোনও কদর্যতাকে তাঁরা মেনে নিতে রাজী নন।" প্রকাশবাদীরা এর বিপক্ষে মত প্রকাশ করতে শুরু করলেন।

সাধারণভাবে আলোচনা করলে দেখা যাবে যে ব্যঙ্গ চিত্রকরদের সঙ্গে প্রকাশবাদীদের একটা জায়গায় মিল খুঁজে পাওয়া যায়। ব্যঙ্গ চিত্রকররা বিদ্রূপের লক্ষ্য বস্তুটির আকৃতি ঠিক রেখে বিদ্রূপ বা কৌতুক সৃষ্টি করার জন্য আকৃতির কোনও কোনও অংশ বিকৃত করেন। কিন্তু যে

মুহূর্তে মনের কোনও অবস্থা যেমন—প্রেম, ভালবাসা, উল্লাস প্রভৃতিকে ছবিতে অভিব্যক্ত করার জন্য আকৃতির বিকার ঘটানো হয়, তখন তা দর্শক সাধারণের কাছে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে বা দুর্বোধ্য ঠেকে। অথচ কোনও বিষয় সম্পর্কে আমাদের মানসিক প্রতিক্রিয়া শুধু তার রং বা আকৃতির উপর নির্ভরশীল নয়। তা না হলে একই বিষয় কখনও আনন্দ কখনও বিষাদের অনুভূতি আনতে পারে না।

এইভাবে মতামতের নানা ঘাত প্রতিঘাতে প্রকাশবাদীরা তাদের শিল্প আন্দোলন অব্যাহত রেখেছিলেন। পরে নাৎসীদের আক্রমনে প্রকাশবাদীরা দেশ থেকে বহিস্কৃত হলেন। চিরতরে প্রকাশবাদের চর্চা অবলুপ্ত হোল।

উত্তর Impressionist যুগের তৃতীয় দিকপাল হলেন Paul Gogune. তিনি জন্মগ্রহণ করেন প্যারিসের এক উচ্চবিত্ত পরিবারে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে। তাঁর পিতা ছিলেন একজন প্রগতিশীল সাংবাদিক। মাতা ছিলেন একজন সমাজতন্ত্রী নারীর ন্যায়াধিকার বাদীর দুহিতা। জীবনের প্রথম থেকেই তিনি ছিলেন উচ্চাভিলাসী ও কল্পনাপ্রবণ। সেজান এবং ভ্যানগঘের মতই তিনি ছিলেন স্বশিক্ষিত শিল্পী। তবুও জীবনের প্রথম অবস্থায় তিনি শিল্পকে নেশা এবং পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন নি। ১৮৭১ সালে ষ্টক ব্রোকারের কাজ ছেড়ে দিয়ে পুরোপুরি রং তুলির জগতে আত্মসমর্পণ করেন। এবং impressionist-দের রঞ্জনশৈলীর দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। গোগ্যার তখনকার ছবিতে দেখা যায় রং ব্যবহারের সারল্য, মিশ্রনের কোনও চেষ্টা নেই, আলোর প্রভাব অল্প।

১৮৮৬-তে গোগ্যা চিত্রশিল্পের নতুন তথ্য সন্ধানে দক্ষিণ আমেরিকা যাত্রা করেন। সেখানে তখন প্রতীকবাদী শিল্পগোষ্ঠী (Symbolist) প্রবলভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। প্রতীকবাদী শিল্পীদের মূল উদ্দেশ্য হোল স্বপ্ন ও অবাস্তব কল্পনাকে বাস্তবের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা এবং মানসিক অবস্থাকে চিত্রপ্রতীকের মাধ্যমে ধরে রাখা। সেক্ষেত্রে গোগ্যা যে ছবি আঁকতে শুরু করলেন তা সম্পূর্ণরূপে আলংকারিক। প্রথমে কালো বহিঃরেখার সাহায্যে ক্যানভাসের জমিকে ভাগ করে অমিশ্র সমতলীয় রং ব্যবহার করে সমতল ক্ষেত্র তৈরী করতে শুরু করলেন, যা প্রতীকবাদীদের চিন্তাধারার বিপরীত তো বটেই, বাস্তববাদীদের চিন্তাধারা থেকেও স্বতন্ত্র। এর পর তিনি সেজানের আদর্শে অনুপ্রানিত হলেন। কিন্তু সেজান ছিলেন পুরোপুরি বাস্তববাদী। গোগ্যা কোনও দিনই বাস্তববাদী ছিলেন না। তিনি সব সময় চাইতেন, চিত্রকরের বিশ্বাসের সঙ্গে বাস্তব ঘটনার মিলন সাধন। অগত্যা তাকে সেজানের আদর্শ থেকে সরে যেতে হোল। কাজ করতে লাগলেন বিরাটকায় পরিসরের উপর।

১৮৮৮-তে ভ্যানগঘের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। দুই মহান শিল্পীর হৃদয়ের আদানপ্রদানের ফলে চিত্রশিল্পের নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হোল। ফলস্বরূপ গোগ্যার ছবির পালাবদল শুরু হোল। ক্যানভাসে নেমে এলো বাস্তবহীনতা, এক ঐশ্বরিক সারল্য, চিরন্তন স্তব্ধতা, মনে হতে লাগলো যেন সময় চলতে চলতে হঠাৎ এক একটা মুহূর্তে থমকে দাঁড়িয়েছে আর যেন সে চলবে না। সেজান একসময় কথা প্রসঙ্গে গোগ্যা সম্বন্ধে বলেছিলেন "বর্ণের সুর পরিবর্তন ব্যতীত চিত্রকলা সম্ভব নয়।" আসলে সেজান, গোগ্যাকে বুঝতে ভুল করেছিলেন। যে শিল্পীকে তিনি এঁকেবারেই উড়িয়ে দিয়েছিলেন, আজ বিশ শতকে আধুনিক চিত্রশিল্পের জগতে তাব দান সেজান অপেক্ষা কোনও অংশে কম নয়। বাস্তববাদী impressionist-রা প্রকৃতিকে নকল করার যে ব্যর্থ চেষ্টা পরবর্তী শিল্পীদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছিলেন, গোগ্যাই তার থেকে তাদেরকে মুক্তি দিয়েছিলেন। আজ বিশ শতকে আধুনিক শিল্পীরা যে Form এর সরলীকরণ, বিষয়ভঙ্গণ এবং বিষয়কে অস্বীকার করে নৈরাজ্যে পদার্পণের যে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন গোগ্যাই হলেন তাদের প্রথম পথপ্রদর্শক।

১৮৯০ সালে গোগ্যার জীবনে এলো এক মর্মান্তিক দুঃসংবাদ, বন্ধু ভ্যানগঘ আত্মহত্যা করেছেন। গোগ্যা পেলেন প্রচণ্ড আঘাত। তাঁর সমস্ত আক্রোশ গিয়ে পড়লো পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপর যেখানে ভ্যান-গঘের মত মহানশিল্পীকে সারাজীবন অপমানিত হতে হয়েছে। মানসিক যন্ত্রণা ও দারিদ্রের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য তাঁকে আত্মহননের পথ বেছে নিতে হোল। তাঁর মনের অস্থিরতা সভ্যতা ছাড়িয়ে, উন্মুক্ত নীল আকাশের নীচে, তালসুপুরীর বনের ছায়ায়, অসংখ্য দেহাতী মেলার স্বপ্নে বিভোর হয়ে গেল। সভ্য মানুষদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়নি, সভ্য জগতকেই তিনি চিনতেন না। তিনি চলে এলেন তাহিতী দ্বীপে। তাহিতীতে এসেছিলেন সরলতার সন্ধানে। সেখানকার আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে যেতে চেয়েছিলেন, চেয়েছিলেন বুনো শরীর আর অফুরন্ত ভালবাসা, যা পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে পাওয়া তার পক্ষে কোনও দিনও সম্ভব ছিল না। তাহিতীতে এসে পরিচয় হয়েছিল বালিকা প্রণয়িনী ইহামানার সঙ্গে। ইহামানার প্রেমের উদ্বেলিত জোয়ারে, তাহিতীবাসীর জীবনকাহিনী, লোকগাথা, উপকথা নিয়ে যে অজস্র ছবি গোগ্যা এঁকে গেছেন সেগুলিই তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ চিত্র এবং প্রতিটি ছবির কেন্দ্রীয় চরিত্রে রয়েছে তাহিতী-বাসীনি ইহামানা। পরে ক্যানভাস ফুরিয়ে যাওয়ায় কাঠ, পাথর, মাটি দিয়ে কিছু মূর্তি, লিথো ও এচিং-এর কাজ করেছিলেন। অবশেষে ১৯০৩ সালে পূর্ণগ্রীষ্মের এক উজ্জ্বল সকালে কঠিন যৌনব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে, বিনা

চিকিৎসায়, বিনা শুশ্রূষায় ও নিদারুণ দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগের মধ্য দিয়ে গোগ্যার মৃত্যু হোলো। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে প্যারিসের এক বন্ধুকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন "আমি যা কিছু কৃত্রিম, ঐতিহ্যগত, মামুলী, তার থেকে পলায়ন করেছি। আমি প্রকৃতি ও সত্যে প্রবেশ করেছি। তোমাদের সভ্যতা হোল তোমাদের ব্যাধি, আমার বর্বরতা হোল আমার স্বাস্থ্য ফিরে পাওয়া।"

গোগ্যা শিল্পে আদিম অমসৃন, সাদাসিদে ভাবকে ফুটিয়ে তোলার জন্য সারাজীবন ধরে যে প্রচেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তাঁরই কিছু উত্তরসূরী সংস্কার বিমুক্ত মন ও শিশুর সারল্য নিয়ে শিল্প চর্চায় প্রয়াসী হলেন। গোগ্যার আদর্শ ছাড়াও নবীন প্রতিচ্ছায়াবাদীদের জটিলতা এর পেছনে কিছুটা কাজ করেছিল। ফলে ছবিতে ড্রয়িং-এর গুরুত্ব কিছুটা হ্রাস পেল। অবিমিশ্র রং এর পাশাপাশি প্রয়োগে ছবির ভাষা নতুনভাবে উচ্চারিত হল। নবীন পন্থীরা ১৯০৫ সালে ফ্রান্সে স্যালো দ্য ইনডিপেনডেনসে নতুন আঙ্গিকে রচিত চিত্রসমূহের এক প্রদর্শনী করলেন। সমালোচকেরা ব্যাঙ্গোক্তি করে বললেন "খাঁচাভর্তি জন্তু"। এই ঠাট্টা পরিহাসের মধ্যে দিয়েই ফোবিজম্ (Fouvism) বা জন্তুবাদের উৎপত্তি। ফোবিজম্-এর সব থেকে উল্লেখযোগ্য শিল্পী হলেন অাঁরি মাতিস। তিনি উত্তর ফ্রানসে একটি মফস্বলে শহরে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন আইনজীবি। একবার তিনি কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে অপারেশনের জন্য কিছু দিনের জন্য হাসপাতালে ভর্তি হন। সুস্থ হয়ে ওঠার পর তার মা তাকে একটি রং-এর বাক্স ও রং ব্যবহারের করণকৌশল সম্বন্ধীয় একটি বই ও কয়েকটি তুলি উপহার দেন। সেই প্রেরণায় তিনি চিত্রচর্চা শুরু করেন। প্রথমে ভ্যানগঘ এবং গোগ্যার শিল্পচর্চার দ্বারা অনুপ্রাণিত হন। যেহেতু অপেক্ষাকৃত বেশী বয়সে চিত্রচর্চা শুরু করলেন সেইজন্য দৈনিক বারো ঘণ্টারও কিছু বেশী সময় Studio তে এবং 'Art School' কাজ করতে শুরু করেন। পরবর্তীকালে বিপরীতধর্মী বিভিন্ন অবস্থাতেও তাঁর শ্রম ও নিয়মানুবর্তিতা থেকে বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি। মাঝখানে কিছুদিনের জন্য Cubist-দের দ্বারা প্রভাবিত হলেও কিছুদিনের মধ্যেই তরে কাজ অতি উচ্চাঙ্গের বলে প্রশংসিত হয়।

মাতিস প্রাচ্যদেশীয় গালিচার নকসা এবং উত্তর আফ্রিকার দৃশ্যাবলীর নয়নাভিরাম রং বিন্যাসের একটি মনোরম ঢং আয়ত্ত করেন। তাঁর পরিণত বয়সের শিল্পীজীবনকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। ১৯১৮ থেকে ১৯২৮ পর্যন্ত তিনি ফরাসী শিল্প ঐতিহ্যকে অনুসরণ করেন। তখনকার ছবিগুলিতে বুর্জোয়া বৈভব ও মার্জিত রুচীর পরিচয় পাওয়া যায়। এই পর্যায়টিকে বলা হয় 'নাইস পিরিয়ড'। তবে গোগ্যার মতই তিনি অমিশ্র সমতলীয় রং

ও ফর্মের সরলতাকে বিশেষভাবে অনুসরণ করেছেন। তাঁর ছবিতে রঙিন নক্সা এবং প্রাচ্য দেশীয় আল্পনা ইউরোপীয় শিল্পে অভিনবত্ব এনেছে।

মাতিসের ছবিতে অনেক ক্ষেত্রেই আকৃতির বিকৃতি ঘটানো হয়েছে। এর একমাত্র কারণ হোল বাস্তবতাকে পরিহার করে সৌন্দর্যানুভূতিকে ফুটিয়ে তোলা। মাতিসের ছবি সব সময় ভাল নাও লাগতে পারে, কিন্তু এমন একটা যাদু আছে যা অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করার পর অনুভব করা যায়। একেবারের দেখায় মন তৃপ্ত হয় না। বার বার দেখতে ইচ্ছে করে।

পাবলো পিকাসো (Publo Picasso)

শিল্পজগতের কিংবদন্তী নায়ক পাবলো পিকাসো জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৮৮৯ খৃঃ স্পেনের ভূমধ্যসাগরীয় দক্ষিণ উপকূলে মালাগা শহরে। স্পেনের সেই শিশুটি অসাধারণ আলোকোজ্জ্বল প্রতিভার স্পর্শে একদিন সমস্ত বিশ্বের শিল্পজগতকে নব নব ভাষায় সম্পদশালী করে তুলবে, তখন তা সবার কল্পনাতীত ছিল। নিঃসন্দেহে তিনি বিশ্বের শিল্পজগতের এক প্রবাদ পুরুষ, দোর্দণ্ডপ্রতাপ শিল্পী, জীবিতাবস্থায় মান, সম্মান, অর্থ প্রতিপত্তির দিক থেকে বিশ্বের আর কোনও শিল্পী তাঁর সমকক্ষ হতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ। শিল্পজগতের প্রবাদ পুরুষ তিনি ঠিকই, কিন্তু সর্বকালের, সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পী কিনা সে বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক চলতে পারে। নিঃসন্দেহে তিনি প্রতিভাবান। তার সঙ্গে ছিল নিষ্ঠা ভালবাসা ও আন্তরিকতা। বয়সের ছোঁয়া এসে থাকলেও তাঁর যুবোচীত মানসিকতার জন্যই নিরানব্বুই বছর বয়সেও রাত তিনটে পর্যন্ত অক্লান্তভাবে শিল্পজগতের গোপন রহস্য সন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন, পরের দিন দুপুরে মারা যান।

শিল্পের সঙ্গে পিকাসোর হাতে খড়ি হয়েছিল জন্মসূত্রেই। পিতা ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান শিল্পশিক্ষক। তাই বাল্যকালেই পিতা সন্তানের শিল্প প্রবণতার পরিচয় পেয়ে নিজের ব্যবহৃত রং তুলি সন্তানের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। পিকাসোর মা ডোলা মারিয়া এক জায়গায় বলেছেন যে "শিশু বয়সে পিকাসো সব কিছু বাদ দিয়ে কাগজের উপর আঁকি বুকি কেটে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতে পারত।" তাঁর শিশু বয়সের এই শিল্পানুরাগ ভবিষ্যত জীবনে তাকে বিশ্বের সেরাশিল্পীর স্বীকৃতি এনে দিয়েছিল। মাত্র ১৬ বৎসর বয়সে পিকাসো নিখিল স্পেন ললিতকলা প্রদর্শনীতে তাঁর অঙ্কিত "Science and Charity" ছবিটির জন্য প্রথম স্বীকৃতি পান। তারপর অবশ্য তিনি ললিতকলায় কিছুদিন শিক্ষানবীশ ছিলেন। কিছু দিনের মধ্যেই শিল্পীর বাউন্ডুলে মন তাঁকে ঘরছাড়া করল। তিনি ইংলন্ডের পথে পাড়ি জমালেন। কিন্তু মাঝপথে লাস্যময়ী প্যারিসের হাতছানি তিনি এড়িয়ে যেতে পারলেন না। প্যারিস তখন শিল্প-

সংস্কৃতির পীঠস্থান। পিকাসো প্যারিসেই বসবাস করতে মনস্থির করলেন। প্যারিসে একটার পর একটা ছবি আঁকতে লাগলেন। প্রদর্শনীর ব্যবস্থাও হোল আশানুরূপ অর্থ ও খ্যাতি না পাওয়া গেলেও বুদ্ধিজীবি ও শিল্প সমালোচকদের দৃষ্টি লাভে ধন্য হলেন। প্রথম জীবনে ইমপ্রেসনিষ্ট এবং উত্তর ইমপ্রেসনিষ্টদের দ্বারা প্রভাবিত হলেও পরে গোগ্যা প্রবর্তিত ফোবিজম্ দ্বারা অনুপ্রাণিত হলেন। কিছুদিন পরে গোগ্যার আদর্শবাদ থেকে সরে দাঁড়ালেন।

১৯০১ থেকে ১৯০৪ সালের মধ্যে পিকাসোর নীল পর্যায় (Blue period) শুরু হোল। তখন পিকাসোর বয়স সবে মাত্র ২০ বছর। পিকাসোর ছবিতে নেমে এলো নীল বিষণ্ণতা। দুঃখী, নির্যাতিত, অপমানিত, সঙ্গীহারারাই তখন হোলো পিকাসোর ছবির নায়ক-নায়িকা। সমস্ত ক্যানভাস জুড়ে ঘন নীল। তার মধ্যে মানুষগুলো যেন অব্যক্ত যন্ত্রণায় অথবা গুমরে ওঠা চাপা কান্নায় কিছু বলতে চায়। এই পর্যায়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছবি হোল "The old guitarist" অর্থাৎ "বৃদ্ধ গীটার বাদক"। ফুটপাতের উপর ছেঁড়াজামা পরিহিত একটি বৃদ্ধ গীটার বাজাচ্ছে। বৃদ্ধের বসার ভঙ্গিতে শরীরের যে খাঁজগুলির সৃষ্টি হয়েছে, পিকাসোর মেদহীন তুলির আঁচড় সেগুলো কত বাস্তব সম্মত হয়েছে তা ছবিটি না দেখলে অনুমান করা যায় না। বৃদ্ধ যদি নিজের সত্ত্বা হারিয়ে ফেলে, গীটার যদি গীটার বলে না ধরা দেয়, তবুও এটা চিরন্তন। বৃদ্ধ ও গীটার এই দুয়ে মিলে এক অসাধারণ কম্পোজিশন। গীটার সহ বৃদ্ধের মূর্তিটি যেন হিমশীতল কঠিন একটি পাথর থেকে খোদাই করা। মন্দিরে বা মসজিদে সন্ধ্যারতির পর যে বিষণ্ণ শীতল ভাব মানুষের মনকে ক্ষণিকের স্পর্শে অন্য জগতে নিয়ে চলে যায়, সেই স্নিগ্ধ বিষণ্ণতা যেন ক্যানভাস থেকে উপচে বেরিয়ে আসছে।

পিকাসোর গোলাপী পর্ব শুরু হয় ১৯০৪ সালে। এই পর্যায়ে পিকাসো লাস্যময়ী প্যারিসের অন্ধকার দিকটিকে বিস্তৃত করেছেন ক্যানভাসে। বুভুক্ষু ভিখারী, বিগত যৌবনা বারবনিতা, ব্যালে দলের নর্তকী, সার্কাসের অন্তর্জগতের রহস্য, রেসকোর্স প্রভৃতি হয়েছে পিকাসোর ছবির উপজীব্য বিষয়। তাদের বাহ্যিক রূপকে অস্বীকার করে অন্তর্জগতের অব্যক্ত যন্ত্রণার ইতিহাসকে তিনি গোলাপী রং-এর কাব্যিক বিষণ্ণতায় মূর্ত করে তুলেছেন।

১৯০৬ সালে পিকাসোর চিন্তাধারা অন্যপথে মোড় নিল। বিষয় বস্তুর প্রাধান্য কমে এলো, Form নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করলেন। এই সময়টিকে বলা যেতে পারে আইবেরিয় পর্ব। Form-এর মধ্যে নানা ধরনের ভাঙ্গচুর (distortion) শুরু হোল। বেশ কিছু আত্মপ্রতিকৃতি আঁকলেন। কিছুদিনের মধ্যেই নিগ্রো ভাস্কর্যের দ্বারা প্রভাবিত হলেন। নিগ্রো ভাস্কর্যের আদিম, সরল, সাদাসিদে ভাব নিয়েই কিছুটা সময় অতিবাহিত করলেন। এই

পর্যায়ে অঙ্কিত নগ্ন নারী মূর্তিগুলিই তার প্রকৃষ্ট নজির। সভ্যতা, সংস্কারমুক্ত আদিমবোধগুলি তাঁর শিল্পী মানসকে প্রভাবিত করল। তাঁর আঁকা চার নর্তকী ছবিটিতে আকৃতির কিছুটা ভাঙ্গচুর লক্ষ্য করা যায়। এটি শুধু মাত্র একটি ছবি বললে ভুল হবে, এটি Cubism বা আকৃতির বিন্যাসবাদের প্রথম বার্তাবাহী। Cubism হোল সেজানের আদলের পূর্ণরূপ, গোগ্যা ও ভ্যানগঘের স্কুলের বিরুদ্ধে প্রথম সরব ঘোষণা। পিকাসো ও ব্রাকের যুগ্ম নেতৃত্বের একটি নতুন রূপাদর্শের প্রতিষ্ঠা।

পিকাসো ছিলেন অসম্ভব অহংকারী এবং ব্যক্তিসাতন্ত্রপ্রবাদী। ভাবলে আশ্চর্য্য হতে হয়, যে তাঁর মত মানুষ হঠাৎ ঘনকবাদের মত একটি যুগান্তকারী বিপ্লবে নামলেন কি ভাবে? হয়তো তিনি এ পথে যেতেন না, বা গেলেও হয়তো পূর্ণ পরিণতিতে পেঁছাতেন না। এ বিষয়ে জর্জ ব্রাক নামে তাঁর এক জার্মান শিল্পী বন্ধু তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। Cubist আন্দোলন নিয়ে পিকাসোর সঙ্গে ব্রাকের কয়েকটি বৎসর কেটেছিল। ব্রাক তাঁর জীবনীতে বলেছেন যে "দুরূহ দুর্গম পর্ব্বতারোহীদের মত দুজনে একই দড়িতে বাঁধা ছিলাম।" পিকাসো ও ব্রাক Cubism সম্বন্ধে বলেছেন যে, "আকারকে তাঁরা যে ভাবে দেখেছেন, সেভাবে আঁকবেন না, যেভাবে জানেন সে ভাবে আঁকবেন।" সেজানের আদর্শ তো ছিলই উপরন্তু নিগ্রো ভাস্কর্যের অমসৃন সাদাসিদে ভাবও Cubism-কে আক্ষরিক অর্থে শিল্প ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে সাহায্য করেছিল। নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে Cubism যখন দুর্বোধ্যতার চরম সীমায় পেঁছালো তখন পিকাসো সরবে মত প্রকাশ করেছিলেন যে "শিল্পকলা একটা মিথ্যা যা দিয়ে সত্যকে বোঝা যায়। অবশ্য শিল্পীকে জানতে হবে কি ভাবে বললে মিথ্যাটা অন্যদের কাছে সত্য হয়ে ধরা দেবে। প্রকৃতি ও শিল্পকলা এক নয়, যা এক নয় সে বিষয়ে আমাদের ধারণা আমরা শিল্পকলায় অভিব্যক্ত করি। আমরা চেষ্টা করছি কত সহজে স্থাপত্য রীতিতে পেঁছানো যায়"।

পিকাসোর শিল্পী জীবনের শ্রেষ্ঠ অবদান হোল ঘনকবাদ (Cubism)। কারণ এর আবেদন ভাবের কাছে নয় বুদ্ধির কাছে। বর্ণহীন নির্বাক, মূক, বধির এক অভিব্যক্তি। সেই অর্থে Cubism তাঁর সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ আধুনিক চিত্রশৈলী।

এর পরের দিকে অর্থাৎ ১৯১২ থেকে ১৯২১ এর মধ্যে তাঁর শিল্পী জীবন উত্তাল সমুদ্রের ঢেউ-এর তর্জন গর্জনের মত। নানা চিন্তা-ভাবনার, আঙ্গিক পদ্ধতির নানান ঢেউ এসে মিলে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। কখনও নব্যদ্রুপদী ধারায় অমর্তশ্রী সম্পন্ন মাতৃরূপ প্রকাশে আত্মমগ্ন থেকেছেন, কখনও বা নিঃস্পন্দ জীবনের (Still-life) গান গেয়েছেন। এটাই

সব থেকে আশ্চর্যের যে, পিকাসো একজন স্বয়ংসম্পূর্ণ মানুষ হয়েও তাকে নানা সমস্যা ও সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে, কিন্তু কোনও সময়ই তিনি বিশেষ কোনও রীতি বা Style-কে আঁকড়ে ধরে রক্ষণশীল মনোভাবের পরিচয় দেননি। পর্যায়ক্রমে একের পর এক রীতি পদ্ধতিতে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করেছেন এর জন্য তাঁর কোনও গুরু বা পথপ্রদর্শকের প্রয়োজন হয়নি। রং ও রেখার উপর তার অসামান্য দখলের ফলেই একাজ তার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল।

১৯২৫ সালে পিকাসো সুররিয়্যালিজম্ এর দিকে মনোনিবেশ করেন। অর্থাৎ অবচেতন মনের ভয়, আশংকা, উল্লাসকে তিনি ক্যানভাসে বিস্তৃত করতে শুরু করলেন। পিকাসোর এই সময়কার ক্যানভাসগুলিতে উত্তাল রং, ভয়ার্হ উত্তাল আকাশ, বীভৎস সব মুখাকৃতি লক্ষ্য করার মত।

পিকাসোর জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্র হোল 'গুয়েনির্কো', স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় ফ্রানকোর বোমারু বিমানে বাস্ক প্রদেশের প্রাচীন রাজধানী গোয়েনির্কো শহরটি ধ্বংস হয়ে যায়। তাই রাগে, দুঃখে অপমানে বৃহৎ ক্যানভাসের উপর সাদাকালোয় এই ছবিটি এঁকে শিল্পী প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। ছিন্ন, ভিন্ন Form এর বিন্যাসে ছবিটির স্তবকে স্তবকে পশু মানুষের মর্মভেদী চিৎকার ফুটে উঠেছে। ছবিটি ১৯৫১ সালে তাঁরই অঙ্কিত "কোরিয়ার হত্যাকাণ্ডের" অনুরূপ। ছবিটির সমালোচনায় বলা হয়েছে "পিকাসো এখানে আত্মকেন্দ্রিক, রাজনৈতিক শিল্পী হিসাবে তিনি ব্যর্থ, ছবিটিতে সমাজ চেতনার ছাপ নেই।" তা সত্ত্বেও একথা নিশ্চিত যে গুয়েনির্কো পিকাসোর শিল্পীজীবনের এক অনবদ্য সৃষ্টি। পিকাসো যখনই কিছু এঁকেছেন, মনে হয় যে শিল্পী তাঁর শিল্পকর্ম বা সৃষ্টির সঙ্গে একাত্ম। তাই পিকাসোকে বার বার বলতে শোনা গেছে "I don't evolve, I am what I am." শিল্পী যামিনী রায়কে রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে ঠিক এই কথাই বলেছিলেন "ছবি কি? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে – ছবি একটি নিশ্চিত প্রত্যক্ষ অস্তিত্বের সাক্ষী।—চিত্রকর গান করে না, ধর্ম্ম কথাও বলে না।— চিত্রকরের চিত্র বলে "অয়ম্ অহং ভো অর্থাৎ এই যে আমি এই।"

পিকাসোর জীবনে নারীর একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। তাঁর সারা জীবনের কাজের মধ্যে অন্যান্য রস যেমন ছড়িয়েছেন তেমনি আদি রসও বাদ যায়নি। নারীদেহকে নানাভাবে, নানা ভঙ্গিতে স্পর্শ করেছেন, অনুভব করেছেন, নানা ভঙ্গিমায় বিশ্লেষণ করেছেন। আবার যখনই প্রতারিত হয়েছেন তখনই নারী তাঁর কাছে হয়ে উঠেছে রহস্যময়ী। কখনও নারীকে এঁকেছেন স্নেহময়ী মা রূপে, কখনও নারীকে দেখিয়েছেন আদি রসের উৎস্য স্বরূপ, তাই কখনও সাধারণ মানুষের কাছে ধিকৃত হয়েছেন। কখনও বা তাঁরাই

তাঁকে শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছেন। এরকম পরিস্থিতিতেও শিল্পী অনড় অটল। তারুণ্যে পরিপূর্ণ এই প্রতিভাশালী শিল্পী তাই নব্বই বছর বয়সে ১৯ বছরের মডেল জ্যাকলিনের সঙ্গে শেষ বারের মত পাণি গ্রহণে সক্ষম হয়েছিলেন। ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় নয়, শিল্পী মানসের অতৃপ্ত নেশার তাড়নায় এখানে তাঁর সেই ছবিটাই বার বার মনে পড়ে, যৌবন মদমত্ত নারী মৃত্যুর হাতছানিকে উপেক্ষা করে, মৃত্যুর সীমানায় দাঁড়িয়েও শেষ বারের মত আয়নায় তাঁর মুখটা ক্ষণিকের জন্য দেখে নিচ্ছে।

পিকাসো শুধুমাত্র চিত্রকর নন। কাজের মধ্যে বৈচিত্র সৃষ্টি ও মনকে সাময়িকভাবে বিরতি দানের জন্য কখনও কখনও হাতে ছেনী, হাতুড়ী, বাটালীও তাঁকে ধরতে হয়েছে। চিত্রকলা চর্চার সাথে সাথে নিরলস পরিশ্রমে সৃষ্টি করেছেন অজস্র মূর্তি, কাঠ খোদাই, ছাপাই ছবি, এচিং প্রভৃতি। সামান্য সাইকেলের সিট দিয়ে সুন্দর একখানা মহিষের মুখাকৃতি তৈরী করা বা শিশুদের খেলনা মোটর গাড়ীর সাহায্যে বেবুনের মুখ তৈরী করা তাঁর মত শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব ছিল।

পিকাসোর সারা জীবনের কাজের সঙ্গে আমাদের পরিচয় নেই। বই-পুস্তক থেকে পাওয়া ছাপানো ছবির সঙ্গেই আমাদের পরিচয়। তার থেকে একটা স্পষ্ট ধারণা হয় যে তিনি কোনও মতেই সঠিক বিমূর্ত শিল্পী (Abstract) ছিলেন না। তিনি ছিলেন অবয়ব ধর্ম্মী শিল্পী। হঠাৎ মৃত্যুর করাল গ্রাস এসে হাজির না হলে তিনি প্রকৃত বিমূর্ত জগতে পেঁাছাতে পারতেন। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে তিনি বলেছিলেন "আমার আস্থা মৃত্যুতে নয় জীবনে, যুদ্ধে নয় শান্তিতে"। আশাবাদী তিনি ছিলেনই তা নাহলে বিরানব্বই বছর বয়সেও যুবোচিত প্রেম, ভালবাসা, হাসি তামাশায় দীর্ঘ সময় কাটানো তাঁর পক্ষে সম্ভব হোত না।

এখনও তাঁর সম্পূর্ণ কাজের মূল্যায়ন হয়নি। মানুষ শিল্প সংস্কৃতির আরও উন্নত স্তরে পেঁাছালে তাঁর কাজের সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব হয়ে উঠবে। সেদিনটির আর খুব বেশী দেরী নেই।

বিমূর্ত্তবাদ (Abstractism)

বিশ শতকে পেঁাছে ইউরোপের চিত্রশিল্পীদের মধ্যে একধরণের স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার দিকে ঝোঁক দেখা গেল। তাঁরা চাইলেন সংগীতের মত তাঁদের শিল্প বাস্তব জগতের নিয়ম কানুনের উপর নির্ভর না করে সম্পূর্ণ এক স্বতন্ত্র নিয়মে চলুক। তাঁরা চাইছিলেন শিল্পে স্বাধীনতা এবং সম্পূর্ণতা। 'ওয়েসলি ক্যামদিনস্কি' তাঁর সংগীতময়তার দ্বারা এবং 'পিট মনড্রিয়াম' তাঁর স্থাপত্যধর্ম্মী গঠনাকৃতির দ্বারা (Architectural Construction), যে

নূতন শিল্পাঙ্গীদের দিশারী হলেন তাকে শিল্প ইতিহাসে বিমূর্তবাদ বা Abstractism আখ্যায় ভূষিত করা যায়।

'ক্যান্দিন্স্কি' গ্রহণ করলেন বিশুদ্ধ সংগীতকে বিমূর্ত রূপের চরম প্রকাশ হিসেবে। সংগীত থেকে আমরা যে মূর্চ্ছনা অনুভব করি রং-এর বর্ণালী সৃষ্টির মাধ্যমেও সেই মূর্চ্ছনা সৃষ্টি করা যায়। এই যুক্তির উপর নির্ভর করে তিনি মত প্রকাশ করলেন "Abstraction based on pure Music"। ফলে রং-এর বর্ণালীর মধ্যে Form-এর অস্তিত্ব লোপ পেয়ে গেল। বিশুদ্ধ সংগীতের মধ্যে যে abstract image এর সন্ধান পাওয়া যায় ক্যান্দিন্স্কি সেই abstract image-কে ধরে রাখার চেষ্টা করলেন।

চিত্রশিল্পের সমস্ত রকমের ঐতিহ্য ও বাস্তবতাকে অস্বীকার করে তিনি চিত্রশিল্পের এক স্বতন্ত্র জগতের দ্বারোদ্ঘাটন করতে সক্ষম হলেন। তাই ক্যান্দিন্স্কির ছবিকে বলা হোল colour abstraction, তিনি এই নতুন আঙ্গিক পদ্ধতির পক্ষে কতকগুলো যুক্তি খাড়া করলেন।

(১) Colour is absolutely Independent and colour has its own value.

(২) Colur is independent of any form in reality.

(৩) Colour is beded with spiritualism.

(৪) Colour can create hermony, orchestra or a concert.

ক্যান্দিন্স্কির মতই পিটমন্ড্রিয়ান সরবে ঘোষণা করলেন "An abstrction based on Mathematics particularly on Geomatry." গণিতের কোনও রূপ নেই। রূপ থেকে অরূপেই তার বিস্তার, যা মূর্ত জগতের ভেতরের জগত। সমস্ত বিশ্বচরাচরে যে অজস্র Form আছে তার পেছনে আর একটা অদৃশ্য Form-এর যে অস্তিত্ব অনুভব করা যায় একে মনড্রিয়ান বলেছেন pure reality আর সেজন্য সেটাকেই বলেছেন abstract. মনড্রিয়ানের ছবিতে রং-এর প্রাধান্য কমিয়ে দিয়ে স্থাপত্যধর্মী গঠনাকৃতির উপর জোর দিয়েছেন বেশী। তিনি সর্বসাকুল্যে ছবিতে তিনটি প্রাথমিক রং ব্যবহার করেছেন লাল, হলুদ ও নীল। আর কালো বহিঃরেখা দিয়ে রংগুলিকে এক আঁটসাঁট রূপে বদ্ধ করেছেন।

———









